শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীপ্রতিভা রায়

নরনারায়ণ আশ্রম

প্রকাশক
রেণু মিত্র, সম্পাদিকা
নরনারায়ণ আশ্রম
পোঃ অশ্বিনীনগর
২৪ পরগণা

প্রথম সংস্করণ, কার্তিকী কৃষ্ণাপঞ্চমী ১৩৬৭

মুদ্রাকর
জিতেন্দ্রনাথ বসু
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩১, মোহনবাগান লেন
কলিকাতা—৪

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতা শ্রীশ নাথ রায়ের উদ্দেশ্যে

বাবা, যেদিন আমার সংসার-জীবনে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছিল, সে দিন তুমিই আমাকে আলোর পথের সন্ধান দিয়াছিলে। আজ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের জীবন-কথা রূপ আমার এই অর্ঘ্যের নির্ম্মাল্য তোমার উদ্দেশ্যে অর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

তোমার প্রতিভা



শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ—৪৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণের দিন

নিবেদন

শ্রীমৎ স্বামী শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের জীবনী লিখিবার স্পর্দ্ধা লইয়া আমি এই পুস্তিকা ছাপাইয়া বাহির করিবার প্রয়াস পাই নাই। আমার মত একজন, যাহাকে নিরক্ষর বলিলেই চলে, তাহার পক্ষে শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের অদ্ভুত আশ্চর্য জীবন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমি লিখিয়াছি তাঁহার জীবন কথা, যাহা প্রায় ২৫/৩০ বৎসর তাঁহার চরণ প্রান্তে বসিয়া তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। তিনি ছিলেন দার্শনিক, প্রেমিক, ভক্ত, প্রাণবান পুরুষ, তিনি যে আমার মত একজন সকল প্রকারের অযোগ্যের নিকট বসিয়া দিনের পর দিন এত কথা বলিয়াছেন, তাহার কি কোনই অর্থ নাই? এই প্রেরণাই আমাকে তাঁহার জীবন-কথা লিখিতে প্রণোদিত করিয়াছে।

যিনি নূতন যুগের নূতন দর্শন শাস্ত্র সমাজের সামনে রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা আজ না বুঝিলেও একদিন সমাজের প্রয়োজনেই মানুষ ইহার খোঁজ করিবে, সেই দিন শাস্ত্রকারের জীবনীর খোঁজও মানুষ করিবে। তাঁহার সম্বন্ধে আমি যেটুকু জানি তাহা যদি লিখিয়া রাখিয়া না যাই, তাহা হইলে আমার নিকট তাঁহার কথা বলাও যেমন ব্যর্থ করা হইবে, তেমন জনসাধারণের নিকটও আমার অপরাধ হইবে।

আর একটি কথা ভাবিয়াছি আমি আমার অসামঞ্জস্য ও অবিন্যস্ত লেখনীদ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের যে জীবন কথা গ্রথিত করিয়া রাখিয়া গেলাম, তাহা একদিন আমার প্রিয় ভ্রাতাভগিনীগণের সুনিপুণ হস্তে সাহিত্যের প্রাণোজ্জ্বল ভাষায় শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের জীবনী লেখায় যদি কিছু সাহায্য করে, তবে নিজেকে ধন্য মনে করিব। এই জীবন কথা লিখিয়াছি তাঁহার মুখে শোনা কথা এবং তাঁহার নিকট লিখিত বহু পত্রাদি হইতে ও বরিশাল হিতৈষী পত্রিকা, উজ্জ্বল ভারত পত্রিকা যাহা ১৩৩২/৩৩ সালে বরিশাল হইতে সাপ্তাহিক আকারে বাহির হইয়াছিল তাহা অবলম্বনে। ঠাকুর আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা গ্রহণ করুন। যাহাদের সহযোগিতায় এই বই ছাপাইয়া বাহির হইল, তাহাদিগকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, তাহাদের এই সেবা ঠাকুর গ্রহণ করুন এই প্রার্থনা করি।

শ্রীপ্রতিভা রায়

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহম্ বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

যাঁহার কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, সেই পুরুষোত্তম শ্রীমাধবকে স্মরণ করিয়া এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি। শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের জীবন যে কত বিরাট ব্যাপক ও অতলস্পর্শী গভীর ছিল তাহা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির ধারণার অতীত। বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার সমাবেশে তাঁহার জীবনখানি ছিল উজ্জ্বল। আমি মূর্খ এবং সকল দিক্ হইতেই দীন হইতেও দীন, কিন্তু তাঁহার আশ্রিত আমি। তাঁহার অজস্র স্নেহ সিক্ত আমার জীবনখানি, তাঁহার সেই স্নেহ স্মরণ করিয়াই তাঁহার জীবন কথা বলিবার প্রয়াস করিয়াছি, কেন না দীর্ঘদিন তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার জীবনকথা শুনিবার সৌভাগ্য আমার লাভ হইয়াছিল। যদিও তাঁহার ভাগবত জীবনের জীবন কথার সহস্রাংশের এক অংশও আমার লেখনী প্রকাশ করিতে পারিবে না, তবুও তাঁহার কৃপা স্মরণ করিয়া যেটুকু পারি লিখিয়া নিজেকে ধন্য করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীভগবান যুগে যুগে আসেন, যুগের প্রয়োজনে যুগোপযোগী কথা ও জীবন লইয়া এবং সেই জীবন ও বাণী বিশ্বের বুকে

ছড়াইয়া দিবার জন্য সংগে আনেন তাঁহার প্রিয় পার্ষদদিগকে। "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।" যে ধর্ম্ম বিশ্বকে ধারণ করিয়া রাখে, সেই ধর্ম্ম যখন গ্লানিগ্রস্ত হয়, তখনই ভগবান তাঁহার সাধের সৃষ্টিকে রক্ষা করিবার জন্য সেই যুগোপযোগী নূতন সত্য দান করিবার জন্য ধরায় অবতরণ করেন।

দ্বাপরের শেষে পৃথিবী যখন গ্লানিগ্রস্ত তখনই তিনি আসিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণরূপে। "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" বৃষ্ণির খড়গাঘাতে পৃথিবী যখন রক্তাক্ত, প্রাণ যখন নিপীড়িত তখন তিনি আসিলেন প্রাণ সাধনা লইয়া এবং সেই প্রাণ সাধনাকে করিলেন তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত।

প্রাণের খেলা খেলিলেন বৃন্দাবনে এবং সেই প্রাণের লীলাই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলেন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে গীতাবক্তারূপে। শ্রীকৃষ্ণ নিজ জীবন প্রচারিত করিবার জন্যই অর্জ্জুনকে সখারূপে বাছিয়া লইলেন এবং বলিলেন "আমার জীবনের একটা তত্ত্বকথা আছে, যাহা বিশ্বকে শুনাইবার জন্যই আমি আসিয়াছি। অর্জ্জুন, তুমি এই তত্ত্বের ধারক হও, 'নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচী'। 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।' আমার এই নররূপে জন্মের যে তত্ত্বকথা তাহা বিশ্ববাসীকে শুনাও।" অবতার মাত্রেরই জন্মের একটা তত্ত্বকথা থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত সেই প্রাণতত্ত্বই কালের পথ বাহিয়া

প্রকাশের পথে মূর্ত্ত হইলেন নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গরূপে। বিশ্বের প্রাণ প্রিয় গৌর প্রিয় নবদ্বীপে, প্রিয় ভাগীরথীর তীরে, নিজ প্রিয় অদ্বৈতাদি পরিজনকে লইয়া প্রাণের খেলা খেলিলেন এবং সেই প্রাণতত্ত্বকে নিজ জীবনে আস্বাদন করিলেন ও প্রিয়পার্ষদ শ্রীরূপ সনাতন, শ্রীজীব গদাধর-আদিকে আস্বাদন করাইলেন। গৌরাঙ্গের সেই প্রাণতত্ত্বকে বুকে লইয়া গৌর ভক্তগণ দিকে দিকে ছড়াইয়া দিলেন, মানুষ কিছুদিনের জন্য জুড়াইল। সেই প্রাণতত্ত্বই কালের হিল্লোলে দুলিতে দুলিতে প্রকটিত হইলেন পানিহাটীতে শ্রীনিত্যগোপালরূপে। এবার তিনি সেই প্রাণতত্ত্বের একটি দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন মানসে বসিয়া গেলেন জড়াজড় সমন্বয়। বেদান্ত প্রচারিত ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রাণের লীলার সহিত একাসনে স্থাপনা করিয়া এই দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ বিশ্বের কাছে এক অপূর্বরূপে দেখা দিয়াছিলেন তিনি। কিন্তু এই মহীরুহের বীজকে ধারণ করিয়া বিশ্বের দাবদগ্ধ সমস্যা সমাকুল জীবন জুড়াইবে কে? তাই তিনি সংগে আনিয়াছিলেন নিজ সহচরকে যাঁহার জীবন ছিল প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরপূর, কিন্তু সেই প্রাণ ছিল তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। সেই মহানপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বরিশাল জেলার কাঁকরধা গ্রামে ১২৯০ সনের ৪ঠা অগ্রহায়ণ সোমবার কার্ত্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে। পিতা ৺নীলকমল ঘোষ, মাতা ৺মুক্তকেশী আদর করিয়া নাম রাখিলেন শরৎকুমার। এই শরৎকুমার শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায়ই সুন্দর মধুর ও স্নিগ্ধ ছিলেন যাঁহার ছায়া তলে আসিয়া আমাদের ন্যায় তাপদগ্ধ প্রাণ জুড়াইয়া ধন্য হইয়াছে।

সেই পরমসুন্দর শিশুটি পিতামাতা এবং ঘোষ পরিবারের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া ক্রমে বড় হইতে লাগিলেন। কিন্তু শিশুর বয়স ছয় বৎসর হইল তবুও তাহার মুখে কথা ফুটিল না। পরিবারের সকলেরই দুঃখ যে, এমন সুন্দর শিশু অথচ কথা বলিতে পারে না। মাতা মুক্তকেশী পুত্রের মুখে কথা ফুটাইবার জন্য নানাপ্রকার ব্রতাদি করিতে লাগিলেন। বোবা রাজার ব্রত বলিয়া একরূপ ব্রত আছে তাহা করাতেই নাকি একদিন শিশুর মুখে কথা ফুটিল। সেদিন পিতামাতা ও পরিবারের লোকের কি আনন্দ! ছয় বৎসর নীরব তপস্যা করিয়া শরৎকুমার যে বাণী পাইলেন তাহা বিশ্ব সেবায় অর্পিত হইল, বর্ত্তমান যুগের নূতন দর্শন তাঁহার সাধনাস্নাত বাণীর ভিতর মূর্ত্ত হইয়া উঠিল, মায়ের সাধনায় কথা ফুটিল, মাতৃ সাধক শরৎকুমার সারাজীবন বিশ্বমায়ের জয়গান করিয়াই চিরদিনের মত নীরব হইলেন।

শরৎকুমার মাতৃভক্ত ছিলেন, মাকে খুবই ভালবাসিতেন। মাতা মুক্তকেশী ছিলেন সোজা সরল প্রকৃতির লোক এবং রুগ্না। একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিল নীলকমল ঘোষের। তখনকার সমাজ ছিল পুরুষ কৌলীন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেজন্য মাতা মুক্তকেশীর উপর অনেক অবিচারই হইয়াছে। শরৎকুমার মায়ের উপর এই অবিচার দেখিয়া খুবই বেদনা বোধ করিতেন। শরৎকুমার বিনয়, ধৈর্য্য, সরলতা, কৃতজ্ঞতাবোধ, আত্মসম্মানবোধ ও অন্যকে মর্য্যাদা দান, সর্বোপরি সকলকে ভালবাসা এই সমস্ত সৎগুণ লইয়াই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অসত্য এবং কাহারো

প্রতি কাহারও শোষণ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। সাধনা করিয়া সৎগুণরাশী তাঁহাকে অর্জ্জন করিতে হয় নাই। তিনি ছিলেন স্বভাবসিদ্ধ পুরুষ, শ্রীনিত্যগোপালের প্রিয় পার্ষদ। বুদ্ধি হইবার পর হইতেই তাঁহার বুকের ভিতর এক কান্নার সুর সব সময়ের জন্যই বাজিত; তাই তো তিনি কোন বাজে আমোদ প্রমোদে যোগ দিতে পারিতেন না, নিজের মনে থাকিতেন, একেবারেই কুনো ও লাজুক মানুষ ছিলেন। দুর্গামূর্ত্তি তাঁহার ভাল লাগিত, আশ্বিন মাসে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া কিশোর শরৎকুমার কাঁদিয়া আকুল হইতেন। খেলাধূলা ফেলিয়া শরৎকুমার চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া মা মা বলিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতেন। না কাঁদিলে তাঁহার ভাল লাগিত না, মাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, কোনদিন যদি কান্না না পাইত তবে মাতৃবিয়োগ কল্পনা করিয়া কিছুক্ষণ কাঁদিয়া লইতেন, এমন পাগল শরৎকুমার ছিলেন। বৃন্দাবনে একদিন রাধারাণীর জীবনে যে কান্নার ইতিহাস ভাগবত রচনা করিয়াছেন, নদীয়ায় পাগল গোরার চোখের জলের যে ইতিহাস রচিত হইয়াছে, সেই কান্নার সুর শরৎকুমারের বুকের ভিতর বাসা বাঁধিয়াছিল, তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন শুধু কাঁদিয়াই গিয়াছে। স্বামীহারা বিধবা, পুত্রহারা জননীর চোখে আর কতটুকু জল, বাংলার হাজার হাজার স্ত্রী পুরুষ দেখিয়াছে সে চোখের কি জল! কিসের এ কান্না? শুধু মানুষ তোমরা, সত্যিকার মানুষ হও, কেহ কাহাকে শোষণ করিও না, সকলে সকলকে নিজবোধে ভালবাস, এই তো

তাঁহার সারাজীবনের কান্নার মূল অর্থ ছিল।

১২ বৎসর বয়সে শরৎকুমার কাঁকরধার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য গেলেন এবং এক আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বনামধন্য বরিশালের অশ্বিনী দত্ত এবং তাঁহার স্কুলের মহামহীয়ান শিক্ষকগণের সংস্পর্শে যাইয়া শরৎকুমারের হৃদয়স্থিত ভগবৎভাব ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। আদর্শ কর্ত্তব্যপরায়ণ শ্রীযুক্ত কালীশ পণ্ডিত মহাশয় এবং মহীয়ান পুরুষ নিষ্কলঙ্ক চরিত্র চিরকুমার শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নির্ম্মল চরিত্র শরৎকুমারকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এই দুইজনের জীবন আদর্শ তাঁহাকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পোষাক ছিল গায়ে মোটা চাদর, পায়ে একজোড়া চটি জুতা। শরৎকুমার সেই যে মোটা চাদর গায়ে দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাহাই চালাইয়া গিয়াছেন। বলিতেন, জীবনে একটি মাত্র জামা ব্যবহার করিয়াছি, যে দিন স্কুলে ম্যাজিস্ট্রেট-আদি আসিত সেইদিন একটু পরিয়া যাইতাম। পরবর্ত্তী কালে পায়ে জুতা পর্য্যন্ত ছাড়িয়াছিলেন। শুধু পায়ে, চাদর গায়ে সারা বাংলা তিনি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র-দের প্রতিদিনের ডায়েরী লিখিয়া শিক্ষককে দেখাইতে হইত প্রতিদিন কে কি পরোপকার করিয়াছে তাহা শিক্ষকদের নিকট বলিতে হইত, প্রতি সপ্তাহে জগদীশবাবুর গীতার ক্লাসে

উপস্থিত থাকিতে হইত। শেষ জীবনে জগদীশবাবু শরৎকুমারকে দিয়াই নিজে উপস্থিত থাকিয়া গীতার ক্লাস করাইয়াছেন। যে লাজুক ছাত্র শিক্ষকের সামনে বসিয়া একদিন ভয়ে ভয়ে গীতার ব্যাখ্যা করিতেন তিনিই একদিন বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ বক্তা রূপে পরিচিত হইয়াছেন। সত্য, প্রেম, সরলতা ছিল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের আদর্শ, শরৎকুমার সানন্দে সেই আদর্শকে জীবনে বরণ করিয়া লইলেন, তাহাই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক জীবনধারার গতি। তিনি স্কুলে যাইতেন আর বাকী সময় নিজের ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিতেন, বলিতেন "বরিশালের অত সুন্দর নদীর তীর সেখানেও কোনদিন বৈকালে বেড়াইতে যাই নাই"। স্কুলের বই ছাড়া বাহিরের বই পড়ার পৃথক সময় ছিল এবং সেই সমস্ত বই শিক্ষকেরা স্থির করিয়া দিতেন, সেই সময় হইতেই প্রচলিত ভক্তির পথেই মন তাঁহার গড়িয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার রচিত উজ্জ্বল ভারত পুস্তিকায় তিনি নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'বাল্যকালে গান শুনতাম "অসার সংসারের মায়া ছাড়রে একবার"। গানের ছাপ মনের উপর গাঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। ভাবতে লাগলাম সংসার মিথ্যা, লেখাপড়া, ঘর সংসার, অন্নের সংস্থান, দেশের ও দশের সেবা সবই মায়া, নিম্নশ্রেণীর বিষয়ী লোকদের উহা করণীয়। যারা ভগবানকে চায়, সেইসব উচ্চশ্রেণীর করণীয় কাজ হচ্ছে সংসারের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা হরিনামে

ডুবে থাকা। এই ধারণার নেশায় স্বদেশী যুগের বিরাট আন্দোলনকে প্রাণখুলে স্বীকার করতে পারি নি; বৈষয়িক লোকদের করণীয় কর্ম্মজ্ঞানে অবজ্ঞার হাসি হেসে দূরে দূরে গা বাঁচিয়ে ভালমানুষ সেজেছি। যারা দেশের সেবা করেন, দুর্ভিক্ষে অন্নদান করেন, তাঁদের কতকটা কৃপাপাত্র মনে করতে কসুর করিনি। তথাকথিত ভালমানুষ সাধুর দল যারা কারও ধার ধারে না বা কাহাকেও ধারান না তারাই ছিলেন আমার চক্ষে খুব উচ্চ শ্রেণীর। এই উচ্চ নীচ দর্শন হঠাৎ থেমে গেল, যেদিন করুনার সাগর ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের শ্রীচরণ স্পর্শ আমার সৌভাগ্যে জুটে ছিল"।

ভক্তিমান শরৎকুমার ছুটীতে যখন বাড়ী যাইতেন, সেই সময় তাঁহাদের বাড়ীর সামনে একটি বকুলগাছ ছিল, তিনি রোজ সেই বকুলফুল তুলিয়া একছড়া করিয়া মালা গাঁথিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে কালাচাঁদ বিগ্রহের গলায় পরাইয়া দিতেন। তাঁহার ভিতর রাধাভাব লুকাইয়াছিল, যদিও তখন তিনি মা মা করিয়া কাঁদিতেন। পরবর্ত্তী কালে এই বিপ্লবময়ী রাধারাণী তাঁহার জীবনে জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে পথের বাহির করিয়া ছিলেন। তিনি দুঃখ করিয়া আমাদের নিকট বলিতেন, "আমি সোজা, সরল, লাজুক মানুষ ছিলাম, মাকে ডাকিতাম। আমি ত রাধাকৃষ্ণকে চাহি নাই, কেন তাঁহারা দুইজন, ঐ লাল টুকটুকে একটি মেয়ে আর ঐ একটি ছেলে আমার জীবনে প্রবেশ করিয়া আমার সকল সোয়াস্তি কাড়িয়া লইল? আমি কি

দোষ করিয়াছিলাম যে আমাকে পথে বাহির করিয়া তাহারা আমার এরূপ লাঞ্ছনা করিতেছে? দোষের মধ্যে একটি দোষ করিয়াছিলাম, ছুটিতে যখন বাড়ী যাইতাম রোজ একছড়া করিয়া কালাচাঁদকে মালা দিতাম, এখন দেখিতেছি সেই মালাই আমার জ্বালা হইয়াছে"।

মাতৃভক্ত শরৎকুমার মায়ের ভালবাসা অত্যন্ত উপলব্ধি করিতেন। চালতে মাখা খাইতে ভালবাসিতেন, ছুটিতে বাড়ী গেলেই মা চালতে মাখিয়া দিয়াছেন ইহা বলিয়া কত চোখের জলই না ফেলিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় সমন্বয়ের উদাহরণের সময় কতদিন সেইকথা বলিয়াছেন। শুধু মধুরভাবে কুলায় না, সকল ভাবের ভিতরেই আট আনা সেইভাব থাকে, অন্যগুলি থাকে দুই আনা করিয়া। স্ত্রীর চালতে মাখার কথা মনে পড়ে না, চালতে মাখার কথা মনে পড়ে মায়ের। মিছরী খাইতে ভালবাসিতেন বলিয়া বরিশাল থাকাকালীন মা মিছরী পাঠাইয়া দিতেন, সেই মিছরী খাইতেন ও মায়ের স্নেহ স্মরণ করিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতেন। হৃদয়খানি ছিল তাঁহার কৃতজ্ঞতায় ভরপূর। মানুষ যদি তাঁহার জন্য এতটুকু করিত, তিনি সহস্রবার তাহা সকলের নিকট বলিতেন। বয়স তখন ১৬।১৭ বৎসর, এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া ব্রজমোহন কলেজে এফ. এ. পড়িতেছেন, সেই সময় একবার ছুটিতে বাড়ী গিয়াছিলেন। তিনি বাড়ী থাকাকালীন তাঁহার পিতা কোন প্রজার সহিত গোলমাল করিয়া ফৌজদারী মামলা আরম্ভ করেন। সেই ঘটনাস্থলে

শরৎকুমার ছিলেন, অথচ পিতা তাঁহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বলেন। সত্যের সাধক শরৎকুমার সেই প্রস্তাব অস্বীকার করেন, তাহাতে পিতা রাগ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। শরৎকুমার পিতার তিরস্কারে বেদনাহত হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইযা যাইয়া গ্রামের এক গাছতলায় বসিয়া কাঁদিতে থাকেন। সেদিন পিতার ব্যবহারে বেদনাহত শরৎকুমার সারাদিন পিতার গ্রামে গাছ তলায় বসিয়া কাটাইলেন। গ্রামের এক বৃদ্ধা তাঁহাকে তাহাদের বাড়ী যাইয়া স্নান আহার করিতে বলায় তিনি বলিয়াছিলেন "পিতার নিকট হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্যের বাড়ী যাইয়া খাইয়া পিতাকে অপমান করিব না, যদি খাই পিতার অন্নই খাইব. নতুবা কাঁকরধায় আর কাহারও অন্ন গ্রহণ করিব না। এতখানি মর্য্যাদা বোধ তাঁহার ছিল এবং অন্যকে মর্য্যাদা দান তিনি করিতেন, সেদিন তাই অন্যের বাড়ী খাইয়া পিতার অপমান তিনি করেন নাই। শেষে পিতাই বাড়ীতে ডাকাইয়া আনেন। শরৎকুমার একদিকে যেমন নরম ও লাজুক প্রকৃতির ছিলেন, অন্যদিকে সত্যে তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল, অন্যায়কে তিনি কোনদিনই সমর্থন করিতে পারেন নাই। সংসারের রীতি অনুসারে পুরুষদের ভাগ্যে ভাল খাবার ব্যবস্থা হইত, কিন্তু বৌদের তাহা জুটিত না, ইহা লইয়া তিনি ভ্রাতৃবধূদের পক্ষ লইয়া জ্যেঠিমার সহিত কত লড়াই করিতেন। নিরীহ শরৎকুমারের ভিতর এক বিপ্লবী শরৎকুমার ঘুমাইয়া ছিল। শরৎকুমার

এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, কিন্তু তাঁহর মন ক্রমেই ভগবৎমুখীন হইতে লাগিল। সংসারে উদাসীন, লেখাপড়ায় মন দিতে পারেন না, কীর্ত্তনাদি ও সৎ আলোচনায় তাঁহার বেশী রুচি। সেই সময় বরিশাল হইতে ১৩১০ সনের ১৯শে কার্ত্তিক এক বন্ধুকে একখানা পত্র দেন, তাহা পড়িলে তাঁহার সেই সময়কার চিন্তাধারা কিরূপ ছিল তাহা বুঝা যাইবে মনে করিয়া ঐ পত্রের কিয়দংশ এখানে তুলিয়া দিলাম।

"এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব তাঁহারই বিকাশ মাত্র। নাম রূপাত্মিকা মায়া প্রভাবেই মানুষ গরু, নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র ইত্যাদি জ্ঞান হইতেছে। নাম এবং রূপ ত্যাগ হইলেই সমস্তই ভগবান বলিয়া বোধ হইবে। তখন রাম, কৃষ্ণ, আমি এবং আপনি সকলই সেই একের বিকাশ মাত্র। সমস্তই সৎ; অসৎ কি থাকিবে? তিনি যখন সৎ, তাহা হইতে উৎপন্ন তাহার বিকাশও সৎ, ইহা কখনই অসৎ নয়। তবে অসৎ দেখা মায়া প্রভাবে। যখন মায়া ঘুচিবে তখন ভাল মন্দ সৎ এবং অসৎ কিছুই নাই। সমস্তই ভগবান হইলে, সমস্ত কার্য্যই একটি লীলা মাত্র। এই যে দেখিতেছি যে একজন বেশ্যাবাড়ী যাইতেছে উহা কিছুই নয়, উহা একটি লীলা মাত্র। কেবল একটি ভগবান (পুরুষ নাম মাত্র) অন্য আর একটি স্ত্রীরূপী ভগবানের নিকট যাইয়া একটা লীলা খেলে। কোন ভগবান সাধু হইয়া তাহার নিজেরই গুণগান করিতেছে। তিনি যদি সর্ব্বব্যাপী তবে তিনি জগৎ এবং জগৎস্থ জীব জন্তু বৃক্ষ ইত্যাদি না হইয়া কি রূপে পারেন?

যাহা কিছু দৃশ্যমান সমস্তই তিনি। তবে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি সমস্তই তিনি তবে এ মায়াও তাঁরই ঘটিতেছে। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে, যদি সমস্তই তিনি এই বিশ্বাস হয় তখন মায়া সম্ভব নয়।

"আমির" জন্যই এই গণ্ডগোল। তিনি নিজেই ক্রীড়া করিতেছেন মাত্র, ভালমন্দ কিছুই নাই। "আমি" থাকিলে ভালমন্দ। তবে তাঁর যখন যা ইচ্ছা হইবে তাহাই হইবে। তিনিই "আমি" "আমি" করিতেছেন, আবার সাধু হইয়া "ঈশ্বর" "ঈশ্বর" করিতেছেন, কেবল খেলা মাত্র। পত্রে কি লিখিব, কবে দেখা হয় জানি না।

জগতের যতটুকু ছাড়িবেন জানিবেন ভগবানকে ততটুকু ছাড়িলেন, কারণ সমস্তই ভগবান। জগতে কোন লোকই (ব্রহ্ম বটে কিন্তু নাম মাত্র) বদ্ধ নয়, কারণ ভগবান কি কখনও বদ্ধ হইতে পারেন? আপনার এ দেহে তিনি কিরূপ খেলা খেলিবেন কে জানে। তবে যতদিন "আমি" থাকে। ততদিন "তুমির" নিকট "তুমি" হওয়ার জন্য কাঁদিতে হইবে। ভালই আছি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন। সব "তুমি"; কে কাহাকে উপদেশ দেন? তিনি তাঁহাকেই উপদেশ দেন। তিনি নিজেই নিজকে উপদেশ দেন। কি সুন্দর খেলা, দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা!!

আমার বিবাহ বোধহয় অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই কি ১৮ই হইবে। ভগবান কি খেলা খেলিবেন তিনি জানেন। যদি সুবিধা হয় দেখা দিবেন। তিনি দূরে নন, অতি নিকটে; প্রাণের ধন কিংবা তিনিই প্রাণ। তাঁহাকে অন্য কোথাও

তালাস করিতে হইবে না। তিনি পৃথিবী হইয়া নিজকে ধারণ, আবার যম হইয়া নিজকে সংহার (জন্ম ও মৃত্যু শব্দমাত্র, তাঁহার জন্মমৃত্যু কিছুই নাই) করেন।

সাপ হইয়া খাই আমি ওঝা হইয়া ঝারি।
হাকিম হইয়া হুকুম দি পেয়াদা হইয়া মারি॥
হরিবল! হরিবল!! হরিবল!!!"

পুত্রের এইরূপ সংসারে বৈরাগ্য ভাব দেখিয়া পিতা নীলকমল ঘোষ পুত্রকে সংসারী করিবার মনস্থ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঢাকা জেলার শ্রীনগর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত কাশীনাথ বসুর তৃতীয়া কন্যা শ্রীযুক্তা ঊষাঙ্গিণী দেবীর সহিত বিবাহের সম্পর্ক স্থির হইল। মেয়ে দেখিতে খুব সুন্দরী, বয়স ১৩ বৎসর। শরৎকুমার মাত্র অগ্রহায়ণে ২১ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। সেই ১৩১০ সালের (ইং ১৯০৩) অগ্রহায়ণ মাসে শুভবিবাহ হইয়া গেল। উদাসীন শরৎকুমার বড় লোক শ্বশুরের জামাতা হইয়া অনেক কিছু যৌতুক পাইলেন, কিন্তু জীবনে কখনও তাহা ব্যবহার করিলেন না। বহুমূল্যের একজোড়া শাল আজও আলমারিতে রক্ষিত আছে যাহা, দোকানের ভাঁজ করা সেলাই সমেত, পোকায় এবং দীর্ঘদিন ঐ ভাবে থাকায় স্তরে স্তরে খসিয়া গিয়াছে। জামাইএর এইরূপ উদাসীন ভাব দেখিয়া শ্বশুরের খুব দুঃখ হইয়াছিল, কিন্তু শরৎকুমারের স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা

এবং সকলের প্রতি প্রীতি ব্যবহারে একদিন তিনিই বলিয়াছেন, "শরৎ আমার শিবের মতন জামাই"। শরৎকুমারের ভগবৎ-প্রেমে পাগল প্রাণ; পিতার আদেশে তিনি বিবাহ করিতে গেলেন কিন্তু প্রথম দিন রাত্রিতে স্ত্রীকে কাছে লইয়া ভগবানের নাম করাইয়া পাশে শোয়াইয়া রাখিলেন ও বলিলেন আজ হইতে আমরা দুইজন মিলিয়া শ্রীভগবানের সেবক সেবিকা রূপে তাঁহার সেবা করিব ও তাঁহার সংসারের সেবা করিব।

শরৎকুমার বিবাহের পর দ্বিতীয়বার যখন শ্বশুরালয়ে গেলেন, উষাঙ্গিনী দেবীর রাত্রে স্বামীগৃহে যাইতে খুব লজ্জা, ভগিনীগণ জোর করিয়া ঘরে রাখিয়া গেলেন। অল্প বয়স্কা মেয়ে, কিছুক্ষণ একপাশে শুইয়া থাকিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। শরৎকুমারের নিজমুখে শোনা, তিনি নাকি তাঁহাকে না জাগাইয়া সারারাত্রি দেশলাইএর কাঠি জ্বালাইয়া জ্বালাইয়া মুখ দেখিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনেও আমরা নদীয়া লীলায় দেখিতে পাই কী গভীর দাম্পত্য প্রেম। যেদিন বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়া যাইবেন সেদিনও কত আদর করিয়া তাঁহাকে ফুলসাজে সাজাইয়া ছিলেন, ছাড়িয়া যাইবার দৃশ্যও কি করুণ! সেদিন ছাড়িয়া যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ছাড়িয়া রাখার দর্শন সে যুগে ত আসে নাই, তাই তিনি বলিয়াছিলেন—"মনে করি ঘরে রহি, রহিতে না পারি। প্রাণ টানে কি করি করি"। বাহিরে বিশ্বের ডাক আসিয়াছে, কি করিয়া ঘরে থাকিবেন বিশ্বপ্রেম যাঁহারা বুকে লইয়া ধরার বুকে আসেন, তাঁহারা কি

করিয়া স্ত্রীকে অনাদর করিবেন? শরৎকুমারও প্রাণ ঢালিয়া সকলকে ভালবাসিয়াছেন এবং সকল সম্পর্কের যথাযথ মূল্য প্রদান করিয়াছেন। বিবাহের পর হইতেই সমস্ত সৎ গ্রন্থ কিনিয়া উষাঙ্গিণী দেবীকে পাঠাইতেন। ছুটীর সময় বাড়ী আসিলে রাত্রে লেখাপড়া শিখাইতেন। যাহার প্রতি যতখানি দায়িত্ব তাহা তিনি প্রাণপণে পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনে কোন অভিনয় ছিল না, যাহা করিয়াছেন তাহা বাস্তব ভাবেই করিয়াছেন। একবার ছুটীর সময় বরিশালে বিল্বমঙ্গল নাটক হইল, শরৎকুমার বিল্বমঙ্গলের পাঠ লইয়াছিলেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া সে কি কান্না! কোথাও তাঁহার জীবনে ফাঁকি ছিল না। তাঁহার কাছে যে এই জগতটা বাস্তব সত্য, তিনি যে ব্রহ্ম সত্য মায়া সত্য এই মতবাদের প্রচারক, তাই প্রথম জীবন হইতেই তাঁহার অন্তর দেবতা তাঁহার জীবন-নদীর ধারা সেই ভাবেই প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

শরৎকুমার শ্রীনিত্যগোপালের বিপরীত ধর্ম্মের সমন্বয় বীজ ধারণ করিয়া বিশ্বে প্রচারিত করিবেন তাই তাঁহার আধার খানি ছিল জন্ম হইতেই এক বিপরীতের সমন্বয়ে ভরপুর। তিনি সংসার এবং সন্ন্যাসের সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন তাই তাঁহার জীবনের মাঝে পাশাপাশি ছিল ভগবৎ প্রেম ও দাম্পত্য প্রেম। ২০ বৎসর বয়সে তাঁহার লেখা “মা দুর্গাকে উদ্দেশ্য করিয়া জীবনের এক পৃষ্ঠা” নাম দেওয়া একখানি পত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা পড়িলেই বুঝা

যাইবে, একজন ২১ বৎসরের যুবক এবং নূতন বিবাহিত, কিন্তু তাঁহার কি জীবন-জিজ্ঞাসা।

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণম্

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু, ২রা মাঘ, ১৩১০

"জীবনের এক পৃষ্ঠা"

দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে। প্রত্যেক বৎসর, প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্ত্তে কত কার্য্য জীবনে ঘটিতেছে, ইহাদের মধ্যে কোন কার্য্য দুঃখজনক এবং কোন কার্য্য সুখজনক মনে করিতেছি, কিন্তু ইহা দেখিতেছি না যে এই প্রত্যেক কার্য্যের মূলেই কোন এক মহতী ইচ্ছা কার্য্য করিতেছে এবং প্রত্যেক কার্য্যের উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং জীবের মঙ্গলজনক। জীবনের প্রত্যেক কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই তত্ত্ব সম্যক দেখা যায়; কিন্তু আমাদের কি সে সৌভাগ্য হয়? যাহাকে আপাততঃ দুঃখজনক মনে করিতেছি তাহাই হয়ত প্রকৃত সুখের নিদান। মানুষ, যে না কি ভবিষ্যতের একমুহূর্ত্তের কথা বলিতে পারে না, সে অমনি আপাততঃ দুঃখকে প্রকৃত দুঃখ মনে করিয়া সেই মঙ্গলময়, পরাৎপর, সুন্দর, জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থান ও হৃদয়ের একমাত্র আরামকে বিষ নয়নে দেখিয়া কত দোষারোপ করিতে থাকে, কত কঠোর বাক্য বলিতে থাকে। যিনি জীবের প্রত্যেক কার্য্যের মূলে, যিনি একমাত্র সম্বল, যিনি আছেন তাই আছি,

এমন যে সুন্দর সৌম্য, তিনি কি আমাদের কখনও কষ্টের কারণ হইতে পারেন? ইহা কখনই সম্ভব নয়। তবে তাঁহাকে মঙ্গলময় বলি কেন? তবে সময়ে সময়ে কঠোর বলিয়া মনে হয় এবং এইটুকুই তাঁহার মধুরতা! শুধু কোমলত্ব কি শুধু কঠোরত্ব আদরের হইতে পারে না, কিন্তু উহাদের সংমিশ্রণই প্রকৃত পূর্ণত্বের পরিচায়ক। তবে ঐ যে কঠোরত্বটুকু দেখা যায় উহা কঠোরত্বের ছাঁচে গড়া কোমলত্ব। যিনি তাঁহাকে একবার বুঝিয়াছেন এবং একটুও দয়া উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি তাঁহাকে কখনও নির্দ্দয় কি কঠোর বলিতে পারিবেন না। যাঁহার নামের প্রতি রেণুতে অমৃত বর্ষণ হইতেছে, যাঁহার নাম স্মরণ মাত্র প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ এবং বলের সঞ্চার হয়, যাঁহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রাণ তাঁহাকে হৃদয়ের অন্তস্থলে রাখিতে চায়, এমন যে মধুরতাময় ভগবান, তাঁহার দর্শন যে কত মধুর ইহা কে বলিবে? যিনি এরূপ ভাগ্যবান তিনিই সাক্ষ্য দিবেন। একবার তাঁহার করুণা বর্ষণ হইলে দুঃখও দুঃখ বলিয়া মনে হয় না। তখন সেই দুঃখই ভগবানের মনে করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে এবং বলে "আরও দেও, আরও দেও"। এমন যিনি, যাঁহার নামের এত মহিমা তিনি কি কখনও মঙ্গলময় না হইয়া পারেন? এ বিষয়ে জীবনের একটি ঘটনা না লিখিযা পারিলাম না। প্রভু! তোমার করুণা যেন প্রতি কার্য্যে দেখিতে পাই। কখনও তোমার নামটা ভুলাইও না; প্রভু, তোমার নামটা যেন রক্তমাংসের সংগে একত্র করিয়া নিতে পারি। মাগো!

যে মায়াদ্বারা তুমি নিজে নিজেকে ভুলাইতেছ, সেই মায়া আমার কাছে আনিও না, মাগো! আমি তো অজ্ঞান, কিছু বুঝি না। যে মায়ায় নারদকে ভুলাইয়াছিলে, আমি সেই মায়া নিজে অতিক্রম করিতে পারিব? মা, আমার শক্তি কোথায়? দয়াময়ি! পাছে পাছে থেকো, আমায় ছেড়ে যেওনা। আমার ত তুমি বিনে কেউ নাই। জয় মা দুর্গা! জয় দুর্গা! জয় কৃষ্ণ! জয় রাম! জয় সীতারাম! জয় শিবদুর্গা! জয় রাধাকৃষ্ণ! জয় কালী প্রসন্ন! তোমার নাম ঘরে ঘরে বিস্তীর্ণ হউক, আমি দেখিয়া প্রাণভ'রে কাঁদি আর বলি, হরিবল! হরিবল!! হরিবল!!! গগন তোমার নামে পূর্ণ হউক, দিগদিগন্তরে তোমার নাম গীত হইয়া জীবের প্রাণ শীতল হউক। তোমার মহিমা ঘোষিত হউক, প্রভু। দেখিও, ভুলাইও না, মাগো! তুমি ভুলাইলে জগৎ ভোলে।

এন্ট্রান্স পরীক্ষার পর যখন বিবাহমদে মত্ত হইয়া কুচিন্তার (ভগবানের সম্পর্ক ব্যতীত অন্য চিন্তা) স্রোতে প্রাণমন ভাসাইয়া দেই এবং ব্যাকুল চিত্ত হইয়া, মাগো! তোমার কাছেই বা বিবাহের জন্য কত কাঁদিয়াছিলাম, কত সময় মনে করিতাম, মাগো! তুমি বুঝি নির্দ্দয়, তুমি আমার কাতর প্রার্থনা না শুনিয়া তোমার ইচ্ছামতই করিয়াছ। মা, আমি অজ্ঞান হইয়া অধঃপাতে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম তখন কি জানিতাম যে এখন আমার বিবাহ হইলে চিরদিনের তরে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইব? প্রভু! ভবিষ্যতের ত একটুও

দেখি না, তাই তোমাকে কত নিন্দা করিয়াছি। দয়াময়ি! তুমি যে কতখানি মঙ্গলের জন্য করিয়াছ তাহা এখন দেখিতেছি। তখন তুমি যদি আমার ইচ্ছার প্রতিকূলে কার্য্য না করিয়া অনুকূলেই করিতে, তবে মাগো! তোমার দাসের কি অবস্থা হইতে পারিত তাহা ত বুঝিতে পার। মাগো! নিজের অবস্থা নিজে বুঝি না বলিয়াই এই সকল মূর্খতার পরিচয় দিতেছি। যদি নিজের সামর্থ্য বুঝিতাম তবে মাগো! এইরূপ কুটিল হইতে পারিতাম? তুমি আমার চেয়ে আমার কিসে মঙ্গল বেশী হয় বুঝ, তবে কেন তোমাকে বিশ্বাস করি না? মাগো, সেই বিশ্বাস দেও, যে বিশ্বাসে তোমার মুখের দিকে চাতক পক্ষীর মত চাহিয়া থাকিতে পারিব। মাগো! দয়াময়ি! অহঙ্কার ঘুচাইয়া দেও। প্রভু! যাহা ইচ্ছা তোমার তাহাই কর, আমি অজ্ঞান, কিছু বুঝি না।

যখন বুঝিলাম যে এখন বিবাহ হওয়া একরূপ অসম্ভব, কারণ প্রায় সকলেই একরূপ আমার বিবাহের বিরুদ্ধে, তখন বিষণ্ণ মনে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। সেই সময়ে আবার মাগো! মনের ভীষণ পরিবর্ত্তন তুমিই ঘটাইয়া দিয়াছ। পরমহংসদেবের কথামৃত হাতে দিয়া কামিনীকাঞ্চন বিরোধী করাইয়াছিলে। স্ত্রীলোক এবং টাকা পয়সা ঘৃণা করিতাম। স্ত্রীলোক দেখিলে চক্ষু ফিরাইয়া আনিতাম। এই সময়ে আবার বিবাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া মাগো, তোমার কাছে বোধহয় বিবাহ না হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিতাম। বিবাহ

করিব না বলিয়া কতবার মনে করিয়াছি, কিন্তু মাগো! তাহা তোমাকে পাওয়ার জন্যই। যাহা হউক, সে প্রার্থনাও তোমার ইচ্ছানুযায়ী হয় নাই। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। মা! মা! মা! তোমাকে যেন বিশ্বাস করিতে পারি। করুণাময়ি! তুমি কি আমার পর যে আমার মঙ্গল দেখিতেছ না কিন্তু মাগো বিশ্বাস যেন হয়। তাই প্রভু! নাথ! জীবনধন! জ্বলন্ত বিশ্বাস দেও। দয়া কর। বিবাহে যে অলৌকিক ঘটনা দেখাইয়াছ, মাগো! তাহা ত তোমারই চাতুর্য্য। যাত্রাকালীন কে তোমার নাম করিতে করিতে কাঁদাইয়াছিল, কে বিবাহ শয্যায় স্ত্রীকে তোমার নাম লইয়া ঘুমাইতে আদেশ করাইয়াছিল, কে প্রায় সমস্ত সময়ই (যতদিন এবং যতক্ষণ স্ত্রীর সহিত দেখা হইয়াছিল) তোমার কথা বলিয়া সময় কাটাইতে প্রণোদিত করিয়াছিল, কে স্ত্রীকে মায়া বুঝাইতে আদেশ করিয়াছিল, মা ইহা কি বুঝিতে বাকী আছে? মাগো! বিবাহে যে এত তোমাকে স্মৃতিতে রাখিতে পারিব, ইহা ত পূর্বে ভাবি নাই। সকলই তোমার ইচ্ছা, তুমি রক্ষা করিতেছ এবং মাগো! এইরূপ করিও; তুমি ভিন্ন কেউ ত নাই।

মাগো! ঊষার সাথে একটু রাগের মত আসিবার দিন রাত্রিতে হইয়াছিল, তাহাও ত তোমার ইচ্ছায় হইয়াছিল। কেন? বুঝাইতে কি বাকী রাখিয়াছ? স্ত্রীকে দিয়া একটু পত্র লিখাইয়াছ, তৎপরে তাহার প্রত্যুত্তরে আমাকে দিয়া কিছু তরে ·নাই, ইহার কারণও বুঝাইয়াছ। যতদূর বুঝিয়াছি তা তো

জানই, তবে যখন লিখিতে বসিয়াছি লিখিলাম। ঐ রাগটুকু না হইলে বোধ হয় মোহেতে ডুবিতে আরম্ভ করিতাম, তাই একটু মোহ ভাঙ্গিয়া টান কমাইয়া দিলে। তৎপরে এই রাগের অবস্থায় থাকিলে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে, তাই একটু প্রণয় পত্রিকা পাঠাইয়া দিয়াছ। প্রাণে আমার আপাততঃ শান্তি আসিতে লাগিল এবং পুনরায় মত্ত হইয়া (যদিও তোমার নাম ভুলি নাই কিন্তু মোহের খেলা হইতেছিল এবং পত্রখানি তোমার কথাতেই পূর্ণ ছিল) তাহার উত্তরে ছয় পৃষ্ঠা লিখিয়াছিলাম। মাগো! যদি ঐ পত্রের পর ক্রমান্বয়ে পত্র আসিত এবং আমিও পত্র লিখিতে আরম্ভ করিতাম তবে মাগো! ক্রমে ক্রমে মনের অজ্ঞাত অবস্থায় মোহে হৃদয় অধিকার করিত। ইহাতে একটু ভুল ছিল না। কেন বুঝিতেছি, কারণ এই যে পত্র পাওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলাম, সে সময়ও তোমার নাম লইতে ভুলিতাম না, কিন্তু তাহা মুখে লওয়াই সার। এই যে উৎকণ্ঠা ইহার মূলে মোহ বর্ত্তমান। হৃদয়ে তখন সম্পূর্ণরূপে মোহের খেলা হইতেছিল, কাজেই সেই অবস্থায় যদি স্ত্রীর প্রণয় পত্রিকা ক্রমাগত পাইতাম, তবে নিশ্চয়ই মোহের আবর্ত্তে এবং আপাততঃ সুখের আশায় তোমার মধুময় নাম ভুলিতে প্রয়াসী হইতাম, তোমা হইতে দূরে সরিয়া পড়িতাম। তাই মা আমার বিপদ দেখিয়া পূর্ব্বেই তাহার পথ রুদ্ধ করিয়াছ। এখন প্রায় উৎকণ্ঠা গিয়াছে। তথাপিও একেবারে যায় নাই। এখন তোমার

মহিমা দেখিতেছি; তোমার ইচ্ছা কি বুঝিব? দোহাই মা, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কখনও যেন প্রয়াসী না হই। হইতে পারে যে, কোন সময়, কোন কারণে আমার স্বার্থনাশ হইবে, কিন্তু তাহা মা তোমার ইচ্ছা জানিয়া এবং তাহার পিছে কোন মঙ্গল নিহিত আছে জানিয়া যেন তোমার নামে প্রাণমন শীতল করিতে পারি। মাগো! ঐ সমস্ত ঘটনা ত আমার মন দৃঢ় করিবার জন্য করিয়াছ, ইহা ত বুঝাইতে বাকী রাখ নাই। সামান্য পত্র না পাওয়ায় যে ব্যাকুল হইতে পারে সে তাহার প্রিয়বন্ধুর মৃত্যুতে কি করিবে? ইহাই বুঝাইতে এতখানি তোমার খেলা। দয়াময়ি! সব কার্য্যের পিছে যেন তোমার ইচ্ছা বর্ত্তমান আছে ইহা দেখিতে পাই। মাগো তুমি ভিন্ন সংসারে কিছুতে শান্তি নাই। তুমি ভিন্ন সব অসার। তুমি থাকিলে সব আছে।

প্রাণনাথ! আর প্রবঞ্চনা করিও না, আর কাঁদাইও না, প্রাণ ত ওষ্ঠাগত! প্রাণ! দেখা দেও, জ্বলন্ত বিশ্বাস দেও, আজ তোমার নামে হুহুঙ্কার দিয়া জগৎ প্লাবিত করিয়া দি। জয় মা! জয় দুর্গা!! সেদিন কি হইবে, যেদিন শ্বাস প্রশ্বাসে তোমার নাম লইতে পারিব। মাগো! ভুলাইওনা, আর মোহে আবৃত করিয়া রাখিও না। তুমি পিছে থাকিলে ভয় কি? হরিবল! হরিবল!! হরিবল!!!

সেবকাধম

বরিশাল, রাত্রি ৭-৯টা তোমার স্নেহের অজ্ঞান,

তোমার বলে বলীয়ান্— হীন শরৎ

শরৎকুমারের জীবনের একপৃষ্ঠা পড়িলেই বুঝা যায়, তিনি কোন দিনই বিশেষ কোন মতবাদ বা নামে আট্‌কা ছিলেন না। মা ও কৃষ্ণ, দুর্গা নাম ও হরিবল জীবনে পাশাপাশি চলিয়াছে। এই আপনভোলা মানুষটীর জীবন ছিল এক বিচিত্র। যে জীবনে শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার জড়াজড় সমন্বয় বীজ বপন করিবেন সেই ক্ষেত্রকে তিনি তদ্রূপ করিয়া প্রস্তুত করিয়াই পাঠাইয়া ছিলেন। জড়াজড় সমন্বয় কথা তো একটু খানি কথা নয়? এ যে মানুষের জীবনের সকল সমস্যার একটা সমাধানের নির্দ্দেশ! এ যে পথ ও গন্তব্যস্থানের সমন্বয় বার্ত্তা। সমন্বয়ের প্রথম অধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দিয়া গিয়াছেন। যখন শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান যে যার মতবাদকে বলবৎ মনে করিয়া অন্য মতাবলম্বীকে স্বমতে আকমণ করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এক ব্রহ্মময়ী মায়েরই যে সর্ব্বরূপ, সর্ব্বরূপের ঘনীভূত মূর্ত্তিই এক ব্রহ্মরূপা মা, এই বাণী বিশ্ববাসীকে শুনাইলেন। কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, আল্লা, যিশু সবাই এক ব্রহ্মময়ী মায়ের বিভিন্ন মূর্ত্তির বিকাশ, অতএব বিশ্ববাসী, তোমরা মত লইয়া মারামারি কাটাকাটি করিও না। যত মত তত পথ, কিন্তু গন্তব্যস্থান একই। তিনি পথের কোন সমন্বয়ের কথা বলিলেন না, সমন্বয় করিলেন গন্তব্যস্থানের। তাই তাঁহার সমন্বয়, সমন্বয়ের প্রথম অধ্যায়ের দিক-দর্শন। এই স্থানে শ্রীনিত্যগোপালের প্রয়োজন রহিয়া গেল। সকল পথের সমন্বয়

করিয়া সমন্বয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় দান করিলেন শ্রীনিত্যগোপাল। শ্রীনিত্যগোপাল সমন্বয় দিলেন সর্ব্ব পথের, সর্ব্ব গম্য স্থানের, সর্ব্ব রূপের, সর্ব্ব নামের, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের। তিনি ছিলেন অখণ্ড মানুষ, সমগ্রের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, আস্তিক, নাস্তিক, বৌদ্ধ, জৈনের সকল পথের সমমূল্য স্বীকার করিয়া যে সমন্বয়, সেই সর্ব্ব সমন্বয় স্থাপন করিবার দর্শন তিনি আনিয়াছিলেন এবং তাঁহার দর্শন ও জীবন বিশ্ববাসীর নিকট তুলিয়া ধরিবার জন্য আসিয়াছিলেন তাঁহার শিষ্য পুরুষোত্তমানন্দ।

শ্রীনিত্যগোপালের সমন্বয় সর্ব্ব পথের সমন্বয়। শুধু গম্য স্থানের নহে, পথ ও গম্যস্থান দুই মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে যেখানে সেই সমন্বয় তিনি দিয়া গিয়াছেন। সকল জড়ের বুকে অজড় ও চৈতন্যের মিলন-বার্ত্তা শুনাইয়া ধরার গৌরব দান করিয়া গিয়াছেন তিনি। তাহার সমন্বয়ে জগৎ সত্য, ব্রহ্মের মতই সত্য। পথের সমন্বয় না দিলে জগৎ যে মিথ্যাই ইহাই তো প্রমাণিত হয়, এখানেই তো আবার মায়াবাদ আসিয়া দাঁড়ায়। পথের ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া, পথকে মিথ্যা বলিয়া পথের ওপারে গন্তব্য স্থান—এই কথাই এত দিনের দর্শন শাস্ত্র বলিয়া আসিয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল দেবই পথ ও গন্তব্য স্থানের সমন্বয়ের এই অভিনব শাস্ত্র বর্ত্তমান জগতের সামনে রাখিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির লড়াইয়ে পথের মাঝে মানুষ শ্রান্ত ক্লান্ত দিশেহারা, দিশারী শ্রীনিত্য-

গোপাল এই মৃত বিশ্বের সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়া গিয়াছেন তাঁহার পথ ও গম্য স্থানের সমন্বয়ের ভিতব দিয়া। সর্ব্বপথের সমন্বয়ের মাঝেই জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির লড়াই মিটিয়া গিয়া তাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব গৌরব লইযাই এক মিলনমঞ্চ গড়িয়া উঠিতে পারে। সর্ব্ব পথের সমন্বযেই বাস্তবেব ক্ষেত্র এই জগৎ ব্রহ্ম মূল্যে স্বীকৃত হয়।

যখন আমাদের দেশে রেলগাড়ী ছিল না, পুরীতে জগদ্বন্ধু দেখিতে হইলে মানুষ হাটা পথে রওনা দিত, মাসেব পর মাস তাহার পথ চলার ভিতব দিয়া তাহার গন্তব্য স্থান তাহার জীবনে নিত্য নূতন রসের সঞ্চার করিত। প্রতি পদক্ষেপে প্রিয়তমকে পাইবার লালসা তাহার জীবনের উদ্দাম গতিকে আকুলিত রসায়িত করিয়া তুলিত। বর্ত্তমানের আরামে রেলগাড়ীতে ঘুমাইযা যে জগবন্ধু দর্শন করিতে গেল, তাহাব যাওয়া আর পথ হাঁটিয়া যে গেল তাহার যাওয়া কি এক? পথই গন্তব্য স্থানকে গড়িয়া তোলে। পথ চলার সকল ঝঞ্ঝাটের ভিতর দিয়া পথ চলার সকল আবেষ্টনের ভিতব পথিক যখন পলে পলে গন্তব্য স্থানের প্রিয়তমের নিকট আত্ম সমর্পণ করিতে করিতে চলে, তখনই পথের ফাঁকে গন্তব্য স্থান এক হইয়া যায়। পথিক তখন অনন্ত পথে অনন্ত কাল চলিতে থাকে, তাহার পথের মোহ, গন্তব্য স্থানের মোহ আর থাকে না, তাহার জীবনে পথই গন্তব্য স্থান, গন্তব্য স্থানই পথ হইয়া যায়। তখনই মানুষ পথ ও গন্তব্য স্থানের হুড়াহুড়ি হইতে মুক্ত হয়। দার্শনিক ভাষায় ইহাই দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয়।

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগীর মনোভাব যে-শরৎকুমারের ভিতর গড়িয়া উঠিয়াছিল, মেয়ে মানুষ দেখিলে যিনি চক্ষু ফিরাইয়া অন্য পথে চলিতেন, সেই শরৎকুমার পিতার ইচ্ছায় বিবাহ করিলেন এবং স্ত্রীকে ভজনার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। ইহার মূলে ছিল ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষের চিন্তাধারা। তাহার নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন প্রকৃতিকে ভজনার দৃষ্টিতে না দেখিয়া বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখিলে প্রকৃতি গোপন পথে, আসক্তির পথে আসিয়া তাহার ভগবৎ পথের গতি রোধ করিবে। শরৎকুমার যে পথে চলিয়াছিলেন উহা তাঁহার সত্যকার পথ ছিল না। তাঁহার প্রথম জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় কত অল্প বয়সে, কত দ্রুত তাঁহার চিন্তাধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার স্বরূপে তিনি স্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যে ট্যাকে টাকা ও সমাধি যাঁহার জীবনে একসঙ্গে চলিত সেই শ্রীনিত্য-গোপালের চরণ প্রান্তে নিজকে বিলাইয়া দিয়া ঝড়ের মুক্তি গ্রহণ করিবেন এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই ধরায় আসিয়া ছিলেন। প্রকৃতির হাত হইতে নিজকে সরাইয়া কোণে-বনে মনে সাধনা তো তাঁহার সাধনা নয়? তাঁহার সাধনা ঝড়ের সাধনা. বাদ দেওয়ার ভুলে যে বিপদ নামিয়া আসে, তাঁহার জীবন-দেবতা তাঁহাকে সে পথে পরিচালিত করিবেন কেন। তিনি আসিয়া-ছিলেন মানুষের সত্য পথের দিশারী হইতে, তাঁহার পথের ভুল হইবে কেন? এই ঝঞ্ঝাটের বুকে কেমন করিয়া শান্তিলাভ হয়, মুক্তির আস্বাদন পাওয়া যায়, এই গতির বুকে কেমন করিয়া

স্থিতি মিলে এই চিন্তাধারা তাঁহার প্রাণকে সেই সময় আলোড়িত করিতে লাগিল। সংসার ছাড়িতেও পারি না, রাখিতেও পারি না এই দোটানার অবস্থাই ভক্তির অবস্থা। এই মনের অবস্থা লইয়া বিবাহের পর শরৎকুমার বি, এ পড়িতে কলিকাতা যান। শ্রীভগবান যাহাকে আকর্ষণ করিতেছেন, প্রকৃতিদেবী তাঁহার পথ কাটিয়া দিবার জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি প্রতিনিয়তই তাঁহাকে করিয়া দেন। কলিকাতায় অধ্যয়ন কালেও কয়েকজন ভক্তের সংগ তাঁহার জুটিল, তাঁহাদের সহিত ভগবৎ প্রসংগে আনন্দেই দিন কাটিতে লাগিল। নব বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি টান এবং প্রবল বৈরাগ্যের টান, প্রাণ যে তাঁহার কিসের টানে কোন অজানার পথে ঝাঁপ দিতে চায়, এই দুই বিপরীতের সমাবেশে তাঁহার জীবন যাত্রা সুরু হইল। স্ত্রীর প্রতি যে অনুরাগ তাহা সাধারণ স্তরের ছিল না। সেই সময়ে ঊষাঙ্গিণীদেবীর নিকট যে সমস্ত পত্র দিয়াছেন তাহার ভিতর থাকিত শুধুই ভগবৎ প্রসঙ্গ। সেই সমস্ত উপদেশপূর্ণ পত্রের কয়েক লাইন এখানে তুলিয়া দিলাম।

"তোমার নৈতিক উন্নতির দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং না করাই ঘোর পাপ। তাই পূর্ব্বে লিখিয়াছি এবং এখনও লিখি, মায়ের নাম জপ করিও। নাম ব্যতীত জগতে প্রকৃত শান্তি কিছুতেই নাই। হয়ত সংসারে কত জিনিষ আপাততঃ মধুময় বোধ হইবে কিন্তু ভগবান ব্যতীত ঐ সকল পদার্থ বিষবৎ কার্য্য করে।

একটি গান আছে—"খাবি দাবি সব করবি একবার একবার হরি কবি। কোন কথায় নাইকো বেজার রে, সকল বজায় রাখতে পারবি"। খাও দাও বেড়াও কিংবা যাহাই কর, সর্ব্বদা নামটি লইতে যেন ভুল না হয়।...সংসারের সংগে ভগবানের যোগ না থাকিলে সংসার বড়ই ভয়প্রদ, কিন্তু তাঁহাকে অনুভব করিতে পারিলে সংসার তাঁহারই মনে করিয়া প্রাণে শান্তি আসিতে থাকে, তাই কোন কার্য্যে অশান্তি আসে না। মায়ের নাম লইও। নামই কলির তপস্যা"।

কি অদ্ভুৎ, কি অপূর্ব্ব জীবন শরৎকুমারের! যে যুবকের দুইমাস হইল বিবাহ হইয়াছে তাঁহার স্ত্রীর নিকট লিখিত পত্র কি এই! স্বভাবসিদ্ধ প্রেমিক শরৎকুমার বিশ্ব এবং বিশ্বনাথের ভালবাসায় পাগল। সেই পাগল প্রাণকে সামলাইয়া লেখাপড়ায় বিশেষ করিয়া মনোযোগ দিতে পারিতে ছিলেন না।

এইভাবে একবৎসর কাটিয়া গেল, ১৩১২ সনের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার জীবনের এক অধ্যায় শেষ হইয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে পদার্পণ করিল। সেইদিন প্রকৃতির এক প্লাবনের ধাক্কা তাঁহাকে শ্রীনিত্যগোপালের শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া ছিল। শরৎকুমারের জীবন কোন্ খাতে বহিবে তাহা তখনও স্থির হইয়াছিল না। শরৎকুমার প্রচণ্ড প্রেমিক, আর একদিকে প্রচণ্ড বৈরাগী। তাঁহার বাহিরের রূপটাতে তখন পর্য্যন্ত প্রচণ্ড প্রচলিত বৈরাগ্য বাদ। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে প্রেম আর বৈরাগ্যের সামঞ্জস্যের

ভিত্তিতে নূতন কালের নূতন ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ যিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার জীবনের এক বিপর্য্যয় টানিয়া আনিল তাহাকে এই সামঞ্জস্যের বর্ত্তমানকালের বীজপ্রদ পিতা ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব (শ্রীশ্রীমৎ অবধূত যোগাচার্য্য জ্ঞানানন্দ দেব) এর পাদদেশে।

শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র পাল শরৎকুমারের এইরূপ প্রাণের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, চল তোমাকে আমার গুরুদেবের নিকট লইয়া যাই। তিনি সৎগুরুর আশ্রিত ছিলেন। তাঁহার গুরুই শ্রীনিত্যগোপাল। শ্রীনিত্যগোপাল তখন নবদ্বীপ আমপুলিয়া পাড়ায় অবধূত আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। ১৩১২ সনে ১১ই অগ্রহায়ণ স্বরূপগঞ্জের পথে নিতাই পাল ও শরৎকুমার নবদ্বীপ রওনা হইলেন। শরৎকুমার ছিলেন রামকৃষ্ণদেবের কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের দলের লোক কিন্তু আমপুলিয়া আশ্রমে একটি বয়স্কা মহিলা থাকিয়া শ্রীনিত্যগোপালের সেবা করিতেন এবং অন্যান্য মহিলা শিষ্যাও তাঁহার ছিল। শরৎকুমার ইহা দেখিয়া মহা দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং দুইদিন কেবলি মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিলেনঃ আমাকে কোথায় আনিয়া ফেলিলে, আমি যেন সদ্‌গুরু পাই, সত্য পাই। এইরূপে চিন্তা মেঘ কাটিয়া ১৩ই অগ্রহায়ণ (ইং ১৯০৫) রাধাষ্টমীর দিন শরৎকুমারের জীবনে ২২ বৎসর বয়সে শ্রীনিত্য-চন্দ্রের কৃপা বর্ষিত হইল। শ্রীনিত্যগোপাল কাছে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমার শ্রীভগবানের কোন নাম ভাল লাগে?

শরৎকুমার বলিলেন—দুর্গা নাম।

শ্রীনিত্যগোপাল বলিলেন—এখন তোমাকে মায়ের নামই দিলাম, এক বৎসর পর বদলাইয়া দিব।

শরৎকুমার দীক্ষার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাকে কি মানিয়া চলিতে হইবে?

শ্রীনিত্যগোপাল বলিলেন—মাছ, মাংস খাইতে পার, ডিম না খাওয়াই ভাল, এক শত আটবার জপ করিও, না পারিলে আঠার বার করিতে পার।

পরে কোন এক সময় শরৎকুমার বলিয়াছিলেন—আমি আপনাকে সকল দিন প্রণাম করিতে পারিব না, আসিয়া একটি প্রণাম করিব এবং যাওয়ার দিন একটি প্রণাম করিয়া যাইব।

শ্রীনিত্যগোপাল বলিলেন--তোমার সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই রহিল, তোমার যাহা ভাল লাগে তাহাই করিও।

দীক্ষা লইয়া শরৎকুমার নূতন প্রেরণা লইয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল ভারত পুস্তিকায় লিখিয়াছেন--"শ্রীনিত্যদেবের সহজ জীবনের সহজ স্পর্শ যার ভিতরে পরস্পর বিরোধী মতবাদসমূহের খণ্ডন নাই, আছে শুধু মণ্ডন সেই স্নেহস্পর্শ আমার সারা জীবনের চিন্তা ধারাকে একদম উল্টে দিয়েছিল। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনতাম 'আমি বিশ্ব নাগরিক, আমি জগৎকে নূতন করে দেখতে শিখলাম। জগৎকে নূতন করে গড়বার দুস্ট সাহস ধীরে ধীরে আমার বুকের মধ্যে কে যেন সঞ্চারিত করে দিচ্ছিল। আমার ভাল মানুষ-"আমি"

যেন কতকটা লড়াইয়ে-আমিতে পরিণত হতে যাচ্ছিল। ভাল মানুষ হওয়ার অর্থ গোবেচারা হয়ে থাকা নয়, ভাল মানুষ লড়াই করবে, আর লড়াইয়েরা ভাল মানুষ হবে, এ দর্শন ঠাকুরের কৃপায়, তা ভাল কি মন্দ জানি না, আমার কপালে জুটল"।

পরবর্ত্তীকালে শরৎকুমার বক্তৃতাকালে এবং আমাদের নিকট প্রায়ই বলিতেন, যে সময় আমার জীবনের সবচেয়ে বিপর্য্যয়ের সময়, ডুবিয়া যাইবার দিন সেই সময়েই আমার সবচেয়ে কল্যাণের পথ নামিয়া আসিল, শ্রীনিত্যগোপালের অভয় পাদপদ্মে আশ্রয় পাইলাম। "করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে। সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া এনেছ তোমার দুয়ারে"॥ আর একটি কথা তিনি বলিতেন—যদি নবদ্বীপ যাইয়া ঠাকুরকে প্রকৃতি পরিবেষ্টিত না দেখিতাম, তাহা হইলে তাঁহার জীবন ও দর্শন আজ আমার নিকট বুঝিবার পক্ষে এত সহজ হইত না। প্রথমে আমি নিত্যগোপালকে মহাপুরুষ মনে করিয়াই তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। ক্রমে তিনি আমার জীবনে ভগবানের আসন পাতিয়া বসিয়াছেন।

দীক্ষার অব্যবহিত পরই শরৎকুমার কলিকাতার ভক্তিমান বন্ধুগণের সহিত ১০৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে সত্যব্রত সমিতি নামে একটি সমিতি গঠিত করিলেন। সত্যব্রত সমিতির আদর্শ

ছিল—বিষয়েষু সত্যানন্দং দৃষ্ট্বা সুখী ভব ভবে
ততঃ কিম্

তোমারই জগতে প্রেম বিলাইব
তোমারি কার্য্য সাধিব।

জগতের ওপারে গোলোক বৃন্দাবন লাভের জন্য হুড়াহুড়ি না করিয়া এই জগতের বুকেই সকল মানুষকে ভালবাসিয়া বৈকুণ্ঠ এই মাটির বুকেই কি করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, শ্রীনিত্যগোপালের স্পর্শ পাইয়া শরৎকুমারের জীবনে এই পাগলামী আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রত্যেক ব্যক্তি সত্তার অন্তরেই যে একটি সমষ্টি সত্তা রহিয়াছে, তাহা বুঝিয়া ব্যষ্টি-সত্তা ও সমষ্টি সত্তা উভয়কে তাহাদের নিজস্ব মূল্য দিয়া মানুষ যদি চলিতে পারে তাহা হইলে এই জগৎই বৃন্দাবনে পরিণত হয়। তিনি বলিতেন বিশ্বে আমরা সবাই এক ; একত্বের দৃষ্টি লইয়া যদি আমরা বহুর ক্ষেত্রে বহুত্বকে স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী মর্য্যাদা দান করিয়া চলিতে পারি, জীবন আমাদের মধুময় হইবে, এই চিন্তাধারা মানুষের ভিতর প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে শ্রীনিত্যগোপালের জড়াজড় সমন্বয়ও বাস্তব রূপ ধারণ করিবে। গুরুভ্রাতাগণের সহিত সত্যব্রত সমিতিতে এই আলোচনা চলিতে লাগিল। সেই সময় হইতেই শ্রীনিত্য-গোপালের জড়াজড় সমন্বয় প্রকাশের পথে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। বিষয়ের ভিতর সত্যানন্দের আস্বাদন করিবার আদর্শই তিনি জীবন দিয়া আচরণ এবং সমস্ত জীবন দিয়া

প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নিত্যভক্ত সংগে পরম আনন্দে সত্যব্রত সমিতির আলোচনা চলিতে লাগিল। একদিন কয়েকজন গুরু ভ্রাতার সহিত হুগলী মঠে নিত্যগোপালকে দেখিতে গেলেন, যাইয়া ঠাকুরকে সত্যব্রত সমিতির কথা বলিলেন। ঠাকুর খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া সত্যব্রত সমিতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পরীক্ষার পড়ায় মনোযোগ দিতে পারিতেছিলেন না। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "পরীক্ষা দিয়া একবার আসিও"। পরীক্ষা দিয়া শরৎকুমার হুগলী মঠে ঠাকুরের নিকট গেলেন, তখন তাঁহার জীবনের মাঝে এক পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে। প্রথমে দুর্গাকে ভাবিতেন, কিছুদিন পর তাহা ভাল লাগে না, দুর্গার কোলে নিত্যগোপালকে ভাবিতেন এবং তাহাই ভাল লাগিত, আবার কিছুদিন পর তাহাও ভাল লাগিল না ; দুর্গাই নিত্যগোপাল ইহা ভাবিয়াই আনন্দ পাইতেন। হুগলীতে যাইয়া একদিন ঠাকুরকে সকল কথা বলিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—"যাহা ভাবিতে ইচ্ছা করে তাহাই করিও। আমি তো তোমাকে দুর্গা ভাবিতে বলি নাই। তুমি নিজেই চাহিয়াছিলে, যাহা ভাল লাগে তাহাই করিও"। মন্ত্র দিবার সময় ঠাকুর বলিয়াছিলেন এক বৎসর পর মন্ত্র বদলাইয়া দিব। এই ভাবে জীবনের মাঝে অনুভূতির মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। হুগলী মঠে কয়েকদিন থাকিবার পর যে দিন বরিশাল যাইবেন, সে দিন কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিলেন "শরৎ যেন মেয়ে বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী

যাওয়ার সময় যেমন কাঁদে সেইরূপ কাঁদিতে আরম্ভ করিল। শরৎ. তুমি কি জান না, আমি তোমার সংগে সংগে আছি ?"

শবৎকুমার জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, গুরু-বাক্যে তাহার কি অটল বিশ্বাস ছিল। ঠাকুরের সেই বাণী তিনি জীবন দিয়া প্রতি পদে বিশ্বাসের সহিত অনুভব করিয়া গিয়াছেন। সাবাজীবন তিনি যে দুর্যোগের পথযাত্রী ছিলেন, নিত্যগোপাল সংগে সংগে আছেন, মনে সেই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি সকল দুর্যোগের ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার জীবনেব সকল পথ চলাই তাঁহাকে গৌববান্বিত করিয়াই তুলিয়াছিল। ঠাকুরের স্নেহ কোমল অভয়বাণী শুনিয়া চোখের জল মুছিয়া শরৎকুমার বাড়ী রওনা হইয়া গেলেন।

কিছুদিন বাড়ী থাকিয়া আবার কলিকাতা আসিয়া ভক্তগণ সংগে যোগদান করিলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইল, পাশ করিতে পারেন নাই। সেই সময় হুগলীতে কিছুদিন ছিলেন। ঠাকুর শ্রীনিত্যগোপাল খুব রসিক লোক ছিলেন। একদিন অনেক ভক্ত হুগলী মঠে উপস্থিত হইয়াছেন, সবাই ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছেন, শরৎকুমার অন্যদিকে বসিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতেছেন। ঠাকুর মধুর হাসিয়া কবিতা করিয়া বলিলেন, "শরৎ কাঁদিছে অঝোর নয়নে, কি জানি কি ভাবিয়া মনে"। শরৎকুমার লজ্জায় চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন।

তিনি হুগলী থাকাকালীনই তাঁহার দাদা প্রসন্নকুমার ঘোষের একটি পত্র আসিল, শরতের একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। ঠাকুর

পত্র পড়িয়া ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন শরৎবাবুর একটি সুপুত্র হইয়াছে। আমরা নিশ্চয়ই এজন্য মিষ্টি খাইতে পাইব। শরৎকুমার কলিকাতা হইতে ভাল দই, সন্দেশ কিনিয়া ঠাকুরকে দিলেন, তিনি ভক্তগণ সংগে আনন্দের সহিত সেই মিষ্টি আহার করিলেন। শরৎকুমার আর বাড়ী যাইবার কথা বলেন না, বাড়ী হইতে যাইবার জন্য পত্র আসে। ঠাকুর বলিলেন, "শরৎ, তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও, বৌমার মনের আশা আকাঙ্ক্ষাও আছে, সে কষ্ট পাইলে অপরাধ হইবে। না হয় বৌমার ও তোমার মাঝে একটা কোল বালিশ দিয়া শুইও"। শরৎকুমার বলিলেন, "কোল বালিশ দিলেই বুঝি হয়? আমি যদি ডুবিয়া যাই"? ঠাকুর বলিলেন, 'ভয় কী শরৎ? টেনে তুলব'। এই বলিয়া সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। এমনি করিয়াই শ্রীনিত্যগোপাল শরৎকুমারকে বার বার অভয়বাণী দিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন। যাঁহার জীবন দিয়া সংসার সন্ন্যাস সমন্বয়, মায়া ব্রহ্মের সমন্বয় বিশ্বে প্রচারিত করিবেন, তাঁহাকে তিনি মুখে কিছু বলেন নাই, তাহার জীবনের ভিতর দিয়া সংসার সন্ন্যাসের, মায়া ব্রহ্মের সমন্বয় বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন। শরৎকুমারের সম্বন্ধে কোনই বাধা নিষেধের বন্ধন তিনি রাখেন নাই। শ্রীকৃষ্ণভাবামৃত গ্রন্থ এবং রাসপঞ্চাধ্যায় পড়িতে ঠাকুর অনেক ভক্তকেই মানা করিয়াছিলেন কিন্তু শরৎকুমার সেই গ্রন্থ পড়িতেন জানিয়াও কোন দিন নিষেধ করেন নাই। ঠাকুরের এক শিষ্য দানীবাবু— তাহার বাড়ীতে অনেকের যাওয়াই নিষেধ ছিল কিন্তু কোন

কাজের প্রযোজন হইলে ঠাকুর শরৎকুমারকেই সেখানে পাঠাইতেন, একাধিকবার তিনি সেখানে গিয়াছেন এবং অমৃতনাম্নী তাঁহার রক্ষিতা একটি স্ত্রীলোক ছিলেন তাঁহার হাতে খাইয়াছেন।

নির্ভীক শরৎকুমার মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া আবার সংসারে ফিরিয়া গেলেন। সত্যই তিনি টানিয়া তুলিয়াছেন, তাহা না হইলে বহুবিচিত্রপূর্ণ ঘটনার সমাবেশে শরৎকুমারের জীবন, প্রকৃতির কত ঘটনার ভিতরই তো তিনি ডুবিয়া যাইতে পারিতেন। শ্রীনিত্যগোপালের সেই অভয়মন্ত্র "ভয় কি টেনে তুলব" বাণী তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। যাইবার সময়ে ঠাকুরের মুখের অন্ন শুকাইয়া লইয়া গেলেন, তাহাই পুত্রের মুখে দিয়া অন্নপ্রাশন দিলেন এবং নাম রাখিলেন সত্যব্রত। শরৎকুমারের পিতা বিষয়ী লোক ছিলেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকেই অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন না, তিনি শ্রীনিত্যগোপালকে কিভাবে লইবেন ভাবিয়া শরৎকুমার যে কুলগুরু ছাড়িয়া সন্ন্যাসী গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়াছেন তাহা পিতাকে তখন জানান নাই। কিন্তু মা তাহা জানিতেন। কিছুদিন কাঁকরধা থাকার পর অর্থ উপার্জ্জনের জন্য পুনরায় কলিকাতা আসিলেন। ছাত্র-জীবন শেষ হইল, কিছু তো করিতেই হইবে। নিজের এবং বন্ধুগণের ইচ্ছা একটা কাটা কাপড়ের দোকান দেওয়া। সেই ইচ্ছা বাড়ীতে জানাইলেন, বাড়ী হইতে কিছু টাকা আসিল। দোকান দিতে হইলে একটি ঘর চাই, গুরুভাই নিতাইবাবু এক ভদ্রলোকের ঘর ভাড়া দিবার

কথা শুনিয়া শরৎকুমারকে সেখানে পাঠাইলেন। তিনি যাইয়া সেখানে অনেকগুলি লোক লইয়া সেই ভদ্রলোকটি কথা বলিতেছেন দেখিয়া কিছু না বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন। নিতাইবাবু রাগ করিয়া বলিলেন, লোক আছে তাতে তোমার কি, তুমি তোমার কথা বলিয়া আসিতে। এমনি লাজুক কুনো ছিলেন শরৎকুমার। বন্ধুগণের চেষ্টায় ৫৬নং হ্যারিসন রোডে একটি ঘর ভাড়া করিলেন, নাম দিলেন 'বন্দেমাতরম্ ষ্টোর'। কাটা কাপড়ের দোকান দিয়া একটি লোক রাখিলেন। এইভাবে পাঁচছয় মাস দোকান চলিল। শরৎকুমারের জীবনের মাঝে আবার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। মাতৃসাধক শরৎকুমারের জীবনের মাঝে রাধাকৃষ্ণ ঢুকিবার জন্য উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিলেন। 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করিয়া প্রাণ পাগল হইয়া উঠিল। প্রাণে তীব্র জ্বালা, কিছুই ভাল লাগে না। সমস্ত জীবকে রাধাপ্রকৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র বিশ্বপতি এইভাবে ভাবিতে লাগিলেন। একদিন একখানা ছবিতে রাধারাণী বসিয়া আছেন, শ্রীকৃষ্ণ গাছের আড়াল হইতে সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহাকে দেখিতেছেন, সেই ছবিখানি দেখিয়া খুব ভাল লাগিল, তখন হইতে রাধা রাধা জপ চলিতে লাগিল। কখন রাধা আসেন ও কৃষ্ণ পালান, আবার কৃষ্ণ আসেন ও রাধা পালান এইরূপে শরৎকুমারের জীবনের মাঝে তুমুল মন্থন চলিতে লাগিল। তিনি বহুবার তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন, নিত্যগোপাল আমার হৃদয়মন্থন ধন, নিত্যগোপালই আমার জীবনে মথিত হইয়া

রাধাকৃষ্ণ ও গৌর হইয়াছেন, আমার রক্তের ভিতর দিয়া আমি তাঁহাদিগকে পাইয়াছি।

সেই অবস্থা ঠাকুরকে বলায় তিনি বলিয়াছিলেন---"কৃষ্ণকে পাইয়া যেন মাকে কোনও অবহেলা করিও না। কন্যা বয়স্থা হইলে মা-ই স্বামীর হাতে সমর্পণ করিয়া দেন"। কৃষ্ণ পতি, দুর্গা মা এইভাবেই নিত্যগোপাল তাঁহার জীবনে সমন্বয় সাধনার ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

সেই সময় একদিন গুরুভাই নিতাইবাবুদের ইচ্ছায় তাঁহাদের সহিত ষ্টারে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রথমেই ষ্টেজে কতকগুলি মেয়ে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। ভাবুক মন শরৎকুমারের ভিতরে তখনি বৃন্দাবনলীলা স্ফুরিত হইল! তিনি দেখিলেন উহা যেন বৃন্দাবনে গোপীগণ নৃত্য করিতেছেন ইহা স্মরণ হওয়ার সংগে সংগেই কি কান্না! সমস্ত দর্শকদের অসুবিধা হইতে লাগিল। নিতাইবাবুরা চঞ্চল হইয়া পড়িলেন, কিছুতেই যখন শরৎকুমারকে থামাইতে পারিলেন না তখন তাঁহাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়া বাসায় ফিরিলেন এবং বলিলেন আর কোনও দিন তোমাকে লইয়া কোথাও যাইব না। তখন তাঁহার প্রাণের অবস্থা এইরূপ। এই সময়ের ঊষাঙ্গিণী দেবীর নিকট লিখিত পত্রের কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম।

"আজকাল শারীরিক ও মানসিক কেমন আছ জানাইবা, খোকা কেমন করে লিখিও। সংসারে প্রলোভনের ভিতর থাকিয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণতে চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলে তো মানুষ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছে "কৃষ্ণ দরশন বিনা নেত্রের ফল নাহি পান, যেইজন কৃষ্ণে হেরে সেই ভাগ্যবান"। বাস্তবিক যখন কৃষ্ণ দরশন হইবে তখন চোখের সার্থকতা, যখন শ্রীকৃষ্ণের অংগ স্পর্শ হইবে তখন ত্বকের সফলতা হইবে। যখন আমাদেব সমস্ত শ্রীকৃষ্ণকে উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইবে তখনই আমাদের জীবন সার্থক। তবে শ্রীমতী রাধারাণীর দয়া না হইলে শ্রীকৃষ্ণ লাভ হইবে না। শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র পতি, আমরা সকলেই রাধারাণীর অংশ; আমাদের স্বামীও শ্রীকৃষ্ণ, তোমারও প্রকৃত স্বামী শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহাতে চিত্ত রাখ, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে। যদি শ্রীকৃষ্ণই লাভ করিতে না পারিলে তবে আর সুখ কোথায়? সংসারে একমাত্র সুখের জিনিষ তিনি, তাহাকে ভাল বাসিতে পারিলেই ভালবাসা সার্থক। সাধারণ মানবকে ভালবাসিয়া কি ফল? যদি ভালবাসিতে হয় তবে ভগবানকে ভালবাস, তবে সাধারণ জীবও তাঁহার এই মনে করিয়া ভালবাসিও, কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ কখনও তুষ্ট হইবেন না। স্ত্রীলোক যেমন পরিবারস্থ সকলকেই ভালবাসে কিন্তু মন সর্বদা স্বামীর উপর থাকে, তেমনি জগতের সকলকে ভালবাস আপত্তি নাই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যেন স্বামী বলিয়া ভক্তি থাকে। যদি তাহাকে ছাড়িয়া অন্য জীবে স্বামীজ্ঞান কর তবে প্রকৃত পক্ষে তাহা পাপ। শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বামী না হন তবে জীবের অস্তিত্ব কোথায়? তোমার স্বামী শ্রীকৃষ্ণ, আমার স্বামীও তিনি।

আশীর্ব্বাদ করি তোমার স্বামীতে তোমার অচলা ভক্তি থাকুক। তুমি তাঁহাকে আপনার বলিয়া মনে করিতে পার ইহা আমার একান্ত প্রার্থনা। তুমি আমার কাছে চিঠি লিখ না লিখ আমি ভগবানের কাছে তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি। রাধাকৃষ্ণ যুগল নাম জপ কর। রাধারাণী প্রেমময়ী, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কত আপনার মনে করিতেন জান কি? যেখানে রাধা, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ। তাই রাধাকৃষ্ণ নাম সর্ব্বদা জপ করিও। জানি তুমি একদিন শ্রীকৃষ্ণকে মালা দিয়াছিলে তবে তাঁহাকে তখন পাথর বলিয়াই মনে হইয়াছিল, তাঁহার নিকট প্রার্থনা তিনি প্রত্যক্ষভাবে আসিয়া তোমার মালা গ্রহণ করুন। আমি দানহীন, তোমাকে কি দিব? আমার দেওয়ার কিছু নাই তবে আমি যাহা সত্য বুঝিয়াছি তাহাই দিব, যদি তুমি খুসী হইয়া গ্রহণ কর তবে আমার দেওয়া সার্থক, তোমার জীবনও সার্থক হইবে। জানিও তাঁহার কৃপা ব্যতীত কিছুই হইবে না, সর্ব্বদা তাঁহার কৃপার জন্য ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করিও। কোথা কৃষ্ণ, কোথা প্রেমময়ী রাধা বলিয়া সর্ব্বদা কাঁদ; রাধারাণী প্রেমের আধার, অবশ্যই তাঁহার দয়া হইবে। রাধারাণীর দয়া হইলে শ্রীকৃষ্ণের দয়া পাইবে, সর্ব্বদা তাঁহার নাম জপ কর ও ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা কর, অবশ্য তিনি কৃপা করিবেন। অদ্য এই পর্য্যন্ত। জামার দোকান খুলিয়াছি বোধ হয় শুনিয়াছ, ফলাফল ভগবানের হাতে"। এই অবস্থার ভিতর দোকান চলিল কিন্তু যিনি নূতন যুগের নূতন দর্শন বিশ্বে

প্রচারিত করিবার জন্য যুগাবতার শ্রীনিত্যগোপালের লীলা সহচররূপে ধরায় অবতরণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এই ব্যবসা করা সম্ভব হইল না। শরৎকুমারের পাগলপ্রাণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একদিন বাড়ীতে দাদার নিকট পত্র দিলেন, দোকান রহিল, আমি শ্রীধামবৃন্দাবন চলিলাম। দোকান বন্ধ করিয়া হুগলী মঠে যাইয়া ঠাকুরকে বলিলেন, আমি বৃন্দাবন যাইতে চাই।

ঠাকুর বলিলেন, বৃন্দাবন যাওয়ার ইচ্ছা হইয়াছে, তা যাওয়া ভাল। নগেন্দ্রনারায়ণ রায় তোমার গুরুভাই বৃন্দাবনে সেবা-কুঞ্জের নিকট থাকেন তাঁহার ঠিকানা লইয়া যাও, সেখানে যাইয়া উঠিও. তিনি তোমার সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ঠাকুর একখানা পত্রও তাঁহার নামে দিয়া দিলেন। সেই দিনই মঠ হইতে একখানা কম্বল ও একটি ঘটি এবং একখানি কাপড় দিয়া একটি পোঁটলা বাঁধিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ব্যাণ্ডেল স্টেশনে রওনা হইলেন। ঠাকুর সংগে একজন ভক্তকে দিলেন ব্যাণ্ডেলে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য। স্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলেন বৃন্দাবনের গাড়ী ছাড়িবার সময় প্রায় হইয়া গিয়াছে, ভক্তটি তাড়াতাড়ি টিকিট কাটিয়া আসিলেন, গাড়ীর কামরা সমস্ত ভর্ত্তি, কোথায়ও উঠিতে পারিতেছেন না। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে তখন একটি কামরায় উঠিবার জন্য জোরে ধাক্কা দিলেন, ভিতর হইতে জোরে চাপিয়া রহিয়াছে। তখন নিরুপায় হইয়া জানালা দিয়া পোঁটলাটি ফেলিয়া পাদানিতে উঠিয়া

দাঁড়াইলেন, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ভিতরে প্রবেশ না করিতে ভিতর হইতে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা চলিতে লাগিল। শরৎকুমার জয় রাধারাণী জপ করিতে করিতে হঠাৎ কেমন করিয়া দরজা খানিকটা খুলিয়া গেল, ভিতরে প্রবেশ করিতেই কপাটে চাপা লাগিয়া কপাল কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সারা রাত্রি মাথা ধরিয়া সেই দরজার নিকট বসিয়া রহিলেন। সেই সময় মনে মনে বলিয়াছিলেন বৃন্দাবনে প্রবেশের পথে, মা কাত্যায়নী, তোমাকে রক্ত দিয়া পূজা করিয়া চলিলাম। মা, আমার বৃন্দাবন যাওয়া যেন সার্থক হয়। এই ভাবে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গুরুভাই নগেনবাবুর বাসায় যাইয়া উঠিলেন। সন্ধ্যাবেলা সেবাকুঞ্জে রাধারাণীর আরতি দেখিতে গেলেন। সামনে ব্রজমাইরা বসিয়া আছেন, তিনি তাঁহাদের পিছনে যাইয়া বসিলেন। সেখানের চিত্রপট রাসশ্রমে পরিশ্রান্তা রাধারাণীর পদসেবা করিতেছেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। আরতি আরম্ভ হইলে কতকগুলি লোক পিছন হইতে ঠেলিতে লাগিল, কিছুক্ষণ সরিতে সরিতে যখন আর কিছুতেই বসিতে পারিলেন না তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর কেহ কিছু বলিল না। আরতি হইয়া গেল। পূজারী ঠাকুর লোক ঠেলিয়া আসিয়া শরৎকুমারের হাতে রাধারাণীর একটি প্রসাদী তাম্বুল দিয়া গেলেন। রাধারাণীর প্রসাদী তাম্বুল পাইয়া আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে যাইয়া নগেনবাবুকে সেই ঘটনা বলিলেন। তিনি বলিলেন ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল তুমি যে বৃন্দাবনে আসিয়াছ

এই সংবাদ রাধারাণীর দরবারে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে, ইহা বলিয়া দুইজনে সেই তাম্বুল প্রসাদ আস্বাদন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। লোকে যে তাঁহাকে পিছন হইতে ঠেলিতেছিল সেই কথা বলায়, নগেনবাবু বলিলেন, বৃন্দাবনে সেবাকুঞ্জের নিযম সেখানে পুরুষেরা দাঁড়াইয়া, মেয়েরা বসিয়া আরতি দেখিবে। সেই জন্য ঐরূপ করিয়াছে। নগেনবাবুর নিকটই কিছুদিন ছিলেন। রোজ ভোরে যমুনায় স্নান করিতে যাইতেন এবং একটি মাটির ঘড়া লইয়া যাইতেন, স্নান করিয়া এক ঘড়া জল লইয়া আসিতেন। রোজই স্নান করিবার সময় মনে মনে ভাবিতেন রাত্রে রাধাকৃষ্ণ এই জলে কেলী করিয়াছেন, তাঁহাদের অঙ্গগন্ধ পাই কিনা মনে করিয়া কত লুটোপুটি খাইযাছেন, অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্নান করিয়াছেন। একদিন সত্য সত্যই জলে কি এক অপূর্ব্ব গন্ধ পাইলেন, রাধাকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ ভাবিয়া কতক্ষণ জলের ভিতর লুটোপুটি খাইয়া এক ঘড়া জল লইয়া নগেনবাবুর নিকট আসিয়া সেই জল দিয়া গন্ধের কথা বলিলেন। নগেনবাবু এবং অন্যান্য ভক্তগণ সকলেই সেই জলের ভিতর অপূর্ব্ব এক গন্ধ পাইয়া অঞ্জলি ভরিয়া খাইয়া সকলে মিলিয়া আনন্দে কাঁদিতে লাগিলেন। এই ভাবে বৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবভক্ত হরিদাস বাবাজীর পরম স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত কাঠের মালা গলায় ও চৈতন্য টিকি রাখিয়াছিলেন। কিছুদিন বৃন্দাবন থাকিবার পর রাধাকুণ্ডে কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা হওয়ায়

রাধাকুণ্ডে যান, সেখানে যাইয়া বেলা দুই প্রহরের সময় রাধাকুণ্ডের তীরে বসিয়া ভাবিতেন, এই সময় যদি কৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য আসেন! রাধাকুণ্ডের তীরে পাথরের দুই জোড়া চরণ ছিল। তাহাতে রাধাকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন খোদাই করা ছিল। পাগল শরৎকুমার, কেহ না দেখে, চুপি চুপি সেই চরণ দুখানিতে যাইয়া চুমো খাইতেন। বৃন্দাবনে কুসুম সরোবরের তীরে বেলা দুই প্রহরের সময়, বৈশাখের প্রচণ্ড রোদের মধ্যে বসিয়া থাকিতেন। ভাবিতেন যদি এই সময় রাধারাণী কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য এই নির্জ্জন স্থানে আসেন! এই অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকুল প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। রাধাকুণ্ডে থাকাকালীন পাবনা জেলার বনমালি রায়বাহাদুরের এক আত্মীয়া ছিলেন। তিনি শরৎকুমারকে খুবই যত্ন করিতেন। তিনি শরৎকুমারের অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা, বৈরাগ্য করিয়া সন্ন্যাসী হইও না, সে পথ বড় কষ্টকর। মানুষ আসে প্রথমে বৈরাগ্যের তাড়নায় এ পথে, শেষে আর পারে না, কষ্ট হয়। তুমি বৈরাগ্যবশতঃ বৃন্দাবনে আসিয়াছ ভাল, কিছুদিন থাকিয়া আবার বাড়ী যাইও। আবার যখন ইচ্ছা হইবে আসিও, ভেক্ লইও না"। রাধাকুণ্ডে থাকাকালীন একদিন রাধারাণীর জন্মস্থান বরষাণ দেখিবার ইচ্ছা করিয়া বৈকালের দিকে বরষাণ রওনা হইলেন। ভুল পথ ধরিয়া বরষাণ আর খুঁজিয়া পান না, রাত্রি হইয়া গেল অনেক, তখন একজনকে জিজ্ঞাসা

করায়, তিনি বলিলেন, "আপনি ভুল পথে আসিয়াছেন, এখান হইতে বরষাণ প্রায় তিন মাইল দূরে, রাধাকুণ্ডও তাহাই"। তখন আর কি করেন? এক বাবাজীর কুটীরে যাইয়া উঠিলেন। বাবাজী খুব আদর যত্ন করিলেন, তিনি বলিলেন আজ মনে হইতেছিল কে একজন এখানে আসিবেন। তাঁহার ঘরে কয়খানা শুক্‌না রুটি ছিল তাহাই জল দিয়া ভিজাইয়া খাইয়া বাবাজীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। সেই বাবাজী রাধারাণী সম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়াছিলেন।

"বরষাণে দীর্ঘকাল এক বাবাজী বাস করিতেন। তিনি অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, মাধুকরী করিয়া রুটি আনিয়া তাহাই খাইতেন। কিন্তু তখন আর সেই রুটি খাইতে পারেন না, এত বৃদ্ধ হইয়াছেন যে মাধুকরীও করিতে পারেন না। কিন্তু রাধারাণীকে ছাড়িয়া বরষাণ হইতে কোথাও যাইতে পারেন না। এইভাবে একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, রাধারাণী তুই আমাকে রাখ্‌লি না, এতকাল তোর কাছে পড়িয়া থাকিলাম, আজ রুটি খাইতে না পারিয়া তোকে ছাড়িয়া আমাকে যাইতে হইতেছে। এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রওনা হইলেন। কিছুদূর যাইতেই একটি লাল টুকটুকে মেয়ে ডাকিয়া বলিল, বাবাজী তুমি কাঁদিতে কাঁদিতে কোথায় যাইতেছ? বাবাজী বলিলেন, লালী, দীর্ঘকাল বরষাণে ছিলাম, রাধারাণী আর আমাকে রাখিলেন না। আমি অতি বৃদ্ধ হইয়াছি, শুক্‌না রুটি আর খাইতে পারি না, তাই বৃন্দাবনের দিকে যাইতেছি

যদি অন্ন প্রসাদ পাই। তখন লালী বলিল—বাবাজী, তুমি যাইও না, ঐ যে দেখিতেছ সামনে একটা বাড়ী, ঐ বাড়ী আমার বাবার। ওখানে বাবা আমাদের রাধারাণীকে এক বাটি করিয়া পায়েস রান্না করিয়া রোজ ভোগ দেন, তুমি তাহাই খাইয়া বরষাণে থাকিও, আমি পরে বাড়ী যাইব, তুমি আমার কথা বাবাকে বলিও। বাবাজী লালীর কথায় ফিরিয়া সেই বাড়ীতে যাইয়া যখন সেই কথা বলিলেন, তখন সেই গৃহস্বামী বলিলেন, বাবাজী, আমার তো সন্তান নাই, আমি অপুত্রক, আমি বুঝিতে পারিয়াছি কে তোমাকে পাঠাইয়াছে, ইহা রাধারাণীর কাজ। এই বলিয়া আনন্দে অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, বাবাজী, তুমি যতদিন জীবিত থাক এখানে রাধারাণীর প্রসাদ খাইয়া থাকিও। বাবাজীও রাধারাণীর দয়া স্মরণ করিয়া আনন্দে কাঁদিতে লাগিলেন"।

শরৎকুমার সেই বাবাজীর কুটীরে রাত্রি যাপন করিয়া সকালে উঠিয়া রাধারাণীর পিত্রালয় বরষাণের দিকে রওনা হইলেন। সেখানে একদিন ছিলেন। রাত্রে রাধারাণীর আরতি দেখিতে গিয়া মনে মনে ভাবিতেছিলেন রাধারাণীর প্রসাদী মালা যদি একছড়া পাইতাম তবে খুব আনন্দ হইত। সত্যই দেখা গেল আরতির পর পূজারী ঠাকুর লোকের ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া রাধারাণীর প্রসাদী মালা একছড়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়া গেলেন। মালা পাইয়া কি আনন্দ। যে কয়দিন রাধাকুণ্ডে ছিলেন, সেই মালা ছড়াটি গলাতেই ছিল। বৃন্দাবনে

যতদিন ছিলেন তিনি নিজেকে নারীভাবে ভাবিয়া সাধনা করিয়াছেন। এইভাবে ছয় মাস কাটিয়া গেল। শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাড়ী হইতে পত্র আসিতে লাগিল, তোমার বাবার অসুখ বাড়ী চলিয়া আইস। তিনি ভক্ত সংগে পরমানন্দে আছেন, বাড়ী যাইবার নামও করেন না। হরিদাস বাবাজী খুবই স্নেহ করিতেন। তিনি একদিন বলিলেন, তোমাকে শীঘ্রই বাংলাদেশে ফিরিযা যাইতে হইবে। ইহার কয়েকদিন পরই স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি শুইয়া আছেন, মহাপ্রভু আসিয়া বুকে পা দিয়া বলিলেন, 'তুই বাংলায় ফিরিয়া যা, বাংলায় ফিরিয়া যা, এত বৎসর পর আবাব বাংলায় দেখা হবে'। তিনি যখন পা তুলিলেন, রাধাপদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সকালে উঠিয়া হরিদাস বাবাজীকে স্বপ্নের কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, আমি তো পূর্বেই বলিয়াছি তোমাকে শীঘ্রই বাংলায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। বৃন্দাবন হইতে হুগলী মঠে রওনা হইলেন। যাইবার সময় নগেনবাবু ঠাকুরকে একটি প্রশ্ন করিতে বলিয়া দিলেন। প্রশ্ন এই, ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিও, আমরা কাঁহার অনুগা হইয়া ভজনা করিব? তাহাব উদ্দেশ্য, বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে কোন মুঞ্জরী সখীর অনুগা হইয়া ভজনা করিতে হয়। ঠাকুর যদি বলেন রাধার অনুগা হইয়া ভজনা কর তাহা হইলে বুঝিব নিত্যগোপালই রাধা। শ্রীনিত্য-গোপালের স্বরূপ জানাই এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল।

বৃন্দাবন হইতে হুগলী মঠে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম

করিলেন। মাথায় লম্বা টিকি। রসিক ঠাকুর টিকিটা ধরিয়া বলিলেন—'বাপরে, শরৎবাবুর টিকিটা যেন কাঠবিড়ালীর ল্যাজ'। পরের দিনই টিকিটা কাটিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর আবার বলিলেন—শরৎবাবুর গলায় আবার মোটা কাঠের মালাও দেখিতেছি, বাড়ী গেলে বৌমা মালাটি কেটেই দেবে। সেই-কথা শুনিয়া মালাটিও খুলিয়া ফেলিলেন। শ্রীনিত্যগোপালের মালা তিলকের উপর কোন বিদ্বেষ ছিল না, তবে তিনি কোনও বাহিরের আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না। তিনি ছিলেন সহজ মানুষ, সহজ জীবনের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তিনি কোনও সাধনার কথাই বলিয়া যান নাই, শুধু জীবন সাধনার কথা, প্রকৃতি বদলানোর কথাই বলিয়া গিয়াছেন। শরৎকুমার জীবন দিয়া বিশ্ববাসীর নিকট সেই জীবন সাধনার ধারাই প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

কয়দিন হুগলী থাকার পর ঠাকুরকে বলিলেন, আমার একটি প্রশ্ন আছে শুনিবেন। ঠাকুর শুনিলেন না। এইভাবে দুই তিন দিন বলাতেও ঠাকুর প্রশ্ন শুনিতে চাহিলেন না। তখন 'মা ঠাকুরুণ' বলিয়া সকলে ডাকিতেন এমন একটি মহিলা মঠে থাকিয়া ঠাকুরের সেবা যত্ন করিতেন, তাঁহাকে বলিলেন—আমার একটি প্রশ্ন ছিল, ঠাকুর তাহা শুনিতেছেন না, আপনি একটু বলিবেন? তিনি বলায় ঠাকুর শরৎকুমারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শরৎকুমার আসিলে ঠাকুর বলিলেন, "শরৎ, তোমার যখন যাহা প্রয়োজন তাহা কি ভগবান অন্তর্য্যামীরূপে

তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছেন না"? প্রশ্ন আর করা হইল না। সত্যই তিনি তাঁহার জড়াজড় সমন্বয়তত্ত্ব শরৎকুমারের জীবনের ভিতর দিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন, মুখে কিছুই বলিয়া যান নাই।

ঠাকুর যে ঘরে শুইতেন তাহার পাশের ঘরে গুরুভাই রামদার কাছে শরৎকুমার শুইয়া আছেন, রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়াছে এমন সময় স্বপ্ন দেখিলেন, সমস্ত দেশময় একটা প্লাবন তাহার ভিতর দাঁড়াইয়া ঠাকুর; তাঁহার দক্ষিণ বগলের নীচে গদাধররূপী শরৎকুমার এবং বাঁ বগলের নীচে অদ্বৈতরূপী ঠাকুরের এক শিষ্য, ঠাকুর নাচিতেছেন। পরক্ষণেই আবার দেখিলেন একজন মশারীর ভিতর শুইয়া আছেন, নিকটে যাইয়া দেখেন ঠাকুর মশারীর ভিতর শুইয়া আছেন; ঠাকুর মশারী তুলিয়া বলিলেন, দেখ আমি কে? এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণ হইয়া দাঁড়াইলেন, শরৎকুমারকে রাধারূপে তাঁহার বাঁ দিকে দাঁড় করাইলেন। দেখিলেন ঠাকুর ষড়ভুজমূর্ত্তিতে শরৎকুমারের হাত ধরিয়া একটান দিলেন, শরৎকুমারের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্নের কথা গুরুভাই রামদাকে বলিলেন এবং ঠাকুরকেও বলিলেন। ঠাকুর কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিলেন। ঠাকুর তো স্বপ্ন বলিয়া ঐ ঘটনাকে উড়াইয়া দিলেন না বরং স্বীকার করিয়া লইলেন।

হুগলী থাকাকালীন একদিন শ্রীনিত্যগোপালের সহিত তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রসঙ্গ তুলিলেন। অনেক আলোচনার পর নিত্যগোপাল বলিলেন—'শরৎ, ইহার পরে যাহা তাহা অনুভূতির

বিষয়'। তখন শরৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠাকুর, আমার সে অনুভূতি হইবে তো? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ হইবে।

শরৎকুমার আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে আপনি ভগবান? তিনি বলিলেন—হ্যাঁ, আমার ভিতর যিনি আছেন তিনি ভগবান—যেমন ছেঁড়া ন্যাকড়ায় সেণ্ট মাখাইলে তাহা হইতে গন্ধ বাহির হইতে থাকে কিন্তু সেন্ট চলিয়া গেলে যে ন্যাকড়া সেই ন্যাকড়াই পড়িয়া থাকে।

শরৎকুমার হুগলীতেই আছেন। মঠে একদিন ছানার পোলাও হইবার আয়োজন হইল। শরৎকুমার বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছেন, তিনি ছানার কোন জিনিষই খান না। ঠাকুর মা ঠাকুরুণকে (ভুলি) ডাকিয়া বলিলেন, "ভুলি, ছানার পোলাও যে হবে, শরৎ যে ছানা খায় না, কি হবে"? মা ঠাকরুণ বলিলেন, আমি শরৎকে বলিব, সে না খাইলে আপনি দুঃখ পাইবেন জানিলে সে নিশ্চয়ই খাইবে। তিনি যাইয়া শরৎ-কুমারকে বলিলেন আজ ছানার পোলাও হইবে, তুমি ছানা খাওনা ঠাকুর দুঃখ করিতেছেন। শরৎকুমার বলিলেন ঠাকুরকে বলুন আমি ছানার পোলাও খাইব। ঠাকুর যেন দুঃখ না পান। এই যে ঠাকুরের স্নেহ, ইহাই তো শরৎ-কুমারের জীবনে অবিচ্ছিন্ন রসধারা বর্ষণ করিয়াছে। এই স্নেহ-সিক্ত জীবন লইয়াই তিনি আমাদের জীবনকে জুড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। শরৎকুমার বাড়ী যাইবার নামটিও আর করেন না। ঠাকুর একদিন বলিলেন—শরৎ-এর বাবার অসুখ, সে

এখানে বসিয়া কি করে, বাড়ী যায় না কেন ? আজ যদি সে না যায় মঠ হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হয় যেন। এমনি করিয়াই নিত্যগোপাল সকলের সব দাবী পূরণ করিতে শিখাইতেন। যে শরৎকুমারকে সত্য রক্ষার জন্য পিতা একদিন তাড়না করিয়া ঘরছাড়া করিয়াছিলেন, সেই শরৎকুমারই আজ গুরুর আদেশে সংসারের কর্ত্তব্য রক্ষার জন্য মঠ হইতে বিদায় হইলেন। তাই তিনি বলিতেন, সংসারী পিতার নিকট হইতে পাইয়াছি সন্ন্যাসের দীক্ষা, আর সন্ন্যাসী গুরুর নিকট হইতে পাইয়াছি সংসারের দীক্ষা। এমনি করিয়াই শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার জীবনে সংসার ও সন্ন্যাসের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

শরৎকুমার পাগল প্রাণ লইয়া বার বার ঠাকুরের নিকট গিয়াছেন। ঠাকুর বার বার বলিয়াছেন, "শরৎ, ধৈর্য্য ধর"। শরৎকুমারকে যে সংসারের সন্ন্যাসের অনেক আঘাত, অনেক বেদনা হজম করিতে হইবে। সেই জন্যই সহনশীলতা শিখাইয়াছিলেন, কুর্ম্মপৃষ্ঠ করিয়াছিলেন পৃথিবীর ঘর্ষণে যাহাতে তাহা উঁহু না করে; নিত্যগোপালের দেওয়া নূতন পথে চলিতে যাইয়া কি বেদনা, কি লাঞ্ছনাই না পাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন একূলে ওকূলে, সংসারের কূলে, সন্ন্যাসের কূলে কোন কূলেই আমার কেহ নাই। আমি একা, আমার একমাত্র সংগী শ্রীনিত্যগোপাল। সন্ন্যাসীরা তাঁহাদের দলে লইতে পারেন নাই, তিনি স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া থাকিয়াছেন ; সংসারীরা লইতে পারেন নাই, তিনি ভীষণ বিপ্লবী, সংসারের সকল সংস্কারমুক্ত

পুরুষ ছিলেন বলিয়া। তাই তিনি রাধারাণীর ভাষায় বলিয়াছেন, "একূলে ওকূলে দুকূলে গোকুলে আপনা বলিব কায়। শীতল বলিয়া স্মরণ লইনু ও দুটি কোমল পায়"। পুরুষোত্তমানন্দের জীবন এই বেদনায় ভরপুর ছিল। যে প্রাণ লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন সে প্রাণ বুঝিবার মত মানুষ সংসারে বিরল, সারা জীবন যিনি মানুষের জন্য কাঁদিয়া গেলেন, তিনিই মানুষকে পাইলেন না। সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদের ভাগ্যেই এই রূপ ঘটিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া তিনি আসিয়াছিলে স্থিতি-ধর্ম্মী সামাজিক কাঠামোকে ভাঙ্গিয়া, নূতন করিয়া স্থিতি-গতি সমন্বিত দার্শনিক ভিত্তির উপর সামাজিক কাঠামোকে গড়িয়া তুলিতে। তাই তো তাহাকে সারাজীবণ ঝড় ঠেলিয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

শরৎকুমারের প্রাণ না চাহিলেও ঠাকুরের আদেশে, ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া হুগলী হইতে রওনা হইয়া নিজ বাড়ী কাঁকরধায় আসিলেন এবং কয়েকমাস সেখানেই অবস্থান করিলেন। সেই সময় ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষকতার কাজে ডাক আসিল। শরৎকুমার বরিশাল যাইয়া স্কুলের কাজে নিযুক্ত হইলেন। জগদীশবাবুর বাসায় থাকিয়া স্কুলে কাজ করিতে লাগিলেন। সেই সময় 'বিশ্বকল্যাণ' সমিতি নামে এক সমিতি গড়িয়া উঠিল। শরৎকুমার ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু মিলিয়া সেই কাজে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। জগদীশবাবু জোর করিয়াই শরৎকুমারকে দিয়া পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা দেওয়াইতে লাগিলেন। সভার অধিবেশন পাড়ায় পাড়ায় হইতে লাগিল, ভক্ত এবং দেশ সেবকগণ মিলিয়া পর্য্যায়ক্রমে পাঠ আলোচনা বক্তৃতা চালাইতে লাগিলেন। সভার বিষয়বস্তু ছিল ঃ যে বিষয় বিষস্বরূপ, নোংরা—তাহাকে সত্যানন্দের স্তরে উন্নীত করিয়া এবং সত্যানন্দকে বিষয়ের স্তরে অবতরণ করাইয়া নোংরা বিষয়কে নির্ম্মল এবং ব্যাপক অর্থাৎ সার্ব্বজনীন করিয়া তাহার সার্থক আস্বাদন করা। প্রতি সপ্তাহে প্রভাত ফেরী বাহির করিতেন, তাহার গান ছিল 'তোমারি নামে নয়ন মেলিনু' ইত্যাদি। একখানি

কাগজে প্রভাত সংগীত পরিচালনার পথ-ক্রম লেখা ছিল—তাহা তুলিয়া দিলাম—

"বোর্ডিং হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দবাবুর বাসা, তথা হইতে বরাবর অশ্বিনীবাবুর বাসা, বিশ্বেশ্বরবাবুর বাসা, গুণদা-বাবুর বাসা, সতীশ সরকারের বাসা, রামপ্রসাদবাবুর বাসা, দ্বারিক রায়ের বাড়ীর নিকট দিয়া বরাবর কাষ্ঠপট্টি দিয়া চক দিয়া লাইন রোড দিয়া ধর্মরক্ষিণী সভার নিকট দিয়া জগদীশবাবুর বাসা। সেই প্রভাত ফেরীর দলে শরৎকুমার ঘোষ, রমেন্দ্র ঘোষ, জিতেন্দ্র কুশারী, ললিতমোহন ঘোষ, সুরেশ গুপ্ত প্রভৃতি প্রায় ২০।১২ জন থাকিতেন"।

শ্রীনিত্যগোপালের চরণ স্পর্শে জড় এবং অজড়ের সমন্বয় বীজ শরৎকুমারের হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল। তাহাই ক্রমশঃ শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হইতে লাগিল। দিন নাই রাত্রি নাই এই মতবাদকে মানুষের ভিতর প্রস্থাপিত করিবার জন্য কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন হইতে বক্তা শরৎকুমার গড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। সেই সময় একদিন জগদীশবাবুর বাসায় স্নানের সময় তেল ছিল না, ভাবিলেন এ হাঙ্গামা না রাখাই ভাল। সেই যে গায়ে মাথায় তেল দেওয়া ছাড়িলেন, আর চল্লিশ বৎসর বিনা তেলেই কাটাইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে কিছুই বুঝিবার উপায় ছিল না, পুরুষোত্তম নিত্য-গোপালের স্নেহসিক্ত দেহ সর্ব্বদাই এক অপূর্ব্ব ভাবে উদ্ভাসিত থাকিত।

বিশ্বকল্যাণ সমিতির কাজে বহু লোকের সহিত মিলিত হইয়া সকলের সুখ দুঃখের সহিত জড়িত হইয়া পড়িলেন। সমিতির কাজ, স্কুলের কাজ ইত্যাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, বাড়ীতে বিশেষ যাইতে না পারিলেও তাহার আবেষ্টনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। ঊষাঙ্গিণী দেবীকে তাঁহার সত্যকার জীবন সংগিনীরূপে পাইবার জন্য প্রচেষ্টার বিরাম ছিল না। শরৎকুমার বাড়ীতে না যাওয়ায় ঊষাঙ্গিণী দেবী দুঃখ করিয়া পত্র দেওয়ায় তাহার উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এখানে তুলিয়া দিলাম—

"আমরা তো একটা কামের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হই নাই। শ্রীনিত্যগোপালকে পাইতেই তুমি আমার সহায় এবং আমি তোমার সহায়।......স্থির জানিও যেদিন আমি সকলের বন্ধু হইব, সেইদিনই আমি প্রকৃতপক্ষে তোমার হইলাম। এই দেখ না আমি যত বেশী লোকের আদর পাইতেছি, তুমি আমার নিকট তত বেশী আদর পাইতেছ, সত্য নয় কি? আমি যতখানি জগতের, তুমি ততখানিই বাস্তবিক আমার। জগৎকে যে না ভালবাসে সে কি কখনও নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে? একজন স্ত্রীর প্রতি যে ভালবাসা উহার নাম মোহ। প্রকৃত ভালবাসা একজনের প্রতি হয় না। প্রেমাস্পদ শ্রীভগবান। তাই শ্রীভগবান সর্ব্বভূতে আছেন বলিয়া সকলে ভালবাসা পায়। আমি যদি প্রেম দিয়া শ্রীভগবানকেই চাই তবে কাহাকে চাই বল দেখি?

শ্রীভগবান কি শুধু তোমাতে না সকল জগতে? নিশ্চয়ই সকলের মাঝে আছেন। তাই বলিতেছিলাম শুধু তোমাকে ভালবাসা মোহ, জগৎকে ভালবাসিতে ভালবাসিতে তোমাকে ভালবাসার নাম প্রেম। যতখানি জগতকে ভাল চক্ষে দেখিয়াছি, তোমাকে ততখানি প্রকৃত সুন্দর দেখিয়াছি, যতখানি জগতকে আদর করিয়াছি ততটুকুই প্রকৃতভাবে তোমাকে আদর করিতে পারিয়াছি, যতটুকু জগতের সংগে প্রাণ খুলিয়া প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া ভালবাসিতে পারিয়াছি, তোমার সংগেও ততটুকু পারিয়াছি, ইহার অতিরিক্ত যাহা তাহার নাম মোহ। শ্রীনিত্যগোপালকে ভাল না বাসিলে জগতকে কিংবা তোমাকে ভালবাসার কোন সম্ভাবনা নাই; নিত্যগোপালকে যতখানি পাইয়াছি, তোমাকেও ততখানি পাইয়াছি। তুমি, ভগবান ও জগত এমনভাবে যুক্ত যে একটাকে বাদ দিয়া অপরটাকে ভালবাসিতে গেলে উহা ভালবাসা না হইয়া মোহ হইয়া যায়। একটাতে আটকাইয়া থাকিবার নাম মোহ, আবার শ্রীভগবানে আটকাইয়া থাকিবার নাম প্রেম। কামে জীব কোনও একটা বিশেষ বস্তুতে মুগ্ধ হইয়া থাকে, কারণ কাম স্বার্থযুক্ত, আর প্রেম বৈরাগী, স্বার্থশূন্য; কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুতে আসক্ত না করাইয়া শ্রীভগবানের ভিতর দিয়া জগতের সংগে মিলন করায়। মনে রাখিও "জগতকে শ্রীনিত্যগোপালের ভিতর দিয়া দেখিতে হইবে, শ্রীনিত্যগোপালের ভিতর দিয়া পবিত্রভাবে ভালবাসিতে হইবে ও তাঁহার ভিতর দিয়াই পাইতে হইবে। কাহাকেও

পাইতে হইলে শ্রীভগবান হইতে তাহা স্থুরু করিতে হইবে, শ্রীভগবানকে পাইতে পাইতে জগতকে পাইবে এবং জগতকে পাইতে পাইতে আপনার স্ত্রী পুত্রদিগকে পাইবে। তাই বলি ইহা ভুলিও না। স্বার্থ নিয়া স্ত্রীপুত্রকে ভালবাসা যায় কিন্তু সমস্ত জগতকে কেহ স্বার্থ নিয়া ভালবাসিতে পারে কি? অসম্ভব। স্বার্থ থাকিলে যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও স্থিরভাবে ভালবাসা থাকে না, তাহা তো বুঝ; স্বার্থ পূর্ণ হইলেই আর দরকার কি? প্রকৃত প্রেম যাহা, তাহা স্বার্থগন্ধহীন। যতই তুমি আমাকে তোমার নিজের আদরের জিনিষ না ভাবিয়া জগতের আদরের জিনিষ ভাবিবে এবং "জগতের সকলের নিকট হইতে আদর লাভ করুক" এই প্রার্থনা করিবে ততই দেখিবে আমি তোমার কত মিষ্টি। এখনই দেখ না কেন, আমি যতই আদর পাইতেছি তুমি ততই আমাকে ভাবিয়া সুখ পাইতেছ। ......আগে স্বামীকে জগতের কাছে অর্পণ কর, পরে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ কর। সংসারে অতি অল্প লোকই স্বামীকে পাইয়াছে। স্বামীকে পাইয়াছিলেন রাধা, সীতা। তাই তো আজও কৃষ্ণ রামের পূজা জগতে প্রচারিত। যে দিন জগৎ আমাকে আদর করিবে সেই দিনই আমি তোমার মাঝে অমর হইয়া বিহার করিব, নচেৎ স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা হইতেই হইবে।

তোমার স্বামীকে দিয়া জগতের ও নিত্যগোপালের প্রয়োজন আছে। হাসিমুখে বিদায় না দিলে নিত্যগোপাল নিবেন কেন?

তোমার নয়নজল ঠাকুরকে বিচলিত করিয়াছিল তাই তিনি বৃন্দাবন হইতে পাঠাইয়া দিলেন। হুগলীতে ঠাকুর বলিলেন "তোমার স্ত্রী তোমার জন্য কাঁদেন, তোমার বাটী যাওয়া ভাল"। তোমার নয়নজল পশ্চাতে ফেলিয়া আমি জীবনে কিছুই করিব না, করিতে পারিব না। তোমার হাসিমাখা মুখই আমার সংসারের সকল কর্ম্মের সিদ্ধির মুলমন্ত্র। ......আমি তোমাকে দিয়াই আমি। তোমার আমিকে জগৎকে দিবে কি? জগৎকে দিলেই কিন্তু তোমার হইবে। তোমার স্বামী তোমারই থাকিবে, জগৎ একটু তোমার স্বামীকে নিয়া আনন্দ করুক না, ইহা তো তোমারই গৌরব। তোমার জিনিষ তুমি ছাড়িয়া দিলে জগৎ পাইবে, আর তুমি যদি আটকাইয়া শুধু তোমার করিয়া রাখ তবে জগতের তো হইলই না, তোমারও হইবে না। ...তোমার নিকট হইতে ভিক্ষা না করিয়া জগৎ কিংবা নিত্যগোপাল আমাকে নিবেন না—ইহা স্থির। যতখানি তোমার স্বামী জগতের, ততখানিই তোমার হইল। জীবনে মরণে আমি তোমাকে ভুলিব না। তুমি যে আমার সাধনার মূরতি, আমি তোমাকে দিয়াই নিত্যগোপালকে পাইতেছি এবং পাইব। তুমি তোমারই সম্পত্তি তোমার স্বামীকে নিত্যগোপালের হাতে দিয়া দিও; নিত্যগোপাল পূর্ণ সুন্দর করিয়া আবার তোমাকেই ফিরাইয়া দিবেন। তিনি কাহারও দান গ্রহণ করেন না। আগামী ১৮ই চৈত্র শনিবার নিত্যগোপালের জন্মোৎসব। নিত্যগোপালের জন্মেই আমার জন্ম জানিবে। নিত্য-

গোপালের জন্মোৎসবে আমার জন্মোৎসব করিও, স্বামী নিত্য-গোপালের নাম জপ প্রাণ ভরিয়া করিও, তোমার ভয় কি ? শ্রীভগবান তোমার। আমার যখন তখন তোমারও কোন সন্দেহ নাই”।

প্রকৃতির হাত হইতে যে জোর করিয়া ছাড়িয়া আসা যায় না, তাহাতে যে ছাড়া হয় না, নিজের জীবনই যে রক্তারক্তি হয়, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। নারী-প্রকৃতির এবং বিশ্বপ্রকৃতির হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার শরণাগত হইয়া, তাঁহার সেবা করিয়া, ভজনা করিয়া, তাঁহাকেও ভগবৎভাবে গড়িয়া তুলিয়া, তাঁহাকে লইয়াই যে ভগবৎ আস্বাদন করিতে হয়, শরৎকুমারের জীবন তাহার দৃষ্টান্ত। ঊষাঙ্গিণীদেবীকে তিনি অষ্টমী পূজার দিনে শাঁখা শাড়ী ফুলচন্দন দিয়া পূজা করিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীকে, বিশ্বকে ভজনা করিয়া, সেবা করিয়া, ভজনীয় দৃষ্টিতে দেখিয়া স্বামী ও স্বামীজী হইয়াছিলেন। “রাধারে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম পেয়েছি অনেক আশে”। ঊষাঙ্গিণীদেবীকে শরৎকুমারের সংগে সংগে না রাখিলে কেমন করিয়া তিনি স্বদেশীযুগের নেতা শরৎকুমার ঘোষ এবং পরবর্ত্তীকালের বেদান্ত প্রচারক পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত হইলেন তাহা বুঝা যাইবে না। সেইজন্য মাঝে মাঝে ঊষাঙ্গিণীদেবীর নিকট লিখিত পত্র ২।১ খানা তুলিয়া দিব।

জগদীশবাবুর বাসায় যে ঘরে শরৎকুমার থাকিতেন, সেই ঘরের নিকট একটা আমগাছ ছিল। সেই গাছটিকে তিনি ভাল-বাসিতেন। সেই গাছ হইতে তিনি কি তত্ত্ব আহরণ করিয়াছিলেন

বা সেই আমগাছ তাঁহাকে কি তত্ত্ব দান করিয়াছিল তাহারই উল্লেখ করিতেছি। একটি আমগাছে শত শত আম হয়। প্রতি আমের ভিতর আর একটি আমগাছ সৃষ্টি করিবার যোগ্যতা সে সেই আমগাছ হইতেই আহরণ করিয়া পাকা আম হইয়া মাটিতে চ্যুত হয় এবং আবার একটি আম গাছে পরিণত হইয়া সেও আবার শত শত আম সৃষ্টি করে, এইভাবে সৃষ্টি প্রকরণ চলিয়াছে। তত্ত্বান্বেষী শরৎকুমার ইহার ভিতর হইতেই ভগবানকে যে ভক্ত বুকের ভিতর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিবেন এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই গাছের পাতা লইয়া দেখিয়াছেন একটি পাতা অন্যটির মত নয়, অথচ মূলে তাহারা একই আম গাছের পাতা। এই বহুবৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ স্ব স্ব বৈচিত্র্য বজায় রাখিয়াই মূলে এক। এইরূপে তাঁহার জীবনে অহরহ তত্ত্বের বিকাশ সর্ব্বভূতের ভিতর দিয়া প্রকাশিত ও আস্বাদিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বভূতের সহিত এক হইয়া সকলের সুখ দুঃখের সহিত সম হইয়াই বিশ্বসেবা করিয়াছেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে একবার দুর্ভিক্ষের বক্তৃতা দিতে যাইবেন। ৪ দিন উপবাসী থাকিয়া অন্ন না খাইলে যে জ্বালা তাহা নিজে কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়া তবে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণের নিকট বক্তৃতা দিয়াছিলেন, পেট ভরিয়া খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বুভুক্ষুদের সামনে সখের বক্তৃতা তিনি দেন নাই। যাহা করিয়াছেন নিজের রক্ত দিয়া তাহা করিয়াছেন।

তিনি ঠাকুরকেও প্রাণের আবেগপূর্ণ ভাষায় পত্র দিতেন।

তাহাতে প্রাণেশ্বরাদি পাঠ থাকিত এবং লিখিয়া দিতেন আমার পত্র কাহাকেও দেখাইবেন না। রসিক চূড়ামণি নিত্যগোপাল শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিতেন, শরতের একখানি পত্র আসিয়াছে সে তোমাদিগকে দেখাইতে নিষেধ করিয়াছে এই বলিয়া সেই পত্র তাঁহাদেরই একজনকে পড়িতে বলিতেন, সবাই শুনিত। শরৎকুমার যখন ছুটীতে হুগলী যাইতেন সকল গুরুভাই সেই সকল কথা বলিয়া ঠাট্টা করিতেন; কোন গুরুভাই দিদিমণি ডাকিতেন, কেহ শরৎদিদি ডাকিতেন, কেহ জমা খরচের খাতায় শরৎকুমারী বসু লিখিতেন (ঠাকুর বসু বংশের ছিলেন)। হুগলী যাইয়া শরৎকুমার একদিন ঠাকুরকে বলিলেন আপনি আমার চিঠির কথা সকলকে বলেন।

ঠাকুর বলিলেন— কে বলিল, সকলকে বলি ?

শরৎকুমার বলিলেন—এই যে সেই সকল কথা বলিয়া সকলে আমাকে ঠাট্টা করে। ঠাকুর মুখে হাত দিয়া হো হো করিয়া খুব হাসিলেন। বলিলেন—উহারা আনন্দ পায় তাই বলি।

দোল পূর্ণিমা, ঠাকুর খাটের উপর বসিয়া আছেন, সবাই তাঁহার পায়ে আবির দিতে গেলেন, শরৎকুমার আবির হাতে লইয়া তাঁহাদের সহিত গেলেন কিন্তু কাছে যাইয়া কি হইল আবির না দিয়া চলিয়া আসিতেছিলেন। ঠাকুর বলিলেন "শরৎ চলিয়া যায়, ধর ধর উহাকে।" কাহাকে

ধরিবে, ততক্ষণ তিনি এক ঘরে কপাট দিয়া কাঁদিতে বসিয়াছেন। তাঁহার বড় অভিমান ছিল। ঠাকুর এখন গুরু সাজিয়া আসনে বসিয়া থাকেন, শিষ্যরা পায়ে আবির দেন, কিন্তু তিনিই একদিন নিতাই পাল প্রভৃতির সহিত পিচকারী লইয়া আবির খেলিয়াছেন। সেই কথা মনে পড়ায় শরৎকুমারের আর আবির দেওয়া হইল না। তিনি বলিতেন ঠাকুরকে কত ভক্ত কত কি খাওয়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু আমার তো আর খাওয়ান হয় নাই। আমার মনে হইত আমি যেমন ঠাকুরকে খাওয়াইব তিনিও যদি আমাকে খাওয়ান তবেই তো রসের আস্বাদন হয়। সেই সময় শ্রীনিত্যগোপাল প্রায় সময় সমাধি-মগ্ন থাকিতেন। একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিষ্যদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। শরৎকুমার একদিন মাত্র হুগলীর নিত্য কুণ্ডে ঠাকুরকে স্নান করিতে দেখিয়াছিলেন। স্বচ্ছ জলে সেই মনোমুগ্ধকারী ঠাকুরের গায়ের রং এর সৌন্দর্য্য যেন চারিদিকে বিস্ফুরিত হইয়াছিল।

শরৎকুমার বরিশাল স্কুলে কাজ করিতেন। বৃদ্ধ পিতা, রুগ্না মাতা, স্ত্রী পুত্রাদি সকলেই কাঁকরধা থাকিতেন। বড় ভাই প্রসন্নকুমার বাড়ীতেই থাকিতেন, তিনিই সংসার দেখিতেন; তাঁহার স্ত্রী ও এক কন্যা ছিল। শরৎকুমারের প্রাণ বিশ্ব সেবার জন্য পাগল; কিন্তু তাঁহার পিতার সংসার তো আর বিশ্বছাড়া নয়, তাই তিনি সংসারী লোকের মত সংসার না করিলেও যাহার প্রতি যতখানি তাঁহার দৃষ্টিতে করণীয় মনে করিয়াছেন

তাহা তিনি করিতে ক্রটী করেন নাই, বিশেষতঃ তিনি সকলকেই ভালবাসিতেন বলিয়া সকলেরই সত্যকার কল্যাণকামী ছিলেন। একবার বাড়ী হইতে সংবাদ আসিল প্রসন্নকুমার ঢাকা গিয়া আর আসেন না, তাহার সকল সংবাদও দেন না। শরৎকুমার সংবাদ পাইয়া ঢাকা চলিয়া গেলেন, সেখানে যাইয়া দাদাকে অনেক বুঝাইয়া অনেক অনুরোধ করিয়া বাড়ী লইয়া আসিলেন। দাদার জন্য ঠাকুরের নিকট কত কাঁদিলেন, কত প্রার্থনা করিলেন। কিছুদিন পর আবার একদিন পত্র আসিল প্রসন্ন কুমার কোথায় চলিয়া গিয়াছেন মা বাবা স্ত্রী কাঁদিয়া আকুল। শরৎকুমার দাদার খোঁজে কলিকাতা চলিয়া গেলেন। কোথায় দাদা! বিরাট কলিকাতা সহরে কোথায় পাইবেন? দাদার খোঁজে রাস্তায় রাস্তায় কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ঠাকুরের কৃপায় বন্ধুবর্গের সাহায্যে খোঁজ মিলিল, কত অনুরোধ করিয়া, কত বুঝাইয়া পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া দাদাকে লইয়া হুগলী মঠে শ্রীনিত্যগোপালের নিকট লইয়া গেলেন। ঠাকুর প্রসন্নকুমারকে কোলে তুলিয়া লইলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে মাতৃভাবে দেখিতেন এবং মা বলিয়া ডাকিতেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি সন্ন্যাস লইয়া প্রেমানন্দ অবধূত নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

শরৎকুমার একদিন ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন---"ঠাকুর, আপনি আমাকে কৃপা করিলেন, আমার মা বাবাকে কৃপা করিবেন"। ঠাকুর বলিয়াছিলেন—'তাহাদের কথা আমার মনে থাকিল'। শ্রীনিত্যগোপাল শ্রীমুখে একদিন বলিয়াছিলেন—"তোমাদের

ভিতর দিয়া যে কেহ আসিবে আমি তাহাকেই কোলে তুলিয়া লইব"। শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার ভক্তদের পরিবারদিগকে তো কৃপা করিতেনই, তাহাদের বাড়ীর কুকুরকে পর্য্যন্ত কৃপা করিয়াছিলেন। এ দৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন।

শরৎকুমারের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার মাতা মুক্তকেশী দেবী বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। চাকুরির জীবন, মায়ের নিকটে থাকিয়া মায়ের সেবা করিতে পারেন নাই জন্য প্রাণে বেদনা-বোধ করিয়াছেন, বরিশাল থাকিয়া সর্ব্বদাই মায়ের খোঁজ লইয়াছেন, তাজা মাছ কিনিয়া মায়ের জন্য লোক মারফৎ পাঠাইয়াছেন। মাকে সুস্থ রাখিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। যোগ্য পত্নী ঊষাঙ্গিণী দেবী প্রাণপণে স্বামীর আদেশ অনুযায়ী চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সেবায় পরিবারের সকলেই তৃপ্ত ছিলেন, তিনি প্রাণপণে শাশুড়ীর সেবাযত্ন করিয়াছেন কিন্তু যাহার যাইবার সময় হইয়াছে কে আর তাঁহাকে রাখিবে? শরৎকুমারের জননী মুক্তকেশী দেবী একদিন স্বামী পুত্র রাখিয়া নিত্যধামে গমন করিলেন। শরৎকুমার মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য ঠাকুরকে লিখিলেন, আপনাকে আমার মাতৃশ্রাদ্ধের অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। আপনি এই কাজে একটি পয়সা দিলেও আমি পরম তৃপ্তি লাভ করিব। ঠাকুর শ্রাদ্ধের জন্য ২৫৲ টাকা পাঠাইয়াছিলেন। ভক্তগণ রহস্য করিয়া জমা খরচের খাতায় নিত্যগোপালের শাশুড়ীর শ্রাদ্ধে ২৫৲ টাকা দান লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। খুব সমারোহের সহিত

জননীর শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া শরৎকুমার বরিশাল কার্য্যস্থলে চলিয়া গেলেন।

শরৎকুমার আর একবার হুগলী গিয়াছেন। যাইয়া শুনিলেন ঠাকুরকে কে বিষ খাওয়াইয়া ছিল। ভক্তদের সন্দেহ হয় মঠের সামনে অন্য সম্প্রদায়ের একটি মহিলা থাকিতেন এবং তিনি মাঝে মাঝে খাবার পাঠাইয়া দিতেন। সেই দিনও তাহার দেওয়া খাবার খাইয়া ঠাকুরের কষ্ট হইয়াছিল। সে জন্য তাহার হাতের খাবার ঠাকুর আর না খান একথা ঠাকুরকে বলিবার সাহস কাহারও হইতেছিল না। এমন সময় শরৎকুমার যাওয়ায় এবং তিনিই তখন গুরুভাইদের মধ্যে ছোট ছিলেন, ঠাকুরকে যখন যাহা জানাইবার প্রয়োজন তাহাকে দিয়াই সকলে জানাইতেন। শরৎকুমার ঠাকুরকে বলিলেন, আপনাকে নাকি বিষ খাওয়াইয়াছিল? ঠাকুর বলিলেন—"সেদিন খাওয়ার পর খুব জ্বালাবোধ করিলাম, তাহার পর প্রাণায়াম করিয়া বাহ্যের সহিত বিষটা বাহির করিয়া ফেলিলাম; কিন্তু শরীরে ভীষণ জ্বালা—ঘরের জানালা কপাট সমস্ত ভুলিকে খুলিয়া দিতে বলিলাম। দুই দিন পর্য্যন্ত জ্বালা ছিল"। শরৎকুমার বলিলেন, আমাদের সকলের মনে হয় ঐ মহিলাটি যে খাবার পাঠান তাহার ভিতর বিষ ছিল, আমাদের ইচ্ছা আপনি আর ঐ খাবার খাইবেন না। ঠাকুর বলিলেন—"কেহ কিছু আমাকে খাইতে দিলে তাহা আমি না খাইয়া পারিব না"। তিনি বলিলেন—তবে খাবার সময় একটু

সাবধান হইয়া খাইবেন। ঠাকুর বলিলেন—"এখন হইতে তাহাই করিব"। কি বিরাট প্রাণ ছিল ঠাকুরের, সকলকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন উহাকে যেন কিছু না বলা হয়। ইহার পর আর দুই এক বারই মাত্র শরৎকুমারের ঠাকুরের পার্থিব দেহের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

বরিশাল থাকাকালীন কলিকাতা হইতে এক পত্র আসে, তাহা এইরূপ—

"শরৎবাবু, আপনার ক্ষমা গুণ যথেষ্ট আছে। আমরা বার বার পত্র লিখিয়া যথাসময়ে উত্তর না পাইলে ধৈর্য্য হারাইতাম। আপনার আমাদের প্রতি অকপট ভালবাসা, সরল ব্যবহার, সদাশয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী আপনাকে আমাদের নিকট চিরকাল স্মরণীয় রাখিবে। তবে আমার মত হীন ব্যক্তি যে চিরকাল আপনার স্নেহ ভালবাসা পাইবে তাহা বোধ হয় না। ঠাকুরকে……মনের সন্দেহ……মিটাইবার জন্য দু'এক কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। আমার বিশ্বাস, মনে সন্দেহ পুষিয়া বাহিরে প্রভু প্রভু করা গুরু-ভক্তি নহে। ভাই, জানি না ভগবানের মনে কি আছে। প্রণাম জানিবেন"। জনৈক ভক্তের মনে ঠাকুরের সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়ায় শরৎকুমারের নিকট এই পত্র দিয়াছিলেন। তিনি তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন—আমি ঠাকুরের কোন কার্য্যের সমালোচনা বা অবিশ্বাস করিব না। কেন না আমি ঐ স্তরের কথা জানি না। তবে ইহা আমি বিশ্বাস করি

এমন স্তর নিশ্চয়ই আছে যেখানে দাঁড়াইয়া ঠাকুর যাহা করেন তাহা করা সম্ভব হয়। মনের স্তরে দাঁড়াইয়া কোন অবতারেরই ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব নয়, শরৎকুমার ইহা জানিতেন; তাই প্রাণবল্লভ নিত্যগোপালকে শুধু প্রাণ দিয়াই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই জন্য শ্রীনিত্যগোপালের তত্ত্বঘন জীবন তাঁহার নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। শ্রীনিত্যগোপালই বর্ত্তমান যুগের একমাত্র পথ-নির্দ্দেশক। পরমহংসদেবই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীনিত্য-গোপালকে চিনিয়াছিলেন, তাই তিনি বলিয়াছিলেন--ট্যাকে টাকা আর সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব। নিত্যগোপাল ছিলেন অবধূত শিরোমণি—বিষয় আর সমাধি তাহার জীবনে ছিল সমপর্য্যায়ভুক্ত।

শরৎকুমার তখন বরিশালে। ১৩১৭ সনের ৭ই মাঘ শনিবার রাত্রি ১০টার সময় শ্রীনিত্যগোপাল তিরোধান করিয়াছেন এই সংবাদ তারযোগে সেই রাত্রেই শরৎকুমার অবগত হন এবং সেই মুহূর্ত্তেই তিনি হুগলী রওনা হন। পরদিন বৈকালে হুগলী পৌঁছিয়া শুনিতে পাইলেন যে কলিকাতায় মনোহর পুকুর রোডে ঠাকুরকে সমাধি দেওয়ার জন্য দেহ সেখানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ঠাকুরের নির্দ্দেশ ছিল মনোহরপুকুর রোডে মহানির্ব্বাণ মঠে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হইবে। শরৎকুমার সেখান হইতে তখনই কলিকাতা রওনা হন এবং সমাধি দেওয়ার কিছু পূর্ব্বে সেখানে উপস্থিত হন। এইভাবে চির আদরের ধনকে চিরসমাধিমগ্ন করিয়া কি প্রাণ লইয়া তিনি বরিশাল

ফিরিলেন তাহা ব্যক্ত করিতে আমি অক্ষম। শরৎকুমারের পাগল প্রাণ বিশ্বের মাঝে পাঁতি পাঁতি করিয়া সারা জীবন তাহার প্রাণবল্লভ শ্রীনিত্যগোপালকেই খুঁজিয়া গিয়াছে এবং শ্রীনিত্যগোপালকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহার জীবনের শেষ নিশ্বাসটুকুও ব্যয়িত করিয়া গিয়াছে।

ঠাকুর চলিয়া গেলেও গুরুভাইদিগের সহিত সর্ব্বদা পত্রাদি দ্বারা ও যাতায়াত করিয়া তিনি যোগাযোগ রাখিয়াছেন। একজন গুরু-ভাই-এর নিকট লিখিত পত্র একখানি এখানে তুলিয়া দিলাম। শরৎকুমারের শ্রীনিত্যগোপালের প্রতি কি গভীর বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল তাহা প্রত্যেকের নিকট লিখিত পত্রের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাহার লিখিত পত্রগুলি তুলিয়া দিবার প্রলোভন হইতে বিরত থাকিতে পারিতেছি না। আমি মনে করি আমার নিরাভরণা দরিদ্র লেখনীর এই পত্রগুলিই অলঙ্কারস্বরূপ।

"ভাই চিন্তাহরণ, তোমার পত্র পাইয়া নিরতিশয় প্রীতি-লাভ করিলাম। তুমি ব্যাকুল হইয়াছ, তোমার ব্যাকুলাত্মা শান্তিলাভ অবশ্যই করিবে। ভয় কি? পরম দয়াল শ্রীনিত্য-গোপাল যাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন তাহার আবার দুঃখের কারণ কি? নির্ভয় হইয়া তাহার নাম গুণগান কর। আমাদের সমস্ত ভার তাহার উপর, আমরা বড় ভাগ্যবান যে তিনি দয়া করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিয়াছেন। দুই একটি কথা শুনিতে ইচ্ছা কর, যাহা বুঝি তাহা লিখিতে কুণ্ঠিত হইব কেন?

আমরা তাঁর বলিয়াই তো সকলে সকলের আপন। পরস্পরের সহিত আলোচনা করা যে তাঁহারই সাধনা। আমাদের প্রথমাবস্থায় ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা করিতে হইবে—সম্প্রদায়, ধর্ম্ম ও শ্রীভগবান। আমাদের উপাস্য তিনটি—(১) নিত্য সম্প্রদায় (২) নিত্য ধর্ম্ম (৩) শ্রীনিত্যগোপাল। সম্প্রদায়ের পূজা না করিয়া কেহই উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারেন নাই। এই দেহযন্ত্রের ভিতর কোন একটি অঙ্গ অপর সমস্ত হইতে পৃথক হইয়া বাঁচিতে পারে না, পরন্তু বাতব্যাধিগ্রস্ত হয়; সে যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অপর অঙ্গগুলি তাহার সজীবতার জন্য চেষ্টা করে, এবং অপর অঙ্গও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে সে নিজের শক্তির দ্বারা তাহাকে সাহায্য করে; সকল অঙ্গগুলি মিলিয়াই একটি দেহ। এই দেহের ভিতর যাহারা ঐক্য চিন্তা না করিয়া ভেদবুদ্ধি আনয়ন করিবেন, তাহারা মরিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। আমরা নিত্য সম্প্রদায়ের এক একটি অঙ্গ; নিত্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সর্ব্বদা ঐক্যচিন্তা করিতে করিতে দেখিবে যে তোমার দুর্ব্বলতার দিনে তোমার সম্প্রদায়ের কোন সাধকের ভিতর হইতে তোমার অজ্ঞাতসারে শক্তি আসিয়া তোমাকে সাহায্য করিতেছে। সম্প্রদায়রূপে তিনি প্রকাশিত। প্রত্যহ 'নিত্য-সম্প্রদায়-রূপিণে শ্রীনিত্যগোপালায় নমঃ' বলিয়া প্রণাম করিবে। প্রথম অবস্থায় নিত্য সম্প্রদায় বলিতে শ্রীনিত্যগোপালের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আশ্রিতদের সমষ্টিই বুঝিতে হইবে; কিন্তু মনে রাখিও জগতের পশু পক্ষী কীট

পতঙ্গ জড় চেতন সবই নিত্য সম্প্রদায়ভুক্ত। কেহই নিত্য সম্প্রদায়ের বাহিরে নয়। এই জগৎকে একদিন নিত্যপরিবার বলিয়া বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া নিত্য সম্প্রদায়ের পূজা রোজ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া নিত্য সম্প্রদায়কে নমস্কার করিবে, দেখিবে নিত্য সম্প্রদায়ের প্রসারতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। বিদ্বেষবুদ্ধি অবশ্য পরিত্যজ্য, জগতে এক নিত্য পরিবার।

নিত্য সম্প্রদায়ের পূজা করিতে করিতে "নিত্যধর্ম্ম" প্রাণে ফুটিবে, কোন ধর্ম্মকে অনিত্য ধর্ম্ম বলিয়া মনে হইবে না। সকলই আমার নিত্যধর্ম্ম হইবে ইহা আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইবে। প্রত্যহ 'নিত্যধর্ম্মরূপিণে শ্রীনিত্যগোপালায় নমঃ' বলিয়া প্রণাম অভ্যাস করিবে।

নিত্যধর্ম্মে শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া তাঁহার পূজা করিতে করিতে মূর্ত্তিমান নিত্য ধর্ম্ম শ্রীনিত্যগোপাল প্রাণে প্রকাশিত হইবেন। শ্রীনিত্যগোপাল নিজের নিত্যস্বরূপ ও নিত্যরূপ প্রকাশিত করিবার জন্য নিত্যধর্ম্ম ও নিত্য সম্প্রদায়রূপে প্রকাশিত। ধন্য আমরা নিত্য সম্প্রদায়ে আসিয়া পড়িয়াছি। জগতে এক-মাত্র নিত্য আশ্রমই আছে। মনোহরপুকুর হইতে তাঁহার কার্য্য আরম্ভ হইবে এই পর্য্যন্ত। নিত্য মঠের কার্য্যক্ষেত্র জগৎ। নিত্য সম্প্রদায়কে গণ্ডীর ভিতরে ফেলিও না। ঠাকুরের বিদ্বেষী যাঁহারা তাঁহারাও তাঁহারই লীলাপুষ্টি করিতেছেন জানিবে। শত্রু মিত্র নিয়াই নিত্যলীলা। 'নিত্যলীলা'য় সর্ব্বরসের সমন্বয়

দেখিবে, এক ঘেয়ে রস নিত্যধর্ম্মে নাই। নিত্যধর্ম্ম যে সর্ব্ব রস, সর্ব্ব গন্ধ, সর্ব্ব স্পর্শ, সর্ব্ব রূপ, ও সর্ব্ব শব্দের সমন্বয়মূর্ত্তি। লীলা পূর্ণ, অপূর্ণ নহে। পূর্ণের, নিত্যের রাজ্যে অপূর্ণ ও অনিত্যের স্থান নাই। তাই প্রাণ ভরিয়া বলি—

"নিত্য-সম্প্রদায়রূপিণে শ্রীনিত্যগোপালায় নমঃ
নিত্য-ধর্ম্মরূপিণে শ্রীনিত্যগোপালায় নমঃ
নিত্যরূপিণে শ্রীনিত্যগোপালায় নমঃ"।

শ্রীনিত্যগোপাল তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া তোমার আপনার হউন, ইহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি। আমার পত্রের উত্তর বরিশালে দিও। আমাদের স্কুল ২৫শে খুলিবে। আমার ঠিকানা– c/o বাবু জগদীশ মুখার্জী, বি. এ.

তোমাদের শ্রীশরৎকুমার ঘোষ"।

ঠাকুর চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহাকে প্রচার করিবার জন্য দাদা প্রসন্নকুমার এক পত্র দিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে শরৎকুমার লিখিয়াছিলেন—"ঠাকুরের প্রচার ঠাকুর করিবেন। যাহার প্রচার সমাজের ধর্ম্ম ভাবের আমূল পরিবর্ত্তন, তাহা একদিনে হঠাৎ হুজুগে হওয়া সম্ভব নয়, বরং হুজুগে দেরী হইবে। তত্ত্বের দিক্ দিয়া ঠাকুরকে আগে প্রচার না করিলে তিনি প্রচারিত হইতে পারেন না, যেহেতু ভগবান চিরদিনই তত্ত্বের ঘনীভূত অবস্থা। তবে ভক্তভাবে জগতের সামনে প্রচার করা যাইতে পারে। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য সমাজের সামনে তাঁহার ভক্ত-জীবনটা উপস্থিত করা এবং তৎসঙ্গে তাঁহার

প্রচারিত তত্ত্বটি (যাহার পরিণতিতে উহা ঘন হইয়া মূর্ত্তি ধারণ করিবে) বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করা। এই ভাবে আস্তে আস্তে সন্তর্পণে উতলা না হইয়া কার্য করিয়া গেলে শীঘ্রই তাঁহার তত্ত্বে দেশ উদ্বুদ্ধ হইবে। নিত্যগোপালের আকার, সাকার ও নিরাকার তিনটি রূপ, তিনিই তো লিখিয়া গিয়াছেন। জগতের সকলেই এই তিনটি আস্বাদন করিবে তাহা অসম্ভব, কোন প্রমাণ নাই। জগৎ তত্ত্ব-মূর্ত্তিটী বুঝিলেই যথেষ্ট, আর তত্ত্ব-ভাবটি না বুঝিয়া উপায়ও নাই, যেহেতু উহা সৃষ্টির সহিত জড়িত। আবার ভক্ত-ভাবটি অতি অল্প কয়েকজন ভাগ্যবান সাধক বুঝিবেন। সাকার ভাব নিয়া হৈ চৈ করিলে কার্য পণ্ড হইবার সম্ভাবনা বেশী। তাই তত্ত্ব-নিত্যগোপাল ও ভক্ত নিত্যগোপালই আমার সমধিক প্রিয়, এই দুই ভাবের পশ্চাতে রহিয়াছেন ভগবান নিত্যগোপাল। যাক্, যাহা তাঁহার ইচ্ছা তাহাই হইবে"। শরৎকুমার প্রাণ ভরিয়া হাজার হাজার লোকের সামনে শ্রীনিত্যগোপালের তত্ত্ব প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন এবং জীবনের শেষ ভাগে তিনি যে ভগবান ইহা সর্ব্বসমক্ষে জোর গলায় বলিয়া গিয়াছেন। দেশ নিত্যগোপালকে কতটুকু লইয়াছে বা লইবে তাহা দেশ বুঝিবে।

এদিকে চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করে। বড়পুত্র সত্যব্রতকে সাত বৎসর বয়সে নিজের নিকট বরিশাল লইয়া আসেন এবং স্কুলে ভর্ত্তি করেন। বৃদ্ধ পিতা বাড়ী থাকায় বরিশাল বাসা করিয়া স্ত্রী পুত্রকে রাখিতে পারেন নাই। একবার আমশায়

রোগে ভুগিয়া খুব শীর্ণ হইয়া যান। শরৎকুমার মাছ খাইতেন না। জগদীশবাবু অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তিনি একদিন নিজে মাছ ভাত খাইয়া সেই পাতে বসাইয়া শরৎকুমারকে মাছ ভাত খাওয়াইয়া ছিলেন। জগদীশবাবুর স্নেহ তিনি সারাজীবন স্মরণ করিয়া গিয়াছেন।

শরৎকুমার নানা কাজে ব্যস্ত থাকিলেও ঊষাঙ্গিণী দেবীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল এবং সেই ভালবাসা কেমন করিয়া ভগবৎ ভাবে গড়িয়া উঠে তাহার জন্য তাঁহার যে প্রচেষ্টা তাহা তাঁহার জীবন পথে চলার মাঝে মাঝে প্রকাশ না করিলে তাহার জীবন-কথা বলা অর্থহীন হইয়া পড়ে, শ্রীনিত্যগোপালের সংসার সন্ন্যাস সমন্বয়ের ধারা অব্যাহত থাকে না।

"জয়তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল বরিশাল ৬ই চৈত্র

তোমার পত্র পাইয়াছি, আমার পত্রের উত্তর দেরীতে দাও তাহাতে আমি কষ্ট পাই। একটু দয়া করিয়া শীঘ্র উত্তর দিও। শ্রীশ্রীদোলযাত্রার উৎসব বিষয় জানিতে চাহিয়াছ। খুব আনন্দ হইয়াছে। দিনরাত্র শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের নাম কীর্ত্তন, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি হইয়াছিল। আনন্দ কেবল আনন্দ। তোমার ইচ্ছায় আমি আনন্দে আছি। তোমার স্বামী শ্রীনিত্যগোপালের কাছে আমার কথা একটু বলিও, তুমি আমার উপর দয়া রাখিও। তোমাদের কথা আমি শ্রীনিত্যগোপালের শ্রীচরণে সর্ব্বদাই নিবেদন করি। তোমার স্বামী বড় দয়াল, সর্ব্বদা স্বামীর ভিতর দিয়া তাঁহার চিন্তা করিও। স্বামী কৃষ্ণ তোমার

সহায়। সর্ব্বদা স্বামী চিন্তা, স্বামী ধ্যান, স্বামী নাম জপ কর। ইহা নিত্যগোপাল পাইবার প্রধান সাধনা। সাধন কর, স্বামী তোমার সহায়। স্বামী-আজ্ঞা প্রাণপণে পালন কর, ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই। নিশ্চয় বলিতেছি শ্রীনিত্যগোপালের কৃপা-আশীর্ব্বাদে তোমাদের কোনই চিন্তার কারণ নাই। নিত্য কাল আনন্দ সাগরে ডুবিয়া থাক, নিরানন্দের বাতাসও যেন তোমাকে স্পর্শ না করে, ইহাই আশীর্ব্বাদ করি। তোমার কাছে তোমার স্বামী শ্রীনিত্যগোপালময় হইয়া বিরাজ করুক। তোমার কোলে খোকারা বাল গোপালভাবে নিত্য কাল তোমার আনন্দ বিধান করুক ইহাই আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। শ্রীনিত্যগোপাল দূরে নন। তিনি স্বামীর ভিতরে থাকিয়াও তোমাকে তাঁহার দিকে টানিতেছেন। আবার পুত্রদের মধ্যে থাকিয়া তোমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া স্তন পান করিয়া ও সেবা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন। তুমি শ্রীনিত্যগোপালের মাতা ইহাও অতি সত্য। শ্রীনিত্যগোপাল অনন্তভাবে তোমাকে নানা সম্বন্ধে আপন করিতেছেন, তাঁহার প্রেমের লীলা অপূর্ব্ব—তিনি স্বামীতে, তিনি পুত্রতে। একমাত্র নিত্যগোপালই সত্য বস্তু। তাঁহাকে পুত্রের ভিতর দিয়া দেখিয়া ধন্য হও; দেখিবে তিনি চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া পুত্রভাবে তোমার প্রেমে আটকাইয়া পড়িবেন। তিনি আপন হইবার জন্য তোমার পুত্র হইয়াছেন। একটু তাঁহাকে খোঁজ, দেখিবে তিনি যে কত কাছে আছেন। প্রাণের দেবতা এত কাছে থাকিতে ভয় কেন? শ্রীনিত্যগোপাল

বড় পবিত্রতা ভালবাসেন; তাই তোমার দেহকে স্বামীর বলিয়া মনে করিবে, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে; নচেৎ স্বামীর ইচ্ছায় তাঁহার চরণে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া স্বামীর হইলে কই? স্ত্রী-জীবন তো সার্থক হইল না। স্বামী গুরু, স্বামীই সব। স্বামী-চরণ সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করিবে, শ্রীনিত্য-গোপাল পাইতে দেরী হইবে না। শ্রীনিত্যগোপাল তোমার স্বামীর হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন; স্বামীর চরণে সব ঢালিয়া দিয়া স্বামীপূজা করিলে আর ভাবনা কি? যে স্বামীকে আপনার করিতে পারেন তাঁহার আর অপ্রাপ্য কি? সময় নষ্ট করিও না, সময় থাকিতে স্বামীপূজায় ধন্য হও। এখনও স্বামীর হইলে না, প্রাণমন দিয়া স্বামীময় হও। স্বামীর হইতে হইতে শ্রীনিত্যগোপালের হইয়া যাইবে। স্বামী-হৃদয়ে ব্যতীত অন্য কোথায়ও এত সহজ তাঁহাকে ধরিতে পারিবে না। স্বামীর দেহই শ্রীনিত্যগোপালের মন্দির এই চিন্তা ও ধারণা সর্ব্বদা রাখিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে। ভয় নাই স্বামী তোমার সহায়। স্বামীর শক্তি নিয়া স্বামী পূজা কর ও স্বামীর হইয়া যাও। শ্রীনিত্য-গোপালের মধুর নাম নিয়া তাঁহার মন্দির স্বামীদেহে তাঁহাকে আপনার করিয়া রাখিতে চেষ্টা কর। স্বামী ও নিত্যগোপালে ভেদ ভাবিও না। যেই স্বামী সেই নিত্যগোপাল। স্বামীর নামে স্বামী পূজা করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল স্বামী হইয়া যাও। খোকাদের হৃদয়েও তিনি সর্ব্বদা বালকরূপে তোমার সন্তান হইয়া তোমাকে কৃতার্থ করিতেছেন। যখন তাহাদের খাওয়াইবে

তখন মনে করিবে যে শ্রীনিত্যগোপাল তোমার হাতে অন্ন গ্রহণ করিয়া কতই আনন্দ পাইতেছেন। বাস্তবিক তিনি খোকাদের ভিতর থাকিয়া তোমার হাতে অন্ন গ্রহণ করিতেছেন। আর কি লিখিব। আনন্দে থাক, শ্রীনিত্যগোপালের সেবাদাসী হইয়া স্ত্রী-জীবন সার্থক কর"।

শরৎকুমারের ৯০ বৎসরের বৃদ্ধ পিতা নীলকমল ঘোষ ছোট বালকের মত সারা দিনরাত এটা ওটা চাহিয়া মানুষকে বিব্রত করিতেন। দুই পুত্র বধূ শ্বশুরের আব্দার রক্ষা করিতেন ও সেবা যত্ন করিতেন। একদিন শরীরের যন্ত্রণা খুব বেশী বোধ করিয়া বার বার আর্ত্ত স্বরে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"নিত্যগোপাল বাবারে, প্রাণ ত যায় রে"। সকলেই লক্ষ্য করিতে লাগিলেন পূর্ব্বের চাইতে রোগ-যন্ত্রণা যেন বেশী; এক মুহূর্ত্তও শয্যায় স্থির হইয়া শুইতে পারিতেছেন না। সে দিন সন্ধ্যায় সকলেই একটু নূতনত্ব লক্ষ্য করিতেছিলেন। যাহার প্রদীপের আলো মোটেই সহ্য হইত না তিনি সেদিন বলিলেন 'প্রদীপের আলোটা বেশী করিয়া দাও'। রাত্রি ৯টা বাজিয়া গেলে আহারের জন্য অন্নাদি লইয়া আসিয়া পুত্রবধূরা আহার করিতে বলিলেন। তখন তিনি উন্নতজানু হইয়া আহারের নিকট বসিয়া "মা করুণাময়ী! মা করুণাময়ী! মা! মা! কালী করালবদনী! মা! মা! কালী বিশ্বেশ্বরী! কালী বিশ্বেশ্বরী" বলিতে লাগিলেন। কখন হরিবোল হরিবোল কালাচাঁদ কালাচাঁদ হরিনাম সত্য, নিত্য-

গোপালায় নমঃ, ভজ নিত্যগোপাল, কহ নিত্যগোপাল লহ নিত্যগোপালের নাম রে, ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। আবার করুণ কণ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, বাবা রে শান্তি দে শান্তি দে, নিত্যগোপাল রে সৎ পথে রাখ্, সদ্বুদ্ধি দে, অপরাধ ক্ষমা কর। নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল রে আমায় উদ্ধার কর্। আমায় শিষ্য কর্। পুত্র প্রসন্নবাবু বলিলেন —ভাত যে ঠাণ্ডা হইয়া গেল, ভাত খাবেন না? বৃদ্ধ বলিলেন 'হাঁ, রাখ, এই মন্ত্রটুকু শেষ করে নিই'। এই বলিয়া আবার কালী করুণাময়ী নিত্যগোপাল ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। এই ভাবে দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল, পুত্র বধূদ্বয় বলিলেন খাওয়া সারিয়া লন, আপনার যে কষ্ট হইবে; পরে নাম করিবেন। উত্তরে বৃদ্ধ বলিলেন—হ্যাঁ খাই, মুখটা ধুয়ে নেই। মুখ ধুইলেন বটে কিন্তু খাইলেন না, একভাবে শুধু নাম জপ করিয়া যাইতে লাগিলেন—নিত্যগোপাল বাবা রে,...। এই ভাবে রাত্রি ১২টা বাজিল, আবার আহারের কথা বলায় অন্নের থালায় হাত দিলেন কিন্তু মুখে আর দিলেন না। তখন তাঁহাকে ধরিয়া বিছানায় বসাইয়া দেওয়া হইল। এই ভাবে বসিয়া জপ করিয়া সারা রাত্রি কাটিয়া গেল। এক পুত্রবধূ পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন--সমস্ত রাত্রি বসে বসে কাটালেন, কিছু খেলেন না; এখন একটু ফল মিশ্রী দেব? বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, "হাঁ খাব, করুণাময়ী মা এসেছেন, মায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে নেই, শেষে খাব"। আবার সেই নীরব স্তিমিত ভাব। কিছু পরে আবার আব্দারপূর্ণ প্রার্থনায়

বলিতে লাগিলেন—“শান্তি দে, শান্তি দে, নিত্যগোপাল! নচেৎ কিছুই খাব না। বল্ শান্তি দিবি, বল্ আমার দুঃখ দূর করবি, তবে খাব নচেৎ কিছু আর খাবনা, খাবই না”। আবার কিছুক্ষণ পরে বধূরা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু খাবেন না? বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, কি করে খাই? আমাকে যে খেতে দিচ্ছে না। এই বলিতে বলিতে পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, নিত্যগোপাল ছেড়ে দে, আমি ভাত খাব। একটু সময় নীরবে কাটাইয়া আবার সেই আব্দার—কিছুতেই খাব না। বলুক আমাকে শান্তি দেবে তবে খাব নচেৎ খাবনা, নিত্যগোপাল নিত্যগোপাল।

সকাল হইয়া গিয়াছে বৃদ্ধের নেশা যেন কাটিয়া গেল তিনি বলিলেন এখন পায়খানায় যাব। সেই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ যেন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই তিনি হাত মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিলেন, সে মুখে নব লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এই ঘটনা হওয়ার পর হইতেই বিছানায় শুইয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে বলিতেন ও কে যায়, নিত্য-গোপাল নাকি রে? হাঁ, সেই রকমই তো দেখা যায়”। এইরূপ মাঝে মাঝে বলিতেন এবং পুত্র বধূদিগকে ডাকিয়া বলিতেন,আমার সংসারে যাহা কিছু হয় নিত্যগোপালকে না দিয়া যেন কেহ কিছু না খায়, নিত্যগোপাল প্রত্যক্ষ দেবতা, যেই নিত্যগোপাল, সেই কালাচাঁদ যেই কালাচাঁদ সেই নিত্যগোপাল। ক্রমে বৃদ্ধের দেহের অসুস্থতা বাড়িতে লাগিল। শরৎকুমার সংবাদ পাইয়া

বরিশাল হইতে কাকরধা আসিলেন। এই ভাবে একদিন তাঁহার ইহ জগতের খেলা ফুরাইল, শ্রীনিত্যগোপালের নাম করিতে করিতে নিত্য ধামে চলিয়া গেলেন। যিনি কোনদিন নিত্যগোপালকে ভগবান বলিয়া ভাবেন নাই তিনি মৃত্যুকালে বার বার বলিয়া গেলেন যেই নিত্যগোপাল সেই কালাচাঁদ। ধন্য শ্রীনিত্যগোপালের ভক্ত পরিবারের প্রতি অসীম করুণা। দুই ভাই মিলিয়া মহাসমারোহে পিতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। একমাত্র ভ্রাতৃকন্যা—তাহার বিবাহ ঠিক করিয়া নিজে কলিকাতা হইতে বাজার করিয়া সমস্ত দায়িত্ব নিজে লইয়া তাহাকে সুপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপে সংসারের দিকে যাহার প্রতি যতখানি করণীয় ছিল তাহা তিনি করিতে অবহেলা করেন নাই। ইতিমধ্যে ছয় বৎসর বয়সে মেজপুত্র প্রিয়ব্রত মারা যায়। ছেলের মৃত্যুর পূর্ব্বে বাড়ী আসিলে প্রিয়ব্রত বলিয়াছিল, বাবা, আমাকে এক জোড়া জুতা ও একখানি শ্লেট আনিয়া দিও। তাহা আর দেওয়া হইল না। মৃত্যুর পর জগদীশবাবুকে একজোড়া জুতা ও একখানি শ্লেট কিনিয়া দিয়াছিলেন। ঊষাঙ্গিণী দেবী পুত্রশোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। যদিও শ্রীনিত্যগোপালের ভিতর দিয়া পুত্রকে পাইবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন কিন্তু মাতৃহৃদয় ব্যাকুল। ইত্যাদি কারণে বরিশাল বাসা করিয়া স্ত্রীপুত্রগণকে লইয়া আসিলেন। বাড়ী হইতে জমির চাউল আসিত এবং মাস্টারীতে ৪০৲ টাকা পাইতেন ইহাদ্বারা দরিদ্রের মতন কোন প্রকারে

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। স্কুল হইতে আসিয়া রান্নার কাঠ কাটিয়া দিতেন, গাছের শুক্‌না পাতা কুড়াইয়া জ্বালানী করিয়া দিতেন। একদিন বড় ছেলে সত্যব্রত স্নান করিয়া আসিয়া বার বার মা আমি কি পরিব বলিতেছে, শরৎকুমার শুনিয়া বলিলেন—'সত্যব্রত কি বলে শোন না'। উষাঙ্গিণী দেবী বলিলেন—কাপড় চায়, তাহা তো দিয়াছি। তখন সত্যব্রত কাঁদিয়া একখানা কাপড় দেখাইল, তাহা আর পরিবার উপায় নাই। শরৎকুমারের পিতৃহৃদয় বিচলিত হইল, নিজের কাঁধে চাদর ছিল তাহাই পরিতে দিলেন। ছেলেমেয়েকে কোনদিন পূজায় নতুন কাপড় দেন নাই। উষাঙ্গিণী দেবী গোটা কাপড় খুব কমই পরিতেন, ছেঁড়া কাপড় জোড়া দিয়াই অধিকাংশ সময় পরিতেন। স্নেহ-প্রবণ শরৎকুমারের ইহাতে বেদনা বোধ হইত কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ শরৎকুমার তাঁহার চলার পথ হইতে একটুও চ্যুত হন নাই। উষাঙ্গিণী দেবীও সহাস্যমুখেই স্বামীর অনুসরণ করিয়া চলিতেন। স্বামীর আদরে দারিদ্র্য তাঁহাকে আঘাত হানিতে পারে নাই। বরিশাল আসার কিছুদিন পর একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

এইখানে একটা প্রশ্ন জাগে, শরৎকুমারের জীবনে যদি এত ভগবৎ অনুরাগ, এত বৈরাগ্য, তবে তাহার সহিত স্ত্রী পুত্র কন্যা এ আবার কেমন বৈরাগ্য? এইরূপ অদ্ভুত জীবন তাঁহার ছিল বলিয়াই কেহ তাঁহাকে বুঝিতে পারে নাই।

মানুষ সংসার ত্যাগের বৈরাগ্যের কথা দীর্ঘদিন শুনিয়া আসিয়াছে, সংসার লইয়া বৈরাগ্য এ যে নতুন কথা, মানুষ বুঝিবে কি করিয়া? কিন্তু ইহাই তো ভারতীয় আদর্শ। গোপালতাপনী উপনিষদে লিখিতেছেন, একদিন গোপীগণ দুর্ব্বাসা মুনিকে পারণ করাইবার জন্য ছানা মাখন দুধ দই ইত্যাদি বহু দ্রব্যসম্ভার লইয়া যমুনার কুলে উপনীত হইলেন; যমুনা উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া আপন মনে নাচিয়া চলিয়াছে, ঘাটে নৌকা বা নাবিক কিছুই নাই, তখন ব্রজগোপীগণ বিপদ গণিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরামর্শ চাহিলেন, আমরা কি করিয়া পার হইব? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—যমুনাকে যাইয়া আমার কথা বল শ্রীকৃষ্ণ যদি ব্রহ্মচারী হন হে যমুনে, তবে আমাদিগকে পারে যাইবার পথ করিয়া দাও। ব্রজগোপীগণ সেই কথা বলায় যমুনা পথ করিয়া দিলেন, ব্রজগোপীগণ হাঁটিয়াই যমুনা পার হইয়া গেলেন। দুর্ব্বাসাকে সমস্ত জিনিষ দিবা মাত্রই তিনি সমস্তই আহার করিলেন, ব্রজগোপীগণ তো দেখিয়া অবাক হইলেন। ফিরিবার সময় আবার পার হওয়ার প্রশ্ন আসিল। ব্রজগোপীগণ দুর্ব্বাসাকে বলিলেন—আমরা কি করিয়া যমুনা পার হইব? তিনি বলিলেন—যমুনাকে যাইয়া বল দুর্ব্বাসা যদি কোন দিন কিছুই না খাইয়া থাকেন, যমুনে তবে আমাদিগকে পথ করিয়া দাও। যমুনাকে দুর্ব্বাসার কথা বলায় যমুনা পথ করিয়া দিলেন। এবারেও ব্রজগোপীগণ মহা সমস্যায় পড়িলেন। একদিন ব্রজগোপীগণ রাধারাণীকে সামনে

রাখিয়া দুর্ব্বাসার নিকট যাইয়া প্রশ্ন করিলেন—হে মুনিবর, আমরা এক মহা সমস্যায় পরিয়াছি। আপনি ইহার নিরসন করুন। শ্রীকৃষ্ণই বা কেমন ব্রহ্মচারী, আর আপনিই বা কিরূপ নিরাহারী আমাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিন। তখন দুর্ব্বাসা বলিলেন—"যাহারা কামদ্বারা কাম কামনা করে তাহারা কামী, আর যাহারা অকামদ্বারা কাম কামনা করে তাহারাই অকামী"। শরৎকুমার ছিলেন সেই অকামী দলের লোক, তাঁহার সকল কর্ম্মের মূলে ছিল ভগবৎ সেবাবুদ্ধি। সন্ন্যাস লইয়া শরৎকুমার যেদিন পুরুষোত্তমানন্দ হইলেন সেদিন গান্ধীজী বলিয়াছিলেন—শরৎবাবু লাল কাপড় পরিয়া বেশী কি সন্ন্যাসী হইলেন, আগেই বা কি কম সন্ন্যাসী ছিলেন? সন্ন্যাসের পর বৃন্দাবন হইতে যখন আসিয়াছিলেন, চারণ কবি মুকুন্দদাস বলিয়াছিলেন—তোমার লাল কাপড় আমি খুলিয়া দিব, কোন্ দোষে বৌদিকে ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলে? তিনি বলিয়াছিলেন —আমি তো সন্ন্যাসী হইয়া তোমার বৌদিকে ছাড়ি নাই। সত্যই তাঁহার জীবনে ছাড়ার কিছু ছিল না। সকলকেই পাওয়ার জন্য প্রাণপণ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীনিত্যগোপালের জীবন-আলোকে নূতন যুগের মতন করিয়া নূতন বেদান্ত লিখিয়া তাহার উপর বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তিনি বলিতেন—"একখানি ছবি দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীর একখানি গ্লোব, একজন মানুষ তাহাকে মাথা দিয়া ঠেলিতেছে।

ভাল লাগিয়াছিল। আমারও মনে হইত এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন অচল জগৎটাকে ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়া তাহাকে পুরুষোত্তম অভিমুখীন করিয়া তুলি"। শ্রীনিত্যগোপালের ডাক আসিয়া গেল। চাকুরী আর করা চলে না। ব্রজমোহন স্কুলে দুর্নীতি দেখা দিল, শিক্ষক ও ছাত্রগণ আদর্শ ভ্রষ্ট হইতে চলিল, শিক্ষকদের ভিতর মতান্তর ঘটিল। এই সমস্ত দেখিয়া সমাজ-সেবী শরৎকুমার জগদীশবাবু ও অশ্বিনীবাবুকে জানাইলেন। কিন্তু সে দিক হইতে প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা দেখিলেন না। তখন ব্রজমোহন স্কুল ত্যাগের সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন এবং ইহাও স্থির করিলেন যখন অশ্বিনীবাবু, জগদীশবাবুর অধীনেই কাজ করা সম্ভব হইল না তখন জীবনে আর পরের চাকুরী করিব না। ঊষাঙ্গিণী দেবীকে প্রাণের অবস্থা জানাইয়া বলিলেন—আমি তো আর পারিতেছি না, কি করিব বল? তোমাদের খুব কষ্ট হইবে, বাড়ীর চাউল মাত্র সম্বল, আমি কবে যে তোমাদিগকে কি দিতে পারিব সবই অনিশ্চিতের মধ্যে। সেদিন ঊষাঙ্গিণী দেবী স্বামীর প্রাণের বেদনা বুঝিতে পারিয়া হাসিমুখেই দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন—তোমার যখন কষ্ট হইতেছে তখন কাজ ছাড়িয়া দাও, আমাদের ঠাকুর যাহা করেন তাহাই হইবে। ঊষাঙ্গিণী দেবী কত বড় ত্যাগ স্বীকার সেদিন করিয়াছিলেন! তিনি কোনও দিনই স্বামীর কোন ইচ্ছায় বাধা দেন নাই, এই স্থানে শরৎকুমারের জীবনে তাঁহার দান মহান। ঊষাঙ্গিণী দেবীর

নিকট সরল প্রাণে বিদায় লইয়া জগদীশবাবুদিগকে কিছু না বলিয়া ১৯১৯ এর ৯ই ফেব্রুয়ারী ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কাজ ছাড়িয়া কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন। কলিকাতা পাঁচু খানসামা লেনে গুরু ভ্রাতা নিতাই পালের বাসায় যাইয়া উঠিলেন। বড় ভাই প্রসন্নকুমার ও শ্বশুর কালীপ্রসন্ন বসু শরৎ কুমারের এইরূপ অবিবেচকের মত কার্য্য দেখিয়া বহু উপদেশ ও অভিযোগপূর্ণ পত্র দিতে লাগিলেন। পুরুষোত্তম-পথের যাত্রী শরৎকুমার সকলের সকল অভিযোগ অনুযোগ মাথায় করিয়া সেই অজানার পথে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার বরিশালের বন্ধুগণ ও সহকর্ম্মীগণ বার বার পত্র দিতে লাগিলেন। তিনি যে তাঁহাদের পত্র দিয়াছিলেন এখানে তুলিয়া দিলাম—

কলিকাতা ২৬.২.১৯ সনের চিঠি—ভাই, তোমাদের অপার্থিব স্নেহই যে আমার জীবনটীকে আজ শ্রীভগবানের শ্রীচরণ তলে পৌঁছাইতে চাহিতেছে। তোমরা কত ভালবাস, তাহার ঋণ সমগ্র জীবনেও শোধ দিবার নহে। তোমাদের ভিতর দিয়া তাঁহারই স্নেহাশীষ পাইয়া আজ কাঁদিতে হইতেছে, আমার উপর তাঁহার যে "ভয় কি টেনে তুলব"—এই অভয় বাণী, তাহা তোমাদেরও সম্পত্তি ইহাই আমি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করি। তোমাদের আদরেই আমার আদর; আমি তো কোথাও অনাদরে থাকি না। ঠাকুর আমাকে যাহা দিতেছেন তাহাতে সমগ্র বিশ্বও আদর করিতে পারে এরূপ দেখিতেছি। তাঁহার কৃপায় মূর্খ মহাপণ্ডিত

হইতে পারে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'আমি জানি তোমরা আমারই বিকাশ"। তোমাদিগকে তাঁহারই বিকাশ জানিয়া ভালবাসিতে চাহি। আমি তোমাদের ভাই ইহা দেখিতে পারিলেই কৃতার্থ বোধ করিব। যখন দেখি তোমাদের কাছ হইতে ভাইয়ের স্নেহ পাইতেছি--তখনই আমার প্রাণে বিপুল আনন্দের উদ্ভব হয়। তোমাদিগকে বাদ দিয়া আমি নিজের কোন সুখ-শান্তি প্রেম-ভক্তি আকাঙ্ক্ষা করিব না। তোমাদের ভালবাসায় নিজের জীবন পুষ্ট করিয়া নিমকহারামের মত তোমাদিগ হইতে দূরে সরিয়া আমি ব্রহ্মানন্দকামী নহি। যাহারা আমার দেহমন প্রাণের পুষ্টি বিধানের অণুমাত্রও সহায় হইয়াছেন, তাহাদিগকে ঠাকুর কৃপা না করা পর্য্যন্ত আমি একাকী তাঁহার সঙ্গ লাভ-প্রয়াসী নহি—ইহা আমি সরল প্রাণে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদাই প্রার্থনা করি। আমার যাহা অধ্যাত্ম সম্পদ তাহা কি তোমরা নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করিবে? আমি কি তোমাদের ভাই বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নই? আমার যাহা কিছু সব তোমাদের। যাক্,—

গত কল্য তোমার পত্র পাইলাম। আমি এ যাবৎ মনোহরপুকুরে যাই নাই। কলিকাতার ভক্তবৃন্দ লইয়া তাঁহার আলোচনায় দিন কাটাইতেছি। আমি পাগল হইতে পারি কিন্তু সরল প্রাণে বিশ্বাস করি আমার জীবন সমগ্র বিশ্বের সেবার জন্য আজ ঠাকুর আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; নিজের জীবন ও তৎসঙ্গে স্বপ্নাদি তাহার পোষক।

বর্ত্তমান ধর্ম্ম-বিপ্লবে আমায় বলিবার মতন ঠাকুর কিছু দিয়াছেন বলিয়া আমার আন্তরিক বিশ্বাস। বর্ত্তমান সাধন পন্থায় মানুষ মানুষ হইতেছে না ইহা প্রত্যক্ষ সত্য ; হয় ধর্ম্মই নাই, নচেৎ সাধন পন্থায় নিশ্চয়ই কোন ভুল আছে। ধর্ম্ম ভুল নয় ; সাধন-পন্থাই আজ বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়া মানুষের তেজবীর্য্য হরণ করতঃ ক্লীবত্ব প্রদান করিতেছে। ক্লীবত্বের আবরণ থেকে মানুষকে মুক্ত করিতে হইবে—এ সাধ পাগলামি হইলে আমি কি করিব ? বলিতে পার এ ভুল পোষণ করা কেন ? ভুল সত্য যে হইবে না তাহারও যখন কেহ কোন প্রমাণ দিতে পারিবে না তখন আমার সাধনার জীবনকে লোকের কথায় ভুল বলিলে কি নিজের জীবনকেই প্রকারান্তরে ভুল বলা হয় না ? ঠাকুর যখন আসেন তখন সাংসারিক বিশৃঙ্খলা তাঁহার আগমনের সূচক হয়। আমার বর্ত্তমানের কর্মত্যাগও তদ্রূপ। স্কুলের বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলায় আমি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া থাকিতে পারিতেছিলাম না বলিয়া গোপনে চলিয়া আসিয়াছি। ব্রজ মোহনে শুধু চাকুরীর জন্যই চাকুরি করি নাই। ছেলেদের নৈতিক চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রাখাও জীবনের একটা উদ্দেশ্য ছিল। আজ যখন দেখিলাম তাহা কল্পনামাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন সব স্কুলই তো সমান হইতে চলিল, অথচ অন্যত্র চাকুরী করায় আমার ও ব্রজমোহনের অগৌরব। কি করিব ? আমি বুঝিয়াছি আমাকে আর তো চায় না। আমার প্রাণের কথা তো বুঝাইতে পারি নাই। আমার এ জীবনটা যদি

ব্রজমোহনের সেবায় লাগিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিবার সুযোগ পাইতাম তবে হয়তো দুঃখের সহিত ছাড়িতে হইত না। অশ্লীল কথা, অশ্লীল ব্যবহার হইতে স্কুল ও স্টাফ্‌কে উদ্ধার করিবার জন্য আমি আত্ম নিবেদন করিয়াছি, আমার রক্ত খুব অপবিত্র নয়, মা নিশ্চয়ই তৃপ্তি লাভ করিবেন। সকলেরই কল্যাণ হইবে—এই বিবেচনাতেই আমি চলিয়া আসিয়াছি, তোমাদিগকে ছাড়িবার জন্যই আমি চলিয়া আসি নাই। শরেন্দ্রবাবুর সহিত আমার স্কুল ব্যতীত ব্যক্তিগত কোন ক্ষোভের কারণ নাই। স্কুলের সম্পর্ক ছাড়িলে জগতের হিসাবে তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব বই অন্য কোন সম্পর্কই নাই। স্কুলে থাকিতে দিতে আমার আপত্তি; জগতে থাকিতে আপত্তি করা যে পাগলামী তাহা আমি বেশ জানি। আমার সমগ্র বিশ্বকে ভালবাসিতে হইবে কিন্তু সকলকেই সকল ক্ষেত্রে রাখিয়া নয়; যাহার ক্ষেত্রে তাহাকে রাখিয়া। অধিকার চ্যুতি বা স্বধর্ম্মনাশই একমাত্র পাপ। প্রাণে বড় জ্বালা নিয়া আসিয়াছি: সুস্থ হইলেই আমি আবার কয়েকদিনের মধ্যে আসিব। ঠাকুরের আদিষ্ট আমার বেদান্তের ব্যাখ্যা না লিখা পর্য্যন্ত বরিশাল পরিত্যাগের বাসনা নাই। তোমাদের মধ্যেই তো থাকিব; তবে আর দুঃখ কি? যাহারা আমায় চান তাহাদিগকে জীবনেও পরিত্যাগ করিবার সাধ্য নাই; আমার কর্ত্তার এমন কোন হুকুম নাই। অনাদরে আমি কাহারও নহি।

প্রাণের সব কথাই তো লিখিলাম; যে ব্যবস্থা হয়

তোমরা করিও। আমার প্রাণকে নিয়া ঠাকুরের দিক দিয়া মাপ করিতে চেষ্টা করিলে কিছু বুঝাইতে পারিব। আমি আমার মাপে পর্য্যন্ত চলিতে চাহি না। আশীর্ব্বাদ করিও তাহার মাপে যেন জীবন গঠন করিতে পারি। তোমরা থাকিতে আমার অন্নবস্ত্রের অভাব কি? মনুষ্যত্বের অন্তরায় তো অন্নবস্ত্রের অভাব? নয় কি? আমাকে মানুষ করিয়া দাও, লক্ষ মানুষ তৈরী করিয়া দিব। মেষ তো সিংহ তৈয়ার করিতে পারে না। অন্ত এই পর্য্যন্ত। যাহারা আমায় শ্রদ্ধা স্নেহ করেন তাঁহাদের চরণে জীবনে মরণে আমি ঋণী। সুকুমারবাবুকে ভালবাসা জানাইও; তিনি আমার আলোচনায় কত দিন যোগ দিয়াছেন, এইজন্য আমি ঋণী। বিমলা, খগেন্দ্র অন্যান্য যাহারা আমার জন, তাহাদিগকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ প্রদান করিবে। আমি তাঁহার ইচ্ছায় বেশ আদরে আছি। তোমরাও থাকিবে ইহা আমি অকপটে বিশ্বাস্ করি। বীরেশ্বর কেমন আছে? তাহার সর্ব্বথা কল্যাণ হউক।

তোমাদের শ্রীশরৎকুমার ঘোষ।

নিতাইবাবুর বাসায় আছেন। একদিন হ্যারিসন রোড ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া জনস্রোত দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন, সকলেই কর্ম্মব্যস্ত আমারই শুধু কাজ খসিয়া পড়িয়াছে। অথচ পাঁচটি মানুষ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে তো আমি একটি পয়সাও দিয়া আসি নাই। তখন খুব কষ্ট হইতেছিল। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত

'জয়রাধে' ধ্বনি মুখ দিয়া উচ্চারিত হইয়াছিল।

সেইদিন রাত্রেই গুরুভাই নিতাইবাবুর সহিত জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। নিতাইবাবু বলিলেন—তুমি বেদান্তের নূতন করিয়া ভাষ্য লেখ। তিনি তো শুনিয়া অবাক। বলিলেন, আমি পারিব? যাহা মহা মহা পণ্ডিতেরা লিখিয়া গিয়াছেন, সেই কাজে হস্তক্ষেপ করা কি আমার পক্ষে সম্ভব? নিতাইবাবু বলিলেন, হ্যাঁ তুমি পারিবে। আচ্ছা লিখিব বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। তখন হইল টাকার প্রশ্ন। বেদান্ত যে লিখিব সেই পাঁচটি প্রাণী ও আমাকে দিয়া ৬টি লোক কি খাইবে? নিতাইবাবু বলিলেন—চিত্তরঞ্জন দাস খুব দান করিতেছেন, চল তোমাকে লইয়া সেখানে যাই। শরৎ কুমার বলিলেন, সেখানে আমি যাইব না। তাহার দুই কারণ; প্রথমতঃ তিনি আইন-ব্যবসায়ী, তিনি যখন আমি কি জানি ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য বেদান্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন, তখন তাহার সহিত আমি কি আলোচনা করিব, তিনি কি আমার বেদান্তের আলোচনা বুঝিবেন? দ্বিতীয় কারণ আমি টাকার জন্য তাঁহার নিকট গেলে আমার আপন জন তোমাদের অপমান করা হয়। তোমরা থাকিতে আমি টাকার জন্য তাহার দারস্থ হইয়া তোমাদের অপমান করিব না। তখন নিতাইবাবু বলিলেন—চল তবে গুরুভাইদের সহিত আলোচনা করি। ঠাকুরের এই নূতন দর্শন বিশ্বকে দান করিবার জন্য গুরুভাইরা সম্মত হইলেন। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের পুত্র

গুরুভাই দানীবাবু ২০০৲ টাকা দুর্লভ আঢ্য ১০০৲ টাকা, কালীধন দে ১০০৲ টাকা, নিতাইবাবু ১০০৲ টাকা এবং অন্যান্য গুরু-ভাই মিলিয়া ১০০৲ টাকা মোট ৬০০৲ টাকা উঠিল। টাকা তাঁহাদের নিকটই থাকিল, মাসে মাসে ৫০৲ টাকা করিয়া তাঁহারা বরিশাল পাঠাইতেন। এইভাবে অর্থের মীমাংসা হইয়া গেলে নিতাইবাবু এক রিম কাগজ কিনিয়া দিলেন, তাহা লইয়া শরৎকুমার বরিশালে চলিয়া গেলেন এবং বেদান্তের অবধূত ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সকাল হইতে রাত্রি ১১।১২ পর্য্যন্ত স্নান আহার ছাড়া শরৎকুমারের আর কোন কাজ ছিল না। তিনি তো প্রচলিত পথ ধরিয়া চলেন নাই। সম্পূর্ণ নূতন পথে চলিতে যাইয়া সময় সময় পথ পাইতেন না। প্রচলিত ভাষ্যকারদিগের গ্রন্থে তো কোন আলো পাইতেন না। তখন কলম ফেলিয়া শ্রীনিত্যগোপালের চরণের তলে পড়িয়া থাকিতেন। শরণাগতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শরৎ কুমার! সামনে নূতন আলো জ্বলিয়া উঠিত, পথ পাইতেন, আবার লিখিতে আরম্ভ করিতেন। শ্রীনিত্যগোপাল বলিয়া-ছিলেন—শরৎ, তোমার যখন যাহা প্রয়োজন ভগবান অন্তর্যামী রূপে তোমাকে তাহা বুঝাইয়া দিবেন। সত্যই তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন, নতুবা এই নূতন যুগের নূতন শাস্ত্র স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে তিনি পাইলেন কি করিয়া? তাঁহার বন্ধুবর সূর্য্যকুমার সেন তাঁহাকে ব্রজমোহন লাইব্রেরী হইতে যখন যে বই প্রয়োজন হইয়াছে আনিয়া দিয়া তাঁহার এই মহতী উদ্দেশ্যের সহযোগিতা

করিয়াছেন।

এইভাবে এক বৎসর ধরিয়া বেদান্তের ভাষ্য লিখিয়া সেই ভাষ্য বুকে লইয়া আবার কলিকাতা গুরুভ্রাতাগণের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। দিন নাই রাত্রি নাই প্রাণ ভরিয়া গুরু ভ্রাতাগণের সহিত ঠাকুরের জড়াজড সমন্বয়ের উপর লিখিত নূতন বেদান্তের আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই আলোচনায় যাহারা যোগ দিতেন তাহাদের মধ্যে একজন থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভ্য ছিলেন। শরৎবাবুর আলোচনায় মুগ্ধ হইয়া থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট বলিলেন এবং একদিন শরৎবাবুর বক্তৃতার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু শরৎবাবুর প্রথম বক্তৃতার দিন কার্য্যবশতঃ হীরেন দত্ত সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। যেদিন ১ম বক্তৃতা সেদিন তাঁহার গুরুভাই নিতাইবাবু, রামবাবু, সরোজবাবু প্রভৃতি অনেকেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতার সময় ছিল সাড়ে পাঁচটায়, কিন্তু শরৎবাবুর বুঝিবার ভুল হওয়াতে উপস্থিত হইতে দেরী হইয়া গিয়াছিল। নিতাই বাবু প্রভৃতি শরৎকুমারের আসিতে দেরী দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং দরজায় যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রথম বক্তার বক্তৃতা হইয়া গেল, দ্বিতীয় বক্তা আসিয়া পৌঁছাইল না দেখিয়া বক্তা কোথায় হারাইয়া গেল বলিয়া শ্রোতারা উপহাস করিতে লাগিল, এমন সময় সরোজবাবুর এক পরিত্যক্ত ছেঁড়া এণ্ডির চাদর কাঁধে ফেলিয়া সৌম্য সুন্দর

শরৎকুমার যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নিতাই বাবু এক ধমক দিয়া বলিলেন, হতভাগা এতক্ষণে আসিতেছ। এক মুহূর্ত্ত অবসর না দিয়া নিতাইবাবু হাত ধরিয়া শরৎকুমারকে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড় করাইয়া দিলেন। ক্লান্ত দেহে ভয়ে ঠাকুরকে সামনে রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া শরৎকুমার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, একভাবে আড়াই ঘণ্টা বক্তৃতা করিলেন, সভাস্থ সকলেই মুগ্ধের মত শুনিলেন। সভা হইতে আবেদন আসিল আমরা বক্তার বক্তৃতা আরও শুনিতে চাই। পরের রবিবার আবার বক্তৃতা করিলেন। সেদিন সভাপতি হীরেন দত্ত মহাশয় ছিলেন। সভাপতি হীরেন দত্ত মহাশয় বলিলেন—এতদিন শাস্ত্রের খোসা শুনিয়াছি, আজ সত্যই জীবন্ত বেদান্ত বক্তা আমাদিগকে শুনাইলেন। পরে ক্রমান্বয়ে চৌদ্দ রবিবার থিওসফিক্যাল হলে তাঁহার মনোমুগ্ধকর বেদান্তের নতুন রূপের আলোচনা সবাই শুনিলেন। হীরেন দত্ত টাকা লইতে বলায় তিনি বলিয়াছিলেন কৃষ্ণ-কথা বলিয়া আমি টাকা লইব না, আপনি যদি স্নেহ করিয়া কিছু দিতে ইচ্ছা করেন বরিশাল বাসায় পাঠাইবেন। থিওসফিক্যাল সোসাইটির মেম্বাররা এবং হীরেনবাবু অনেক অনুরোধ করেন মাসিক কিছু লইয়া বক্তা হিসাবে সেখানে থাকিবার জন্য, কিন্তু শরৎকুমার বলিয়াছিলেন, ১৯১৯-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী আমি চাকুরি ছাড়িয়া আসিয়াছি, আর জীবনে পরের চাকুরি আমি করিব না।

গুরুভ্রাতাগণ এবং থিওসফিক্যাল সোসাইটির ও বিবেকা-

নন্দ সমিতির সভ্যবৃন্দ এবং শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ভক্ত দার্শনিকগণ ও সাহিত্যমোদী শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বরিশাল জেলার গুঠিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি বন্ধুবর্গ তাঁহাকে সেই সময় সমগ্র দেশে তাঁহার সেই আলোচনাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহায়তায় বিবেকানন্দ সমিতি, তত্ত্ববিদ্যা সমিতি, জড়পাড়া, ভাটপাড়া, বারাসাত নাথের বাসায়, রামমোহন লাইব্রেরী প্রভৃতি বহু স্থানে তিনি বেদান্তের আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধের মত তাঁহার প্রাণস্পর্শী নূতন বেদান্তের নূতন আলোচনা শুনিয়াছে।

সেই সময় ২২।১।২৭ তারিখে নারিকেলডাঙ্গা হইতে শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নামে এক ভদ্রলোক বরিশাল হিতৈষী পত্রিকায় 'বেদান্তের নূতন মূর্ত্তি' নামে একটি লেখা পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে লিখিয়াছিলেন—

২২।১।২৭ ; ১৯২০ এপ্রিল।

"যে বাংলায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার প্রত্যেক ধূলিকণাকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, সেই বাংলায় অদূর ভবিষ্যতে জানিনা কোন এক মহাপুরুষ আসিতেছেন যাহার সূচনা বাংলার সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান জগত কি ধর্ম্ম,

কি সমাজ, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন সর্ব্বত্র এমন এক জায়গায় আসিয়া অবসন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সে স্থান হইতে আবার আরেক নূতন আলো নূতন শক্তি ব্যতীত তাহারা যেন পথ পাইতেছে না, চলিতে পারিতেছে না। যুগের বুকে যখনই এমন সন্ধিক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয় তখনই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দেন। আবার সে দিন আসিতেছে, তাঁহার অগ্রদূতগণ অলক্ষিতভাবে ধীরে ধীরে বাংলায় আসিয়া সাড়া দিতেছেন, এই মৃত জাতির নিস্পন্দ অন্তরে আবার একটু ক্ষীণ স্পন্দন অনুভূত হইতেছে।

সম্প্রতি কলিকাতা মহানগরীতে আমরা একটি সাধককে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, তাঁহার নাম শরৎকুমার ঘোষ। তাঁহার পবিত্র তেজোদীপ্ত সৌম্য মূর্ত্তি। তিনি ভগবান-দত্ত প্রেরণায় অন্তর বাহিরে ভরপুর হইয়া সুদূর বরিশালের পল্লী বাস হইতে এই মহানগরীতে এক নূতন আলো লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সে আলো বেদান্তের নূতন মূর্ত্তি। বেদান্ত যে একটা দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ নহে, বেদান্ত যে একটা কঠিন, কঠোর, নীরস কর্কশ বিষয় নহে, বেদান্ত যে জন কতক পণ্ডিতের সংকীর্ণ মতে সীমাবদ্ধ নহে, উহা যে মাতৃস্তন্যেরই মত সরল, উহা যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতই স্বচ্ছ, উহা যে নির্ম্মল চন্দ্রালোকের মতই ধনী নির্ধনী, পণ্ডিত মূর্খ, সভ্য অসভ্য সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের সমান উপভোগ্য বিষয়, উহা যে মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে, সংসার বিরাগী করিয়া দূরে

সরাইয়া দেয় না, উহা যে প্রত্যেক পরিবারকে শান্তিময় করিয়া তোলে, অশ্রুজলে ভাষায় না, উহা যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, নিত্য প্রয়োজনীয় কথা—তাহা তিনি বঙ্গীয় তত্ত্ববিদ্যা সমিতি গৃহে ক্রমান্বয়ে ৬৭টি বক্তৃতায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার ভাব ও ভাষা এমন সুনিপুণ, এমনি সুললিত, এমনি গভীর গবেষণাপূর্ণ, উহাতে এমনি একটি উন্মাদক মদিরা আছে যে, শ্রোতৃবর্গ মন্ত্র-মুগ্ধের মত তাহার শেষ বাক্যটা পর্য্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন। তিনি সোজা ঘর-কন্নার কথা লইয়া দেশ পাত্র কালোপযোগী বেদান্তের যে নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তত্ত্ববিদ্যা সমিতি ব্যতীত, গড়পাড়া, ভাটপাড়া বারাসত নাথের বাগান, রামমোহন লাইব্রেরী, বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক নূতন তত্ত্বের সমাবেশ ও এই যুগের উপযোগী করিয়া বাংলা ভাষায় বেদান্তের একখানি নূতন ভাষ্য লিখিয়াছেন। তিনি বাংলার প্রতি ঘরে ৭ কোটি নরনারীর, ভ্রাতাভগিনীর নিকট সর্ব্ব কল্যাণকারী বেদান্তের নূতন তত্ত্ব শুনাইবার সঞ্জীবনী মন্ত্র লইয়া এই বিরাট শ্মশান ক্ষেত্রে আসিয়াছেন। বেদান্তের যে নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে আগের ঋষি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভগবান তাহার সহায় হউন"। ২৩ নং নারকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।

কলিকাতায় তখন ১৯২০ সনের অসহযোগ আন্দোলন

আরম্ভ হইয়াছে, সে দিকে শরৎকুমারের দৃষ্টি নাই, তিনি বেদান্ত প্রচারে তন্ময়। এই ভাবে কয়মাস কলিকাতা থাকার পর বরিশাল ফিরিয়া আসিলেন। বরিশাল আসিয়াও তাঁহার বেদান্তের আলোচনা চলিতে লাগিল। তিনি শত শত শ্রাদ্ধ বাসরে অন্নপ্রাশনে ও বিবাহে কেমন করিয়া ব্রহ্ম দৃষ্টিতে এই সংসারকে, সংসারের প্রতি কর্ম্মকে, প্রতি সম্পর্ককে দেখিতে হইবে, আস্বাদন করিতে হইবে তাহাই মানুষের সামনে আলোচনার ভিতর দিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। আগে ভগবান পরে সংসার অর্থাৎ ভগবানকে সঙ্গে লইয়া সংসার করা। তাঁহার শ্রাদ্ধ বাসরের আলোচনা শুনিয়াছি; তিনি বলিতেন প্রচলিত বর্ণাশ্রমে মৃত্যুতে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, পিতা মাতাকে প্রেত মনে করিয়া শ্রাদ্ধদ্বারা পুত্রকর্ত্তৃক তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা; ইহার মূলে রহিয়াছে "পাপ-কর্ম্মাহম্" মনোবৃত্তি। মানুষ ব্যক্তিগতভাবে জীবন পথে রওনা হইতে গিয়া যে কর্ম্ম করিয়াছে তাহা তাহার পাপ; পাঁচজনের ভাবনা না ভাবিয়া, সকলকে ফাঁকি দিয়া নিজের সুখের জন্য যাহা করা যায় তাহাই পাপ, সেই পাপ কর্ম্মের ফল স্বরূপ পাইয়াছে প্রেতত্ব। তাই তো মানুষের জীবনে মরণের ভীতি এত প্রবল। কিন্তু ঊর্দ্ধমূল ভাগবত সভ্যতা মরণকে গড়িয়া তুলিয়াছে মহা শুচিতায়, মৃত্যুতে তাহার ভয় নাই— "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন"। ভাগবত সভ্যতায় মৃত্যু মানুষকে ক্রমে দিব্য জন্মের পথে, উজ্জ্বলতম লোকে

পুরুষোত্তম দেহ ধারণের পথে লইয়া চলিয়াছে। 'ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য' সে মৃত্যুর ভিতর দিয়া সকল ক্ষেত্র হইতে সকল যোগ্যতা 'যোগ' অর্জ্জন করিয়া বিশ্বরূপ তনু ধারণ করিতেছে। তাহার রওনা যে ঊর্দ্ধমূল পুরুষোত্তম হইতে, পুরুষোত্তম দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া চলিয়াছে উৎকর্ষের পথে। তাহার জন্ম দিব্য জন্ম, তাহার মরণ দিব্য মরণ। সে তখন জন্ম মরণ-ভীতি রহিত।

চতুর্থ অধ্যায়

স্থিতি ও গতির সমন্বয়, জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে যে জীবন গঠিত, সে জীবনের বিরাম কোথায়? ব্রজধামের যাত্রী তিনি, বিরামবিহীন গতি তাঁহার। বরিশাল যাইয়া শরৎকুমার ভাবিলেন, আমি যে বেদান্তের কথা বলি তাঁহারই বাস্তবের ক্ষেত্রে রূপ হইতেছে বর্ত্তমান কংগ্রেসের এই অসহযোগ আন্দোলন। তখন তিনি কংগ্রেসের আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। নিজের সম্বল ছিল ৬০০৲ শত টাকার একটি ইন্সুরেন্স, তাহা কংগ্রেসকে দান করিয়া নিঃস্ব সেবকরূপে তিনি কংগ্রেস সেবায় অগ্রসর হইলেন। ১৯২০ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রথমেই জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বরিশাল রাজা বাহাদুরের হাবলিতে এক বিরাট জনসভা আহ্বান করিয়া তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় এমন এক বক্তৃতা প্রদান করেন যাহা সকলের চিত্তকেই আকর্ষণ করে। তাঁহার বক্তব্য ছিল স্বীয় স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া এই মনুষ্যত্ব হীনতার শিক্ষা লাভ করিয়া কি হইবে? শরৎবাবুর বক্তৃতা ভাল লাগিলেও সাহস করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে আর কয়জন সহজভাবে অগ্রসর হইতে পারে? সেই জন্য তাঁহাকে অনশন আরম্ভ করিতে হইয়াছিল।

শরৎবাবুর অনশনের সংবাদ পাইয়া মহাত্মাগান্ধী উপদেশপূর্ণ এক পত্র পাঠান, তাহাতেই নবম দিনের দিন তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

এইরূপে তিনি বরিশাল জেলার গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া ছেলেদের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। নিজের পুত্রগণকেও বৃটিশের স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনিয়াছিলেন। বরিশাল জেলার রহমতপুরে এক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন শরৎবাবু এমন এক ভাবময়ী জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেদিনের বক্তব্য ছিল মরণের দ্বারাই বাঁচা যায়, যাহারা কেবল বাঁচিতে চায় তারা বাঁচে না। যাহারা বাঁধাধরা পথে চলে তাহারা চাকুরী পাইতে পারে, বড় হইতে পারে না। পৃথিবীতে যাহারা বড় হইয়াছেন তাহারা অন্ধকারেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। বুদ্ধ, মহম্মদ যদি বুদ্ধিমানের মত সমাজ ও অভিভাবকের কথামত চলিতেন তবে তাঁহাদের কে জানিত? সেই সময় মেয়েদের সভাও বহু করিয়াছেন। তাহাদিগকে চরকা কাটা বিলাতী কাপড় বর্জন করা, বিলাসিতা বর্জন করা, স্বামী পুত্রকে বৃটিশের গোলামী করিতে না দেওয়া, ছেলেদের বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হইবার মোহ হইতে ফিরাইয়া আনা ইত্যাদি সম্পর্কেই বক্তৃতা করিয়াছেন, কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গেই বেদান্তের ওতপ্রোত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এইভাবে দুইমাস যাবৎ বাহিরে ঘুরিয়া বরিশাল আসিয়া আবার রাজা-বাহাদুরের হাবলিতে তিন দিন বক্তৃতা করেন, বক্তৃতার বিষয় ছিল বেদান্ত ও সমাজ, বেদান্ত ও রাজনীতি, বেদান্ত ও ধর্ম্ম। বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা মাঠে সহস্র সহস্র শ্রোতা মাটির আসনে বসিয়া শরৎবাবুর সেই অমৃতময়ী ভাষণ শুনিয়াছে, এবং জনসাধারণ তাহার সেই যুক্তিপূর্ণ সুললিত অথচ তেজস্বিতাপূর্ণ ভাষায় মুগ্ধ হইয়াছেন। তিনি ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র মন্থন করিয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সহিত মিলাইয়া চোখের জলে যে অপূর্ব্ব ভাষণ দিয়াছেন, মানুষের চিত্ত সহজেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছে। কখন বরিশাল, কখন বাহিরে তাঁহার বক্তৃতার বিরাম ছিল না। কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শিলচর, করীমগঞ্জ, নবীনগর, সরাইল, আখাউরা, শ্রীহট্ট, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে সহযোগিতা বর্জ্জন, স্বরাজ ও স্বদেশী ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছেন। বরিশাল আসিয়াও বিশ্রাম ছিল না; প্রতিদিন সভায় নানা বিষয়ের আলোচনা চলিয়াছে, বহুমুখীন প্রতিভা, অনলস কর্ম্মক্ষমতা ছিল; কখন শঙ্কর মঠে উপনিষদ্ ব্যাখ্যা আবার বারবণিতাদের পাড়ায় যাইয়া ভাগবত পাঠ, তাহাদিগকে দিয়া চরকায় সূতা কাটানো, খদ্দর পরানো ইত্যাদি দুরূহ কাজ তিনি শ্রীনিত্যগোপাল দেবের প্রসাদে করিয়াছেন।

সেই সময় বরিশালে বিলাতী কাপড় বয়কটের জন্য ১৮ দিন অনশন করিয়াছেন। তাঁহার অনশনে দেশবাসী

চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। বরিশালের জন সাধারণ ঘোষণা করিয়াছিলেন, যদি শরৎকুমারের জীবনের কোন হানি হয় আমরা মহাজনদের ঘরের চাল আর একখানিও বরিশালে থাকিতে দিব না। কাপড়ের ব্যবসায়ী মহাজন সমিতির লোকেরা আসিয়া বিলাতী কাপড়ের ব্যবসা বন্ধ করিবার স্বীকৃতি দান করিয়া তবে শরৎকুমারের অনশন ভঙ্গ করাইয়াছিলেন। তিনি এমন করিয়াই সেদিন বৃটিশের শোষণের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন।

১৩২৮ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ পিরোজপুরের জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের উপর পুলিশের নির্য্যাতন হইলে, সেই উপলক্ষে সেখানে ৭ দিন হরতাল হয়। শরৎবাবু সেই সংবাদ পাইয়া সেখানে যাইয়া এক সভা করিয়া দৃপ্ত ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার ফলে সেখানকার যে সমস্ত ছাত্র জামিনে মুক্ত হইয়া বাহিরে ছিল তাহাদের জননীগণ সঙ্কল্প করিলেন, জামিন রদ করিয়া ছেলেদিগকে হাজতে পাঠানই উচিৎ হইবে, নতুবা আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইবে এবং জাতীয় মর্য্যাদাও নষ্ট হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া জননীগণ তাহাদের ত্রয়োদশটি ছেলেকে ফুলের মালা চন্দনে সজ্জিত করিয়া বন্দেমাতরম্ ও উলুধ্বনি সহকারে আদালত প্রাঙ্গণে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ছেলেরা প্রসন্ন মুখে হাজতে প্রবেশ করিল। এইরূপে বরিশালের বাইরে ১৪ দিন থাকার পর শরৎবাবু বরিশাল আসিলেন। আসিয়াই এক সভা করিয়া জন

সাধারণকে আহ্বান করিয়া বলেন—আমি বরিশালে ১৪ দিন অনুপস্থিত ছিলাম, ইহার ভিতর অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। বাংলার নেতা অশ্বিনীকুমার এই বৃদ্ধ বয়সে আপনাদিগকে বার বার আহ্বান করিয়াও সাড়া পাইতেছেন না। চাঁদপুরে ভীষণ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, অসহায় সুপ্ত কুলীদের নরনারী বালক বালিকাদের উপর অত্যাচার হইয়াছে এবং ইহার প্রতিবাদে সর্ব্বত্র হরতাল চলিতেছে। বরিশাল কেন নীরব থাকিবে? আগামী পরশু দিবস হইতে বরিশালে ৭ দিন হরতাল হউক। উকিল, মোক্তার, মুহুরী, হাট বাজার, দোকান, স্টীমার, অফিস, ডকের কর্মচারী, কুলী মজুর, মেথর সবাই কাজ বন্ধ করুন। সভাস্থ লোক একবাক্যে সপ্তাহব্যাপী হরতাল সমর্থন করিলেন। হরতাল প্রচারিত হইলেও একদল মহাজন দোকান বন্ধ না করার জন্য রাত্রে এক গোপন আলোচনা সভার আয়োজন করিল। এই সংবাদ শরৎকুমার জানিতে পারিয়া যখন সভা আরম্ভ হইয়াছে সেই সময় সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন আপনারা সকলেই মহাপ্রভুর ভক্ত, জীবে প্রেম হইতেছে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম, সেই জীবের উপরের অমানুষী অত্যাচার আপনারা কোনও প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে সহ্য করিবেন? চাঁদপুরের অসহায় সেই নরনারী কি মহাপ্রভুর জন নয়? আপনাদেরই জন নয়? তাহাদের রক্তপাতে কি আপনাদেরই রক্তপাত হয় নাই? প্রতিবাদ না করিয়া থাকিলে যে মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্মের সাধক আপনাদের

ব্যর্থতারই প্রমাণ হইবে ইত্যাদি বহু কথা বলার পর তাঁহারা দোকান বন্ধের স্বীকৃতি দিলেন। শরৎবাবুর উপস্থিত বুদ্ধি কার্য্যক্ষেত্রে শ্রীনিত্যগোপাল সর্ব্বদাই যোগাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন শ্রীনিত্যগোপাল সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন বলিয়াই কোন ভয় আমার ছিল না, সকল ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছি। তিনি রক্ষা করিয়াছেন।

শরৎবাবুর উন্মাদনাময়ী তীব্র ভাষণ চলিতে থাকিল, সে কি গণজাগরণ, অভূতপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব হরতাল! একদিকে সরকার পক্ষ জোর প্রচার চালাইতে লাগিল হরতাল কিছুতেই হইতে দিবে না, অন্যদিকে গণশক্তি শরৎবাবুর পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ—হরতাল করিবেই। আমলাতন্ত্রের সহিত গণশক্তির নিরস্ত্র সংগ্রাম। সরকার বহু চেস্টা করিলেন কিন্তু হরতাল রোধ করিতে পারিলেন না। উকীল মোক্তার কেরাণীদ্বারা ক্রেতা ও বিক্রেতা সাজাইয়া হরতাল পণ্ড করার চেষ্টাও তাহাদের ব্যর্থ হইল। সব চাইতে অদ্ভুৎ ব্যাপার হইল স্টীমার চলাচল বন্ধ হওয়ায়। সমস্ত কুলী ও খালাসীরা ধর্ম্মঘট করিল, পুলিশ বহু চেষ্টাতেও তাহা রোধ করিতে পারিল না। দেশময় হুলুস্থুল—বরিশালের স্টীমার বন্ধ। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে বিরাট অতিথিশালা খোলা হইয়াছিল কুলী ও খালাসীদের জন্য। সরকার বহু ভয় দেখাইল, প্রলোভনও দেখাইল কিন্তু তাহাদিগকে লইতে পারিল না। সেই সময়ে শরৎবাবুর এক ভাষণের কিছু এখানে বরিশাল হিতৈষী পত্রিকা হইতে তুলিয়া দিলাম।

"সপ্তাহকাল হরতাল সুরক্ষিত হওয়ার পর পুলিশ সাহেব দাবোগা কনেস্টবল খালাসীদের নিয়ে যেতে এসেছিল। বি, এম স্কুলে ঢুকতে চাইলে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক বললে এ অশ্বিনী কুমাবের জায়গা, ঢুকবার হুকুম নাই। তখন ৭ জন খালাসীকে ডেকে তাদেব যাওয়ার মত জিজ্ঞাসা করে বললেম, তোমবা যাবে? উত্তব না। আমি বলিলাম মাইনে নিতে? তাহাব উত্তব দিল, দিয়ে গেলে নিতে পারি।

আমবা যাহাদিগকে অশিক্ষিত বর্ব্বর বলে ঘৃণা করি তাদের অন্তবে কত বল। আমরা জিজ্ঞাসা করি সরকারের সেখানে যাওযার কোন অধিকাব আছে কি? জজ. ম্যাজিষ্ট্রে ধায় কাঁঠালওযালাব পিছু পিছু তাও পাবে না ফিরাতে এদের অদৃষ্টে কি এত ছিল! এমনি করে লোকের ভয় ভেঙে দিলে, বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেল সাত শত লোকেব। স্টীমার ছাড়লে যাবে কোথায়? চট্টগ্রাম? সেখানে যে জুজু—পলাইতে পথ নাই যম আছে পাছে। ভয়ে মৃত্যু, নির্ভীকতায় মুক্তি ১৫০ বৎসর ভয়ে অধীন করে রেখেছে, এখন কুলীও তাহা বুঝেছে, ভয়ও ভেঙ্গেছে। ডেপুটি দুধওয়ালার গলায় হাত দিতেছেন। তাহাদের দুধ খেয়ে পুষ্ট হয়েছ, তাহাদের লাঙ্গলের আগায় তোমার সম্মান সম্পত্তি। তাদেরে আগে সম্মান দেখাও, যদি পেতে চাও তোমার সম্মান সম্পত্তি নতুবা রক্ষা নাই। লোক মরে ভয়ে—অন্ধকার রাত্রে চলতে যখন ভয় আসে তখন গান ধরে আমি কি দুঃখেরে ডড়াই,

অর্থাৎ ডড়ায় বলেই গান ধরে তা স্বীকার করে না। একটি গল্প আছে—এক যাত্রী চলেছে বোগদাদ, পথে দেখা হ'ল প্লেগের সঙ্গে। যাত্রী জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছ? কে তুমি? প্লেগ বল্লে, বোগদাদে, পাঁচ হাজার লোক মারতে, আমি প্লেগ। কিন্তু সেবার মরল পঞ্চাশ হাজার। ফেরার পথে আবার দুজনে দেখা। লোকটা বললে তুমি মিথ্যে বলেছ, ৫ হাজারের জায়গায় ৫০ হাজার নিলে কেন? প্লেগ উত্তর দিল, আমি ৫ হাজারই নিয়েছি, আর সব ভয়ে মরেছে। আমাদেরও ঐ ভয়ে যত মরণ। বুরোক্রেশী জুজুর ভয়ে আমরা মরতে বসেছিলাম, কিন্তু ভয় ভেঙ্গেছে, বুঝেছি তোমাদের কদর। ঐ যে ফু—ঐ যে নঙ্গর তোলার ভয় তাহাতেই আমরা মরতে বসেছিলাম, কিন্তু গণদেবতা আমাদের পেছনে, তাহারই ইচ্ছায় আমরা প্রাণ পেয়েছি।

সাবধান বরিশাল! সমগ্র বঙ্গদেশের গৌরব, জেগে ওঠ, এখানে এক সহস্র লোক যে তেজ দেখাচ্ছে যদি ইহারা দুর্ব্বলতা না আসতে দেয় তবেই দেশকে গৌরবান্বিত করে তুলতে পারবে। একখানা জাহাজও চালাইবার ক্ষমতা থাকিবেনা। এই সুদীর্ঘ ১৫০ বৎসর রাজত্ব করে যদি এক খানি দুখানি স্টিমারও চালাতে না পারে তবে যে তাহাদের সকলই বৃথা গেল, বড়ই লজ্জার কথা—আহা তাহাদের কি যাতনা! এ যে যম যাতনার চাইতেও তীব্র। তাদের এ অবস্থা দর্শনে সত্যই একটু দয়াও যেন আসে। প্রকৃতই

ভগবানের বাণী আপনাদের কর্ণগোচর হয়েছে, তিনি আপনাদের পেছনে পাঠিয়েন নূরল হককে, তিনি ইচ্ছা করে আসেন নাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সারথী ছিলেন ভগবান। তেমনি আজ এই মহাযুদ্ধে খোদাতাল্লা সারথী। ভয় এসেছিল চলে গেছে, এ যে তাঁহারি দান। ভগবান আজ আমাদের এই নিরাশার মধ্যে নুরল হককে পাঠিয়ে আমাদের হৃদয়ে বল দিলেন। তিনিই সব। ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং। হৃদয় দুর্ব্বল বলে মনে একটু ভয় এসেছিল, ভয় মোচনও তাঁর দান; তাই ভগবানের দূত এসে ভয় দূর করে দিলেন। ওগো বুরোক্রেসী, এতেও তোমার লজ্জা হয় না? আমাদের হাতে ব্রহ্মাস্ত্র রয়েছে, তাহা যে ব্যবহার করিনি, সাবধান! ভগবান আমাদের পেছনে আছেন।

দেবতা! আমরা অজ্ঞ, তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে পথ দেখিয়ে চালাও, এ আন্দোলন তোমারই, আমরা নিমিত্ত মাত্র; সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর ন্যায় কাজ করাও, জানি এ তোমার কাজ; আমাদিগকে সাফল্যের দিকে নিয়ে চল, তুমিই জীবন তরীর একমাত্র কর্ণধার। ওগো স্বরাজ্যের মুক্তি দেবতা, সোনার মুকুট পরে বিরাজমান হও। ভারতের প্রাণ একত্রীভূত করে তোমার প্রেম-বন্ধনে এক করে দাও। ধন্য তুমি—ধন্য তুমি! ধন্য তুমি!! তৎপর তিনি খালাসীগণের বাস স্থান ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে গমন করেন। তথায় চট্টগ্রামের ভাষায় এক তেজপূর্ণ বক্তৃতাদ্বারা মধ্যাহ্নে পুলিশগণের ভীতি

প্রদর্শনে বা ওসমানের প্রলোভনে সত্য ব্রত ভঙ্গ করে নাই বলিয়া উহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সভা ভঙ্গ করেন।”

প্রতি দিনই শরৎকুমারের তেজস্বিতাপূর্ণ ভাষণ চলিতে লাগিল।

শরৎবাবু এক বক্তৃতা কালে বলেন—“পাঠশালার গুরু-মহাশয় ছাত্রদিগকে বটতলার ছাপা বই পড়াইতেছেন, “কপাল ভাসিয়া গেল নয়নের জলে”। এক দুষ্টু বালক জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, কপাল নয়নের জলে ভাসিয়া গেল কি প্রকারে ? গুরু মহাশয় ফাঁপরে পড়িলেন, কতক্ষণ পর বলিলেন—‘ওরে একটা লাইন বাদ পড়িয়া গিয়াছে—সে লাইন এই, “দুই ঠ্যাং ঝুলাইয়া দিল তেঁতুলের ডালে”। আমাদের রাজপুরুষেরও সেই ব্যবস্থা। কপোল স্থলে ছাপার ভুলে কপাল হইয়াছিল। গুরুমহাশয়ের সে দিকে দৃষ্টিই নাই। একারের ভুল না সারিয়া এক ছত্র যোগ করিয়া দিতে গেলেন। রাজপুরুষগণও চাঁদ পুরের কুলীদের বাড়ী পাঠানের ব্যবস্থা করিতে পারেন না, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ১৯শে জুন বরিশাল আসিবেন, এ তারের খবর মীরকাদি হইতে বরিশাল আসিয়া বিলি হইতে পারিল, কিন্তু ঐ সংবাদই পটুয়াখালী প্রভৃতি মহকুমায় এমন কি নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে পাঠানও আপত্তিজনক বিধায় প্রেরণ করিতে পারিল না।

সরকারী আমলা হাকিমআদি কর্ম্মচারীগণকে মফঃস্বলে

পাঠাইয়া নন-কোপারেশনের বিরুদ্ধে, যাহাতে নন-কোপারেশন বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা তীব্র ভাবে সভা করিয়া করিতেছেন; সবাই স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেই হাটবাজার মিলাইবার অবসরে চল্লিশ হাজার টাকার কোর্ট ফি ও ট্যাম্প তহবিল হইতে খসিয়া পড়িল, এরপরও সব কর্ম্মচারী মফঃস্বলে বাহির হইয়া অফিসের কার্য্য স্থগিত রাখিয়া রাজনীতি করিতে যাইবেন। উত্তম! কিন্তু কেরাণীগিরী করিয়া ও রায় লিখিয়া যাদের জীবন গঠিত হইয়াছে, তাদের প্রচারে ভগবানের কৃপায় আমাদের ভাল বই মন্দ হইবে না। আরও সঙ্গে আছেন রায়—খান জমিদার বাহাদুর, তাদের প্রচার কার্য্যের সফলতা সেদিনের সভায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আর সর্ব্বত্রও হইবে, প্রচার চাই! মূলকথা ঐ লাইন 'দুই ঠ্যাং ঝুলাইয়া দিছে তেঁতুলের ডালে'। বেশ ভাল কথা, সব বাবুরা মফঃস্বলে যাও, প্রচার কর, কিন্তু দেখিও সশস্ত্র প্রহরী থাকা সত্ত্বেও যেন তেরজুরিটি খালি হইয়া না পড়ে। সরকারী চাকুরী করিতে গিয়া বাজারে দোকানদার সাজাইয়াছে, মাছ, দুধ, ডাটা বিক্রী করাইয়াছে, এখন আবার দেশদ্রোহিতা প্রচার জন্য মফঃস্বলে যেতে হবে, ইহাও নাকি সরকারী চাকুরীর অঙ্গ। ১০৲ টাকা বেতনের স্টিমার খালাসী আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানে ধর্ম্মঘট করিতে পারিল, কিন্তু সব শিক্ষিত ভদ্র-বংশজাত উচ্চ বেতনভোগী বাবুদের এই দশা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ওদের ঐ প্রকার কার্য্য ভগবানের কৃপায় আমাদের আন্দোলনের সহায়তা করিবে।

আর একদিন বলিয়াছিলাম সেই গল্প—আগ দোহার গান করিতে করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, তখন পাছ দোহারের লোক দিগকে গানের ছলে জিজ্ঞাসা করে লঙ্কা ডিঙ্গাইল বেটা তার নাম কি? উত্তর দিল পাছ দোহার, দশ আনা ছয় আনা ভাগ আমরা জানি কি? তখন বিপদে পড়িয়া আগ দোহার বলিল আজ হতে ভাগ হ'ল সমান সমান। উত্তর হইল লঙ্কা ডিঙ্গাইল বেটা বীর হনুমান। আজ সমানে আসিতেছ, কিন্তু সেই একার দিবে না, অথচ দুই ঠ্যাং ঝুলাইয়া দিবে তেঁতুলের ডালে। কিন্তু সাবধান আমরা নন্ ভায়লেন্স রক্ষা করিতেছি, তোমরা ভায়লেন্স আনিও না। তোমাদের প্রচার সেক্ষপিয়র মদ খেতেন, সুতরাং মদ খাওয়া উচিৎ। এই কো-অপারেশন প্রচার করিও না। তোমাদের প্রচারে নন-কো-অপারেশন মরিবে না ঠিক জানি, নন-কোঅপারেশনের বিরুদ্ধবাদ প্রচার তোমাদের কার্য্য নয়। নন-কোপারেশন ত্যাগের আন্দোলন, ভোগের নয়। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ত্যাগী যাহার স্রষ্টা, যাহার ত্যাগে এই আন্দোলন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হাকিম কেরাণী ও বাহাদুরদের বক্তৃতায় ভাসিয়া যাইবে না। কেরাণী আবার করিবে বিরুদ্ধ আন্দোলন? ঐ চেয়ে দেখ দেশবন্ধুর দিকে, ৪০ হাজার টাকার মাসিক আয়ের ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া যিনি সাধারণ নৌকায় সস্ত্রীক মেঘনা নদীর তুফানে ঝাঁপ দিয়াছেন, যিনি সাধারণ পাটনির কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিমান বোধ করেন নাই,

সেই ত্যাগীর সমক্ষে দাঁড়ায়ে তুমি কেরাণী? ধৃষ্টতা! আজ চিত্তরঞ্জনের প্রাণ যদি পদ্মার জলে ডুব যেত তবে দুঃখ রাখার স্থান থাকিত না। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা আমাদের কর্ত্তব্য। তোমরা আমাদের আন্দোলন নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছ, আমাদের তাতে রাগ করা উচিত নয়, আমাদের মূলমন্ত্র "নন-ভায়লেন্স"। তোমাদিগকে বিদ্বেষ করি না, তোমরা কৃপার পাত্র, তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাই কংগ্রেস কমিটি ঘোষণা করুন যেন ওদের সভায় কেহ না যায়, ওরা কোনরূপ বিপদগ্রস্ত না হয় তৎপ্রতি সর্ব্বদা নজর রাখা প্রয়োজন। সরকারী কর্ম্মচারী আমাদের কর্ম্মচারী, আমাদের কর্ম্মচারী আমলা, হাকিম, পেস্কার; প্রচারের জন্য মফঃস্বলে বাহির হইবে উহাদের কাজ করিবে কে? আমাদের মাহিনা খাইয়া আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে যাইবে, বিরুদ্ধবাদ প্রচার করিতে যাইয়া স্বপক্ষের সহায়তা করিয়া বসিবে, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন প্রচারক হইতে আমাদের ভয় নাই। আবার স্কুল কলেজ খুলিবার সময় হইল, জেলা স্কুলের মাষ্টার মহাশয়ের অবস্থাও ঐরূপ, অসত্যতায় প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষা হইতে পারে না। আশু মুখার্জী মহাশয় নাকি বলেছেন —কোন স্কুলে একটি মাত্র ছাত্র থাকিতেও স্কুলের এফিলিয়েশন উঠাইয়া লওয়া হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলগুলিতে আর কেহ যাহাতে ছেলে না পাঠান তৎপ্রতি বিশেষ নজর বা মনোযোগ রাখিবেন। আর কলেজ, ঐ সাত শত ধর্ম্মঘটকারী

স্টিমার ক্লার্ক, কুলী ও খালাসী পদদলিত করিয়া কোন্ প্রাণে পশ্চিম মুখো পা দিবে? চাঁদপুরের অবস্থা স্মরণ করিয়া উহারা কর্ম্মত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তোমরা ঐ কলেজে ছেলে পাঠাবে! সাবধান, সাবধান, ভাই ফজলুল বলিয়াছেন দুর্ব্বল বলিয়া আমরা নন ভায়লেন্স গ্রহণ করি নাই। যাদের নয় মাসের খাদ্য আমাদের হাতে, ওদের সঙ্গে আবার ভায়লেন্স কি? সে কথাও সত্য। তবে গান্ধীজীর মত তাও নয়। আমাদের আন্দোলনের মুল প্রেম ভালবাসাদ্বারা জগৎকে জয় করিতে হইবে। শুধু ইংরেজ নয় সমস্ত জগৎ যে মায়া মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, ঐ মায়া কাটিয়া প্রেম-চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে। বুরোক্রেশী বড়ই সংকীর্ণ! ছি ছি! আজ টেলিগ্রামটি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে ভয়! দেশবন্ধু ১৯শে জুন বরিশালে আসিতেছেন খবর দিন, এই তারের ৭টি নকল ৭জাগায় পাঠান হইয়াছিল, তাহা দিতে পারে না। ফেরৎ দেওয়া হইল, ইহাতে নাকি রাজদ্রোহ অশান্তির কারণ আছে। ওদের সহিত আবার ভায়লেন্স কি"!

এইভাবে শরৎবাবু দিনের পর দিন সভা করিতে থাকেন। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে স্টীমারের খালাসীদের জন্য বিরাট ধর্ম্মশালাও চলিতে থাকে।

২৯শে আষাঢ় ১৩২৮ শরৎবাবুর একটি বক্তৃতা এখানে তুলিয়া দিতেছি। শশী সেন সেরেস্তাদারের প্রতি অবিচারে রাজা বাহাদুরের হাবলিতে বিরাট সভা হয়, শরৎবাবু বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, সরকার পক্ষের কার্য্য প্রসঙ্গে বলেন উহার

ফল ভাল হইবে কিনা জানিনা তবে আমাদের কার্য্য যে দিনের পর দিন অগ্রসর হচ্ছে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই, আমরা চেয়েছিলাম কোর্ট কাছারী শূন্য করতে, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট বিরুদ্ধ আন্দোলন করে অফিসাদি শূন্য করার ব্যবস্থা করেছেন। বাইসারির স্কুল বন্ধ করতে চায় জনসাধারণ, ওরা ১৪৪ ধারা জারী করে কার্য্যে সহায়তাই করেছেন।

এক গ্রামে এক সওদাগর জঙ্গলের নদীর ধারে নৌকা লাগালেন, সেখানে গ্রামবাসীর গৃহ-দেবতাদের সভা হচ্ছিল, প্রতিদিনই হয়। গামের দধিমুখ ঠাকুর সভায় আসতে দেরী কল্লেন, দেবতারা সব দেরীর কারণ জিজ্ঞাসা করলে দধিমুখ ঠাকুর বল্লেন আমি যে বাড়ীতে থাকি সে দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ভিক্ষায় বিলম্ব হওয়ায় আমাকে ভোগ দিতে বিলম্ব হইল, সে মহাভক্ত তাই ফেলে তো আর আসতে পারি না। এমন ভক্তকে কিছু টাকা দাওনা কেন সবাই বল্লে। দধিমুখ বল্লেন হাঁ কাল তাকে এক লক্ষ টাকা দেবার জোগাড় করেছি। সদাগর একথা শুনলে, ভোরে উঠে ব্রাহ্মণকে যেয়ে বল্লে যে আজ যাহা তোমার উপার্জ্জন হবে তা আমায় দিয়ে দিবে, তোমাকে আমি দশ হাজার টাকা দেব। ব্রাহ্মণী ভাবলে কি যেন একটা ব্যাপার আছে, সে দর কষাকষি করে ৯০ হাজার করল। সদাগর ভাবলে যাক্ দশ হাজার তো আমার থাকবে। রাজবাড়ী গিয়ে লেখাপড়া ঠিক হল, ঐদিন ব্রাহ্মণ শত চেষ্টা করেও কিছুই পেল না, সদাগর বাধ্য হয়ে ৯০ হাজার টাকা গুণে দিয়ে গেল এবং মনের

ঝাল নিবারণের উদ্দেশ্যে আবার সেই বনের ধারে নদীতীরে সন্ধ্যাবেলা যাইয়া বসিয়া রহিল। ঐ দিনও বহু বিলম্বে দধিমুখ ঠাকুর সভায় উপস্থিত হলেন, আজও আর সকল গৃহ-দেবতারা প্রশ্ন করলেন, কি ঠাকুর আজ এত বিলম্ব কেন? দধিমুখ ঠাকুর বল্লেন আজ ভিখারী ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে এত টাকা পেয়ে ভোগের আয়োজন বেশী করায় ভোগ দিতে বিলম্ব হইল তাই কি আর করি বল? সদাগর ভাবলে ও ঠাকুর—তা আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া; আচ্ছা আর দশ হাজার আর তুমি কোথায় খুঁজবে, আমিই ঐ দশ হাজার দিয়ে দিব। দেবতার লীলা কে বোঝে!

আমাদের কাজ সরকার পক্ষ হাসিল করে সকলকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমলা শুধু আমলা নয় তারা স্টীমার কোম্পানির'ও চাকর। আজ সরকার পক্ষই কোম্পানিকে পঞ্চম জর্জের কর্ম্মচারী ধরে দিয়ে ভারতবাসীর নিকট আত্মপরিচয়ের দিক খুলিয়া ধরিলেন। সরকারী কর্ম্মচারীর আত্মসম্মান যে নষ্ট করছ এজন্য সমগ্র বাংলাদেশ আন্দোলিত হবে। সরকার জেনে রাখুন জজ ডেপুটি ওরা সব পাবলিক সারভেণ্ট, ওদের কার্য্য শৈথিল্যের জন্য সাধারণের বিচার যোগ্য।

এবার দেবতা জেগেছেন, তিনি ভিতর থেকে বলে উঠেছেন আর সইতে পারি না। শশীবাবু শেরেস্তাদার "মানুষ", মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তিনি কর্ত্তাদের কাছে নিম্নতম কর্ম্মচারীদের কথা বলিতে গিয়া বিপন্ন হয়েছেন, তার পায়ে

কোটি নমস্কার। যে শশীবাবু এত দিনের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী তার উপদেশ এ ভাবে অবহেলা? আর তোমরা এমন ভাবে ভদ্র-লোকের সম্মান নষ্ট করে স্টীমার ঘাটে পাহারা দেওয়াতে চাও? এমন নীচ কাজ অপ্রতিবাদে পারবে না, পারবে না, দেবতা আছেন। রূপ গোস্বামী ঝড় বৃষ্টির মধ্যে চলছিলেন. শব্দ পেয়ে এক গৃহস্থ বলেছিলেন, এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বেড়িয়েছে সম্ভব কুকুর কি শিয়াল। গৃহস্থের স্ত্রী বল্লে, অসম্ভব এ ঝড়ে শেয়াল কুকুর নামে না, এ নিশ্চয়ই রাজবাড়ীর গোলাম। রূপ একথা শুনে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করলেন। আমাদের সমস্ত কর্ম্মচাবীদের ঈদৃশ জ্ঞান যে দিন আসবে. সেদিন সন্নিকট।

আমি বলি কর্ত্তাপক্ষ এই সব কর্ম্মচারী দিয়ে যে কাজ করাচ্ছেন, তার ফলে ঐ বুরোক্রেটিক গভর্ণমেণ্ট বিপদের পথে অগ্রসর হবেন। বিশ্বাসী, সত্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারী শশীবাবুর কথা শুনলে সরকারের মঙ্গলের সম্ভাবনা ছিল, তিনিই সরকারের বন্ধু আর সব বন্ধু নামে যারা পরিচিত আমি বলি ওরাই শত্রু. এরাই ভুল পথে গভর্ণমেণ্টকে এগিয়ে দিচ্ছেন। পঞ্চম জর্জ, তোমার কানে কি এসব কথা পৌঁছায়? মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রক্ত তোমার ভিতরে আছে, তুমি বুঝবে তোমার কর্ম্মচারী কি গর্হিত আচরণ করছেন।"—বরিশাল হিতৈষী

শরৎকুমার দিনের পর দিন সরকার ও সরকারের কর্ম্ম-চারীদের বিরুদ্ধ আচরণের প্রতিবাদে শত শত সভা গ্রামে গ্রামে যাইয়া করিয়াছেন। শোষণের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁহার এই সিংহ

গর্জন। তিনি কোন অন্যায় ঘটনাকে নীরবে সহ্য করেন নাই, তাহা সরকারই হউন আর নিজের দেশবাসীই হউন, প্রতিবাদ তিনি করিয়াছেন। সেই সময় বাংলার বহু নেতা বরিশাল আসিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাসও সেই সময় বরিশাল আসেন, জনসাধারণ জৌলসের মোহ ছাড়িতে না পারিয়া সরকার পক্ষের নিকট হইতে পাশ লইয়া মহাসমারোহে স্টীমার ঘাট হইতে তাহাকে আনিয়া ছিল, সেই জন্য তেজস্বী অসহযোগী বীর নেতা শরৎকুমার সে দিনের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন না। তাঁহার এই তেজস্বিতায় সে দিন বরিশালবাসী বিস্মিত ও লজ্জিত হইয়াছিল।

রামচন্দ্রপুর, গাভা, বাইশরি, ঝালকাঠি প্রভৃতি স্থানে শরৎবাবু অসহযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় অশ্বিনী দত্তের আশঙ্কাজনক অসুখের সংবাদ পাইয়া বরিশাল আসিলেন। সপ্তাহকাল পূর্ব্ব হইতেই শহরে গুজব রটিল শরৎবাবু গ্রেপ্তার হইবেন। ১৩২৮ সনের ৮ই শ্রাবণ রবিবার ৬ ঘটিকার সময় একজন যুবক উচ্চৈঃস্বরে শহরবাসীকে জানাইয়া দিল শরৎবাবু গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সে কি অভাবনীয় ব্যাপার! সেদিন বরিশালে প্রায় ১৫ হাজার স্ত্রী-পুরুষে আধ ঘণ্টার মধ্যে শরৎবাবুর বাসার চারিদিকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পুলিশ শরৎবাবুর বাসায় পৌঁছিবার পর শরৎবাবু হাতমুখ ধুইয়া কাপড় বদলাইলেন, সকলে অনেক মালা চন্দন দিয়া সাজাইয়া দিলেন। তিনি শ্রীনিত্যগোপালের চিত্রপটের নিকট আধঘণ্টা প্রায়

চক্ষু মুদিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে প্রশান্ত মূর্ত্তিতে স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের নিকট বিদায় লইয়া দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমবেত জনমণ্ডলী বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে বরিশাল কম্পিত করিয়া তুলিল। অশ্রুসিক্ত জনগণের সম্মুখে তিনি এক বক্তৃতা দিলেন।

"আজ বড় আনন্দের দিন, জীবন-সর্বস্ব শ্রীনিত্যগোপালের আদেশে কাজে নামিয়াছিলাম, আজ আবার তিনিই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিশ্রামের জন্য লইয়া যাইতেছেন। কি আনন্দ, দীন দরিদ্র পর পদানত ভারতের কল্যাণের জন্য আজ আমি কিছু দিনের জন্য নিত্যগোপালের সমাধি ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিব" ইত্যাদি বলিয়া দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দান করিয়া তিনি জেল মুখে রওনা হইলেন। অগণিত লোক বন্দেমাতরম্ শরৎকুমার কী জয় ধ্বনিতে শহর মুখরিত করিয়া শরৎকুমারের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। শরৎবাবু যখন জেলের সম্মুখে পৌঁছাইলেন তখন এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। জনমণ্ডলীর স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া শরৎকুমারের পদতলে পড়িয়া তাঁহার সঙ্গে তাহারাও জেলে যাইবে কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। সে অবর্ণনীয় দৃশ্য দেখিয়া পুলিশ দারোগা দূরে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জনসাধারণ সেই সময় বরিশাল-প্রাণ শরৎকুমারের ফটো তুলিলেন। বরিশালের বারবণিতারা পর্য্যন্ত আসিয়া জেলের দরজায় লুটাইয়া পড়িল। বলিল, বাবাকে আমরা জেলে যাইতে দিব না, আমরাও জেলে যাইব। জেল দারোগা হয়রাণ হইয়া

গেল, জেলের দরজা খুলিয়া তাঁহাকে জেলে লইতে পারিল না, সন্ধ্যা হইয়া গেল। তখন শরৎকুমার সকলকে ধীরভাবে বলিলেন —মা, তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও, আমি না আসা পর্যন্ত ঘরে বসিয়া চরকায় সূতা কাটো। সকলকেই ফিরিয়া যাইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালনের নির্দ্দেশ দিলেন এবং বলিলেন আমার ভয় নাই, জেলখানা আমার ঠাকুরের মন্দির, আমি আনন্দেই সেখানে বাস করিব। এই বলিয়া জেলারকে বলিলেন—আপনি গেট খুলুন, আমি যাইতেছি, উহারা আর আসিবে না। তখন জেলার শরৎবাবুকে জেলে যাইবার পোষাক দিলেন। পরণে হাফ্‌প্যাণ্ট গলায় একটা লোহার শিকল মত ঝুলানো তাহার সহিত নম্বর দেওয়া একটা কাঠের চাক্‌তি, সেই বেশে জেলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এইভাবে সন্ধ্যার সময় হরিবোল বন্দেমাতরম্, গান্ধী কী জয়, শরৎকুমার কী জয়ের ভিতর দিয়া শরৎকুমার জেল-বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন”।

শরৎবাবু জেলে যাইবার সময় দেশবাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, পরের দিন সভা করিয়া সেই পত্র পাঠ হয়। এখানে সেই পত্রের যাহা পাইলাম তাহা তুলিয়া দিলাম। ১৯২১

“প্রাণ-প্রতিম সোদর দেশের ভাই সব,

জনরব, সরকার অচিরাৎ আমায় আটক করবে, আমিও দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি। বড় আনন্দ শ্রীনিত্যগোপালের ডাকে বেরিয়েছি, আজ তিনিই আবার

ডেকেছেন। আজ বিজয় যাত্রার সময়ে মনে হচ্ছে তাদের কথা, যারা প্রাণের চাপে মনকে মেরে ফেলেছেন অথচ সত্য কথা বল্লে রুষ্ট হন। তাদের চরণধূলিও আজি আমার সাথের সাথী, তারাও যে আমার জন্মজন্মান্তরের ভাই। আমি ত মুক্তিকামী নই। জগতের শোকতাপ নয়নজল ফেলে আমার সাধের প্রাণ-সর্বস্ব শ্রীনিত্যগোপাল ধনকেও বিসর্জ্জন দিতে পারি। জানি অনন্ত না পাওয়ার মধ্যেই আমার নিত্যগোপাল চির বিরাজিত। জীবনে ক্ষণিকের জন্যও যাদের স্নেহ ভোগ করেছি তারাও ভাগী আমার শ্রীনিত্যগোপাল-দত্ত 'ভয় কি টেনে তুলব'—এই মহাবাণীর! আমার ভয় নেই। যারা আমায় আপনার বলে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভেবেছেন তাদেরও ভয় নেই। আমি নিমকহারাম নই যে জগতের ঋণ রেখে ভগবানকে পাব। কারও ভয় নেই, মাভৈঃ, মাভৈঃ। ঐ যে উজ্জ্বলতম নবীন ভারতবর্ষ সোনার মুকুট মস্তকে ধারণ করে সমগ্র জগতে গাঢ় অধীনতা মুছে ফেলে প্রলয় পয়োধি জল হতে ভেসে উঠেছেন। দেখ এবার সাধক অন্তর্নয়নে। গুরু দেখিয়ে দিয়েছেন—তাই জয় দুর্গা জয় গুরু বলে মরণের কোলে ঝাঁপ দিয়েছি। "মৃত্যুর্যস্য শরীরম্"—মরণই স্বরাজ-নীলমণির শরীর; নীলমণিকে পেতে যাচ্ছি, নীলমণি আমার কাঁটা বনে থাকেন, ফুল বনে নন্! তোমরা আনন্দ কর, ভয় নেই—দুঃখ নেই। কেবল উৎসাহ, নীরস অবসন্নতা মুছে ফেলে বেদান্তের হুঙ্কার দিয়ে ভারতবাসী একবার দাঁড়াও দেখি, স্বরাজ মুহূর্ত্তে লাভ হবে।

আজ মনে হচ্ছে তোমরা কত আমায় ভালবাস! রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কেমন ভাবে উৎকর্ণ হয়ে আমার কথা শুনতে, উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকতে। যতই ভাবি ততই বেদনায় প্রাণ কেঁদে উঠছে। তোমরা আমার, আমি তোমাদের চিরদিনের। অনেক দিন শুনেছ, আজ আবার বলি বেদান্ত বাদ দিয়া স্বরাজ লাভ হবে না। ভগবান আগে, সংসার পরে। বেদান্ত বড় সাধের মোহ-বনিয়াদ ভেঙ্গে দিয়ে নূতন লীলা-জগৎ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ তত্ত্ব যারা বোঝে নাই তারাই construction-এর নামে পুরাতনকে একটু ছেঁটে কেটে দেখতে চান। শিব কিন্তু বর্ত্তমানকে শ্মশানে পরিণত না করে ছাড়ছেন না। নতুন রাজ্য গড়ে তোলবার দুঃসাহস প্রাণের ঠাকুর হৃদয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, পূর্ণ হবেই হবে। দুর্নীতির শিক্ষাকেন্দ্র বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলি বনিয়াদ-শুদ্ধ ভেঙ্গে দিতে হবে, আইন-আদালত চুরমার কর্ত্তে হবে, নচেৎ সত্য সৃষ্টি প্রকট হবে না। সহর ভেঙ্গে পল্লীতে যেতে হবে, যেখানে সহজ ভাবের খেলায় মন-প্রাণ ভরপুর হয়ে আছে, পল্লীতেই বৃন্দাবন, মথুরায় নয়। "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি"। মনে রেখো এই ভগবৎ বাক্য। মথুরায় আছে কুঁজির দল, যারা পরাধীন, পরের জুতা বয়ে সিধে হয়ে হাঁটতে পর্য্যন্ত পারে না। স্বাধীনতার, মানের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন-তত্ত্ব। এই বৃন্দাবন-তত্ত্বে জগৎ গড়তে হবে। বৃন্দাবনে শিখতে হবে মান, পা ছড়ায়ে রাজাকে দিয়ে পা টিপিয়ে নেওয়া। এই মান যদি ভারতবর্ষে থাকত তবে

সে পরপদানত হত না। পুতনার মোহিনী মূর্ত্তি স্কুল কলেজ এই মান ধ্বংসের প্রথম স্তর। এই জায়গায় জাতিকে প্রথম ধাক্কা দিতে হবে। দ্বিতীয় ধাক্কা বিচার বিভাগে, সেই জায়গায় আপনাদের সব শক্তি নিয়োগ করতে হবে। বিধি যখন নিজেই স্বতন্ত্র হবার দুঃসাহস করে, তখনই প্রেমময়ের হাতে তার লাঞ্ছনার একশেষ। বিধির জন্ম যে প্রেমে—ইহাই না বৃন্দাবন-তত্ত্ব। মানের দায়েই আজ strike, steamer strike রক্ষা করতেই হবে। যারা আমায় এক ছিটেও ভালবাসেন তাদের কর্ত্তব্য হবে আমার চলে যাওয়ার পর এই স্কুল কলেজ, আদালত স্টীমারগুলিকে আবার বুক ফুলিয়ে চলতে না দেওয়া। এগুলিকে ধ্বংস করতে না পারলে স্বরাজ পাবে না। আমি চাই শ্মশান। শ্মশান প্রতিষ্ঠিত হলেই মহাশক্তির মোহন মহা সমন্বয় নৃত্যে ভারত আবার জগদ্বন্দ্যা হয়ে চিরবিরাজিত থাকবেন। আমাকে ছাড়িয়ে বহির্মুখী হয়ো না, অন্তরে আমায় পাবে। বাহিরে যাওয়াই যে violence, মনে রেখো—"ঘরে আমার মা আছে রে। ওরে শমন আমায় নিতে পারবি নারে, এ যে তরিণীর তনয় এসেছে খেলায়, ঘরে যাই মা ডাকছে মোরে"। ঘরে যাওয়াই না non-cooperation? ভাঙ্গ আরামপ্রিয়তা, স্থাপন কর জীবনে কেবল দুঃখের প্রতি অনুরাগ। ঝঞ্ঝাটকেই শান্তি বলে জান। একবার মায়ের দিকে তাকাও দেখি? দেখবে মা দুঃখকে ভালবেসেই মা, নচেৎ কি খাটে শুয়েই না কি? মা হওয়া কি মুখের কথা প্রসব করলে হয়না মাতা। বন্দেমাতরম্

বলি কেন জান? ঐ দুঃখ ভোগ করে জীবন লাভ করবার জন্য। অনন্ত খাটুনিকে জীবন বলে আলিঙ্গন করাই স্বরাজ। খাটতে খাটতে মরতে চাও তো স্বরাজ পাবে, আরাম কেদারায় শুয়ে হবে না। মায়ের এত তপস্যাসঞ্জাত বাক্য মায়ের সেবায় যতদূর সম্ভব নিয়োগ করেছি। মাগো, তোমরাই তো আন্দোলনের প্রকৃত গুরু; তাই তো তোমাদের রক্তঘন আমরা রাস্তায় রাস্তায় তোমাদের বন্দনা করে বুকের ছাতি ফাটিয়ে চিৎকার করে বেড়াচ্ছি। এতেও যদি না পাব তবে—"মা মা বলে আর ডাকব না" মন্ত্র জপতে জপতে তোমাদের সঙ্গেও ছেলের দল non-cooperation করবে। সে গাইবে—"মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না"? মায়েরা যে দিন বৎসহারা গাভীর ন্যায় রাস্তায় ছুটে এসে দাঁড়াবেন, সেইদিন দেখব কোন্ অসুরের সাধ্য যে মায়ের কোলের ছেলে ছিনিয়ে নেয়? চণ্ডীর লীলা দেখব বড় সাধ। পিরোজপুরে কিছু দেখেছি, সে দৃশ্য কত মধুর, কত মহান, কত প্রাণ-সঞ্জীবন! মায়েরা যেন আমায় না ভোলেন, আমি যে তাদেরই রক্তমাংসগড়া কোলের ছেলে। মুক্তকেশীর রণোন্মাদিনী মূর্তি নগরে নগরে কবে প্রতিষ্ঠিত হবে? সে সাধ কি পূর্ণ হবে না? সন্তান আমি, যখন ডাক দিয়েছি তখন রাস্তায় ছুটে বেড়িয়ে আসতেই হবে, ঘরে থাকতে দেবো না। মা, সন্তান যে মরণের পারে দাঁড়িয়েছে, এখন কি মিথ্যা লজ্জার ভান করে চুপ করে বসে থাকবার সময় আছে? আয় মা নেমে আয়, সন্তানের ডাকে ঘরে স্থির থাকার সাধ্য মায়ের

নাই। বাজারের মায়েদের নিকট আমি চিরঋণী। তারা যে মায়ের বাম অঙ্গ, নিত্যগোপালের স্নেহ-পাত্রী। তারাও যেন আত্মসম্মান রক্ষা করে চলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাদের কোলে করুন এই প্রার্থনা।

আজ আমার এই পরাধীনতা বিজয়ের দিনে বড় আদরের নিত্যগোপাল বস্তু সকলকে দিয়ে কিছু দিনের জন্য তাঁরই নিরোধ ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করতে চল্লাম। বন্দেমাতরম্ ১৩২৮, ১১ই শ্রাবণ

তোমাদের প্রেম-কাঙ্গাল

শরৎকুমার

এই সভার পর বরিশালের ঘরের মেয়েরা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়া বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের জন্য পিকেটিং আদি এবং সভা সমিতি করিয়া দেশকে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন। এই ঘটনায় একদল লোক প্রচার করিয়াছিল যে, শরৎবাবু জেলে যাইবার পূর্ব্বে দেশকে ধ্বংস করিবার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

শরৎবাবুর জেলে যাওয়ার প্রতিবাদে সাত দিন হরতাল করিবার ঘোষণা দেওয়া হয়। সে হরতাল অদ্ভুত—মেথর বন্ধ, আলো বন্ধ, জলের কল অচল, কাছারী, বাজার, হাট সব নীরব, স্কুল কলেজ সব বন্ধ শরৎবাবুর জেলে যাইবার প্রতিবাদে গ্রামে গ্রামান্তরে মহকুমায় মহকুমায় শোভাযাত্রা, সভা হরতাল অরন্ধন ইত্যাদি চলিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ধর পাকড় পুলিশের

অত্যাচারও চলিতে থাকে। শরৎবাবু নয় দিবস বরিশাল জেলে থাকার পর তাঁহার বিচার হয়। সরকার পক্ষ হইতে তাঁহাকে বলা হয় আপনি ছয় মাস কোন বক্তৃতা দিতে পারিবেন না। প্রিয়দর্শন, প্রশান্ত মূর্ত্তি শরৎকুমার নির্ব্বিকার ভাবে দণ্ডায়মান মোকদ্দমায় আত্মপক্ষ তিনি সমর্থন করিবেন না এবং ইংরাজের ন্যায় শোষক বিচারকের বিচারের প্রতি তাঁহার বিশ্বাসও নাই; দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ তিনি মোকদ্দমায় কোনও জবাব দিলেন না। কারাগৃহে বিচার হইয়া গেল, তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০০৲ শত টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন মাস কারাবাস।

শনিবার ফৌজদারী কাছারী বন্ধ। সকলে নিশ্চিন্ত। সহসা বেলা দুই প্রহরে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি সহরবাসীর প্রাণে আতঙ্ক সৃষ্টি করিল। ঊর্দ্ধশ্বাসে সকলে কারাগারের দিকে ছুটিল, যাইয়া শুনিল শাস্তি হইয়া গিয়াছে। কি শাস্তি হইয়াছে? কেহ বলিতেছে না। ধন্য বৃটিশ সিংহ। শরৎ-কুমারকে কারাগারে বন্দী করিয়া বিচার করিল, এবং তাহা বাহিরে প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না! জনসাধারণ মূক শোভাযাত্রা করিয়া ফিরিয়া আসিল। একদিন রাত্রে জেলার শরৎবাবুকে বলিলেন, আপনাকে অন্যত্র যাইতে হইবে। তখনই জিনিষ পত্র গুছাইয়া গোপনে তাঁহাকে এক দরজা দিয়া বাহির করিয়া রজনীর অন্ধকারে গলির রাস্তা ধরিয়া লইয়া চলিল, বরিশালবাসী কেহই জানিতে পারিল না তাহাদের প্রিয় নেতা

বরিশাল ছাড়িয়া চলিয়া গেল। জেলের পিছনে একটা খাল ছিল সেখানে পার হইতে হয়। একজন পুলিশ নৌকা করিয়া পার করিয়া দিল। নদীতে নৌকা লইয়া পুলিশ ইনস্‌পেক্টর ও দারোগা ছিল, সেই নৌকায় যাইয়া উঠিলেন, কোথায় যাইতেছেন কিছুই জানেন না। দারোগা বলিল, আপনাকে কলিকাতা আলীপুর জেলে লইয়া যাইতেছি, আমাদের অপরাধ লইবেন না। আমরা আপনাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখি। কিন্তু উপায় নাই আমরা গভর্ণমেণ্টের কাজ করি, সেই হেতু বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এই সব করিতে হয়। ছিপ নৌকা কিছুদূর যাইতেই একটি লঞ্চ আসিয়া শরৎবাবুকে লইয়া গেল। বিশ্বপ্রেমে মহাপ্রভু একদিন এমনি করিয়া গোপনে রাত্রিবেলা প্রিয় নবদ্বীপ ছাড়িয়া ভাগীরথী পার হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। শরৎবাবুও সেইরূপ দেশপ্রেমে বৃটিশের শাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া গোপনে রাত্রিবেলা প্রিয় বরিশাল ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। সকালে শরৎবাবু যখন স্টিমারে উঠিবেন তখন একজন মিষ্টিওয়ালা কিছু মিষ্টি ও একজন ফলওয়ালা কিছু ফল আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিল। পয়সা দিতে গেলে লইল না। শরৎবাবু বলিলেন—লও না, এ পয়সা তো সরকারের, আমার তো নয়। উহারা বলিল—আপনাকে ফলমিষ্টি খাওয়াইয়া আমরা পয়সা লইব না। সে পয়সা যাহারই হোক্ না কেন। তাহাদের ভালবাসা দেখিয়া শরৎবাবু কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি অকৃতজ্ঞের মত কাহারও কিছু

কোন দিন গ্রহণ করেন নাই, যে যাহা যতটুকু তাঁহার জন্য করিয়াছে, তিনি শতবার চোখের জলে তাহা স্মরণ করিয়াছেন ও বার বার বলিয়াছেন।

যে পুলিশ শরৎবাবুকে খাল পার করিয়া দিয়াছিল, সে শরৎবাবুকে খুব শ্রদ্ধা করিত; সে সেই রাত্রেই বরিশালে রটাইয়া দিল শরৎবাবুকে লুকাইয়া জেল হইতে লইয়া গিয়াছে। মুহূর্ত্তে সেই সংবাদ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, বরিশালবাসী স্ত্রী পুরুষ সবাই ঘরের বাহির হইয়া গেল। কোথায় তাহাকে লইয়া গিয়াছে তাহা কেহই জানে না; মশাল লইয়া চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল, খোঁজ খোঁজ সাড়া পড়িয়া গেল। নদীতে নৌকা লইয়া সারা রাত্রি শরৎদাদা শরৎদাদা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কোথায় শরৎদাদা? তিনি ততক্ষণ লঞ্চে উঠিয়া বহু দূরে চলিয়া গিয়াছেন। শরৎবাবু এইভাবে জেলে যাওয়ায় দেশবাসী ক্ষিপ্ত হইয়া গেল। সর্ব্বত্র জোড় আন্দোলন চলিতে লাগিল। সেই সময় শরৎকুমারের ফটো ঘরে ঘরে পূজিত হইতে লাগিল। এই ঘটনায় বহু নেতা বরিশাল আসিতে লাগিলেন। মহাত্মা গান্ধীও আলী ভাইকে সঙ্গে লইয়া বরিশালে আসিলেন। কিন্তু হায়, স্বরাজ যজ্ঞের দুই হোতাই অনুপস্থিত। অশ্বিনীকুমার কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় এবং শরৎকুমার দেশের সেবায় স্বেচ্ছায় আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়া কারাবরণ করিয়াছেন। মহাত্মা শরৎকুমারের ভবনে গমন করেন এবং ঊষাঙ্গিনী দেবীকে দেখিয়া শরৎকুমার যে স্বরাজ

সেবায় সানন্দে কারাবরণ করিয়াছেন ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করেন ও ঊষাঙ্গিণী দেবী ও উপাস্থিত মাহিলাদিগকে চরকায় সূতা কাটিতে বলেন।

শরৎকুমার জেলে যাইবার সময় স্বীয় পত্নী ঊষাঙ্গিণী দেবীকে বলিয়া গিয়াছিলেন, কংগ্রেস অফিসে যে সমস্ত ছেলেরা মা বোন ছাড়িয়া দেশের সেবার জন্য আসিয়াছে তুমি তাহা-দিগকে মায়ের মতন খোঁজ খবর লইবে। ঊষাঙ্গিণী দেবী স্বামীর সে আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। জেলে যাইয়া শরৎকুমার ঊষাঙ্গিণী দেবীকে লিখিয়াছিলেন, "তুমি যে দিন বিশ্বের হইবে এবং আমি যে দিন বিশ্বের হইব সেইদিন হইবে তোমার আমাকে পাওয়া এবং আমার তোমাকে সত্যি-কারের পাওয়া; বিশ্বরূপের ক্ষেত্রেই আমরা দুইজন দুইজনকে পাইব নচেৎ পাওয়া হইবে না"। শরৎকুমার স্বরাজ্য ফাণ্ড হইতে এক পয়সাও লন নাই, অথচ স্বরাজ্য ফাণ্ডে তাঁহার সংগৃহীত টাকা ও সোনাই বেশী ছিল। তিনি যে দিন জেলে গেলেন, স্ত্রী পুত্র কন্যার জন্য কিছুই রাখিয়া গিয়াছিলেন না, সে দিন কত দুঃখ কষ্ট দরিদ্রতার ভিতর দিয়াই ঊষাঙ্গিণী দেবী হাসিমুখে, গৌরবের সহিত স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন।

শরৎকুমারের ছয় মাস জেলের মেয়াদ ফুরাইয়া গেল। কথা হইল বরিশাল জেলে লইয়া যাইয়া ছাড়িয়া দিবে, কারণ যাহাকে যেখান হইতে গ্রেপ্তার করে সেই জেল হইতেই

ছাড়িয়া দেওয়ার নিয়ম। কলিকাতা হইতে শরৎকুমারকে বরিশাল লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার এক আত্মীয় যামিনী নামে, তিনি ঐ জেলেই ছিলেন, তিনি গোপনে দারোয়ানকে দিয়া বরিশালে তিন খানা টেলিগ্রাম করেন। একখানা শরৎ বাবুর দাদার নিকট—"ভাই বরিশাল", আর একখানি শরৎ-বাবু এক মহিলাকে মা ডাকিতেন তাহার নিকট "ছেলে বরিশাল", আর একজন শরৎবাবুকে বাবা ডাকিতেন, তাহার নামে "বাবা বরিশাল"। এই তিন টেলিগ্রাম পাইয়া বরিশালবাসী জানিতে পারিল শরৎবাবু শীঘ্রই বরিশাল আসিতেছেন। বরিশাল জেল হইতে যে দিন শরৎবাবু বাহির হইলেন প্রথমেই দুর্গামোহন সেন মহাশয়ের সহিত দেখা। তিনি শরৎবাবুকে দেখিয়া বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বরিশালবাসী শরৎবাবু আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সহর মুখরিত করিয়া তুলিল। বৈকালে প্রায় ৫০ জন বারবণিতা 'আমার নিতাই এল ঘরে, আমার গৌর এল ঘরে', এই কীর্ত্তন করিতে করিতে আধ মন বাতাসা ও চরকায় তাহাদের কাটা সূতায় শরৎবাবুর জন্য একখানি কাপড় ও চাদর এবং ঊষাঙ্গিণী দেবীর জন্য একখানি শাড়ী লইয়া শরৎবাবুর বাড়ীর প্রাঙ্গনে যাইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখিয়া শরৎবাবু কাঁদিতে লাগিলেন। যাহাদিগকে সংসারের সমস্ত লোক ঘৃণার চোখে দেখিয়া থাকে, শরৎবাবু তাহাদের ভিতরেও ব্রহ্মময়ী মায়ের রূপ ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা-

দের নিকট যাইবার এই অধিকার ও যোগ্যতা তাঁহার জীবনে শ্রীনিত্যগোপালের প্রসাদেই লাভ হইয়াছিল। বিশ্বময় স্ত্রীলোক পুরুষের জন্য, পুরুষ স্ত্রীলোকের জন্য উন্মাদ হইয়া ছুটিয়াছে, এই নোংরামির একটা সুস্থ সমাধান সমাজের বুকে স্থাপন করিবার জন্যই শ্রীনিত্যগোপাল শরৎবাবুকে এই সমস্ত নোংরা স্থানের পবিশুদ্ধতা আনিবার জন্য লইয়া গিয়াছেন। মায়েরই একদিক সতী, অন্য দিক অসতী, এই সতী অসতী মিলিয়াই বিশ্বজননী, এই তত্ত্বই শ্রীনিত্যগোপাল-প্রসাদে শরৎবাবুর জীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ছয়মাস পর আসিয়া শরৎকুমাব এক সভা করিয়া বলিলেন, আজ আবার আপনাদের সহিত বেদান্তের আলোচনা করিব। বেদান্ত বাদ দিয়া তিনি রাজনীতি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন আমি রাজনীতি করি না, আমি রাধানীতি করি। সকল প্রকার শোষণের বিরুদ্ধে ছিল তাঁহার অভিযান। শরৎকুমার যে কয়দিন বরিশাল জেলে ছিলেন, বৈষ্ণব মহাজনগণ প্রতিদিন ভোরে জেলখানাব চারদিক ঘুরিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছেন। শরৎবাবু জেল হইতে আসিয়া মদন-মোহনের আখড়ায় বৈষ্ণব মহাজনদের লইয়া ৪ঘণ্টা কাল তুমুল কীর্ত্তন করিয়া ছিলেন। সেই সময় শরৎকুমারের প্রকৃত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আপন-ভোলা 'গৌর' নামে মত্ত, চোখের জলে সকলকে বুকে জড়াইয়া ধরিতেছেন, আর মহাজনের পদাবলীর সহিত নিজের আখর গৌর-তত্ত্ব, বৃন্দাবন-তত্ত্ব এবং তাহার সহিত স্বরাজ, পল্লী

বৃন্দাবনের দৃষ্টান্ত মুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছিল বরিশালবাসী।

ইতিমধ্যে মহাত্মাজীর ৬ বছরের জেল হইয়া গেল। সারা ভারতে তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল। শরৎকুমারের বিশ্রাম নাই. জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে স্বরাজ আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ভোলায় বক্তৃতা দেওয়া কালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিলেন, শরৎবাবু দুই মাসের ভিতর কোথায়ও বক্তৃতা দিতে পারিবেন না, তাঁহার তেজস্বিতাপূর্ণ বক্তৃতায় দেশের শান্তি নষ্ট হইতেছে। শরৎবাবু সেই দিন হইতে ইহার প্রতিবাদে ভোলাতে প্রায়োপবেশন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অনশনে ভোলাতে বিপুল আন্দোলন হইয়াছিল, মহিলাগণ ঘরের বাহির হইয়া সকল ব্যবসায়ী মহাজনদের দোকানে বিলাতী কাপড় বর্জন এবং খদ্দর প্রচলন ইত্যাদি বহু কাজ করিয়াছিলেন। সাত দিন পর ভোলার সমবেত মহিলাগণের অশ্রুপূর্ণ আবেদনে শরৎকুমার অষ্টম দিনে অন্ন গ্রহণ করিলেন। ভোলা হইতে যে দিন শরৎকুমার আসিলেন সে এক বিদায়ের করুণ দৃশ্য, শত শত স্ত্রী-পুরুষ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

শরৎকুমার স্বরাজ ভাণ্ডারের জন্য অনেক টাকা ও গহনা জনসাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণে এক জ্বালা অহঃরহ পীড়া দিতেছিল, তাঁহার ঘরে তাঁহার স্ত্রীর গহনা রহিয়াছে, অথচ তিনি অন্যের গহনা লইতেছেন। তাঁহার উপযুক্ত পত্নী উষাঙ্গিণী দেবী স্বামীর সেই দুঃখ বুঝিতে পারিয়া নিজের জন্য এক কুটি সোনাও না রাখিয়া সমস্ত গহনা

স্বরাজ ফাণ্ডে দান করিতে প্রয়াসী হইলেন। একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে পিতৃদত্ত নিজস্ব সম্পদকে হাসিমুখে এমন করিয়া দান করিয়া রিক্ত হওয়া যে কতবড় অনাসক্ত ও উদার হৃদয়ের পরিচয় তাহা ভাবিলে সত্যই এই মহীয়সী মহিলার চরণ তলে মাথা লুটাইতে ইচ্ছা করে। মহাত্মা গান্ধীর ৪র্থ পুণ্যাহের দিন শরৎকুমার সেই দান করিবার মনস্থ করিলেন। ঐ দিন সকাল-বেলা কয়েকজন বিশিষ্ট স্ত্রী-পুরুষকে আহ্বান করিয়া তাঁহার বাসভবনে আনিলেন এবং শ্রীনিত্যগোপালের চিত্রপটের সামনে সকলে উপবিষ্ট হইলেন, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রসন্ন কুমার একটি গান করিলেন। শরৎকুমার অশ্রুবিগলিত হইয়া "বাহিরের এই ভিক্ষা ভরা থালি, এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি, তোমার দানে প্রভু তোমার দানে" এই গানটি করার পর এক প্রাণস্পর্শী ভাষণ প্রদান করিয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির হাতে গহনাগুলি সমর্পণ করিলেন। প্রসন্নবাবুর স্ত্রীর এক জোড়া অনন্ত ও ঊষাঙ্গিণী দেবীর সমস্ত গহনা দিয়াছিলেন। সে দিনের বাজারে প্রায় ১০০০৲ হাজার টাকার উপরে গহনাগুলির মূল্য হইবে। বড় লোকের দান আর রিক্ত হইয়া শরৎকুমারের দানের মূল্য অনেক পৃথক। সেই সময় বরিশালবাসী শরৎবাবুকে দধীচি আখ্যা প্রদান করিয়াছিল।

শরৎকুমারের হৃদয় ছিল করুণ কোমলতায় ভরা অথচ কর্ত্তব্যে দৃঢ়। ১৯২৬ সনের মান্দালয় জেলে রাজবন্দীদের উপর যে সরকারের অত্যাচার হইয়াছিল, তাহাতে বেদনাতুর হইয়া

শরৎকুমার তাহার প্রতিবাদে ১৮ দিন অনশন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে যে কত না খাওয়া আর দেশের জন্য কত ত্যাগ ভাবিলে অবাক হইতে হয়। দেশ-মাতৃকার পরাধীনতা মোচনের জন্য বরিশালে তো আন্দোলনের ঝড় তুলিয়াছিলেন, তা বাদে কলিকাতা, বর্ধমান, মেদিনীপুর, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় স্বরাজ লাভ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের জন্য প্রচার করিতে লাগিলেন। মেদিনীপুরে তিনি বক্তৃতা দিতে বহুবার গিয়াছেন। একবার সভার পর শুইয়া আছেন, সেই ঘরেই এক ভলান্টিয়ার ছেলে শুইয়া খুব হাসিতেছিল, শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন এত হাসিতেছ কেন? সে বলিল আপনি খুব একটা ঢং শিখিয়াছেন, এমন করিয়া বক্তৃতা দেন যে আপনি রাজনীতি বলেন, না বেদান্ত প্রচার করেন তাহা সরকারের লোক কিছুই বুঝিতে পারে না, আপনার বক্তৃতার রিপোর্ট লিখিতে যাইয়া তাহারা রাধাকৃষ্ণ মথুরা বৃন্দাবন শোষণ-নীতি এবং আপনার চোখের জল ইত্যাদি দেখিয়া শুনিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা ভাবিয়া চলিয়া যায়। মেদিনীপুরে একবার বক্তৃতার পর আহারাদি করিয়া শুইয়া আছেন, সংবাদ আসিল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পুলিশ আসিতেছে, তখনই বিছানা-পত্র গুটাইয়া রাত্রের অন্ধকারে হাঁটা পথে অন্য গ্রামে চলিয়া গেলেন। এইভাবে কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া কত হাজার হাজার মাইল পায়ে হাঁটিয়া এবং কত অনশন করিয়া দেশমাতৃকার সেবা তিনি করিয়া গিয়াছেন। তিনি শ্রীনিত্য-

গোপালের 'ভয় নাই' এই মাভৈঃ বাণী হৃদয়ে লইয়া সকল প্রকার বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। কত নৌকায় নৌকায় গ্রাম গ্রামান্তরে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইয়াছেন। একবার প্রবল ঝড়ে নৌকা ডুবিবার মত হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন আমার নৌকা ডুবিবেনা, যদি ডুবে ঠাকুরের কৃপায় সেখানে চর পড়িয়া যাইবে। একবার রাত্রে পদ্মার চরে যাইতে যাইতে বালির ভিতর ডুবিয়া গিয়াছিলেন, হঠাৎ যেন কেমন করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। তাই তিনি বলিতেন, ঠাকুর আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, আমার কোন ভয় নাই, আমি তাঁহার, আমাকে রক্ষা করিবার ভার তাহার।

স্বদেশী যুগে অসহযোগ আন্দোলনে বরিশালে ছিল তাঁহার রাজার মত অধিকার ও সমাদর। তাঁহার সদাচার সত্যনিষ্ঠা অমায়িক ব্যবহারে মানুষ ছায়ার মত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে। শরৎবাবুর দেশের কাজে টাকা দরকার। গোপেশ্বর সাহা নামে এক মহাজনের দোকানে যাইয়া বলিলেন আমার এখনি ১০০ একশত টাকার দরকার। তখন গোপেশ্বর সাহা দোকানে উপস্থিত ছিলেন না, কর্ম্মচারী বলিল, মহাজন না আসিলে আমি টাকা দিতে পারি না। শরৎবাবু বলিলেন—তুমি আমাকে চাবি দাও, আমি বাক্স খুলিয়া টাকা লইয়া যাইতেছি. তুমি গোপেশ্বর আসিলে আমার কথা বলিও। অগত্যা কর্ম্মচারী চাবি ফেলিয়া দেয়, শরৎবাবু বাক্স হইতে টাকা বাহির করিয়া লইয়া যান। এতখানি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র তিনি বরিশাল-

বাসীর নিকট ছিলেন।

কিছুদিন এইভাবে চলিবার পর কংগ্রেসের ভিতরে কাউন্সিল প্রবেশ লইয়া ভীষণ মতদ্বৈধ আরম্ভ হইল। সত্যাগ্রহী শরৎকুমার কাউন্সিলে প্রবেশ সমর্থন করিলেন না। গয়া কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী সভায় কাউন্সিলে প্রবেশ লইয়া নেতারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেলেন। মহাত্মাজী জেলে, তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনকে চালাইবার জন্য শরৎকুমার প্রভৃতি নেতাগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অন্য দিকে সি, আর, দাস প্রভৃতি কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাব লইয়া জোড় আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। বরিশালে জেলা কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক অধিবেশনে সি, আর, দাস প্রভৃতি নেতাগণ বরিশালে আসিলেন। বিরাট সভার আয়োজন হইল, চৌদ্দ পনর হাজার লোক সমবেত হইল। সি, আর, দাস বলিলেন—'শরৎবাবু, শুনিতে পাই আপনার বক্তৃতায় নাকি সকলে ভাসিয়া যায়, আমিও আজ আপনার বক্তৃতা শুনিয়া ভাসিয়া যাইতে আসিয়াছি। শরৎবাবু বলিলেন—ভাসিয়াই যাইবেন। বক্তৃতা আরম্ভ হইল। সি, আর, দাসের পক্ষের সমস্ত যুক্তি শরৎকুমার তাঁহার অসহযোগের দৃষ্টিভঙ্গিদ্বারা অকাট্য যুক্তি সহকারে খণ্ডন করিলেন। চারি ঘণ্টা কাল সেই তেজোদৃপ্ত বক্তৃতা সে দিন যাহারা শুনিয়াছিলেন আজও তাঁহারা কেহ ভুলিতে পারেন নাই। বক্তৃতার পর সি, আর, দাস শরৎবাবুকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। সেই দিনের বক্তৃতার কথা শুনিয়া মৃত্যুশয্যায়

শায়িত অশ্বিনীকুমার দত্ত বলিয়াছিলেন, শরৎ, আমি দেখিয়া গেলাম বরিশালের গৌরব তুমি রক্ষা করিবে। সি, আর, দাস চলিয়া গেলেন কিন্তু বরিশাল কংগ্রেস দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। একদিকে স্বরাজ্য পার্টির দল, অন্যদিকে শরৎকুমারের সত্যাগ্রহীর দল। স্বরাজ্য পার্টির দল শরৎকুমারের বিরুদ্ধে অনেক অসত্য অপপ্রচার করিতে লাগিলেন। সত্যসেবী শরৎকুমার কংগ্রেস ও কুম্ভমেলাকে এক দৃষ্টিতে দেখিয়া কংগ্রেসের আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সেই কংগ্রেসে যখন দেখিলেন অনেক মিথ্যা ও দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে, তখন গভীর বেদনা লইয়া কতিপয় সহকর্ম্মী সহ ১৩৩০ সালের ভাদ্র মাসে শরৎকুমার কংগ্রেস অফিসে পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়া কংগ্রেস হইতে সরিয়া আসিলেন।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের একনিষ্ঠ সেবক শরৎকুমার তাঁহার সহকর্ম্মীগণকে লইয়া 'স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ' নাম দিয়া একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া বিশ্ব কল্যাণব্রতে ব্রতী হইলেন। স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ স্থাপন কালে যে কার্য্য প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিলেন উহা বরিশাল হিতৈষী হইতে তুলিয়া দিলাম।

স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ ৩০শে আশ্বিন ১৩৩০

বিশ্ব মানবের কল্যাণ কামনায়, ভারতীয় রাষ্ট্র ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের ভিতর দিয়া অহিংস অসহযোগ নীতি প্রচার করিয়া আজ জগৎপূজ্য। মহাত্মার আরব্ধ সেই বিশ্ব-

কল্যাণ প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করার মহান দায়িত্ব আজ প্রত্যেক ভারতীয় নর নারীর স্কন্ধে নিপতিত। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা মহানগরীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা বলিয়াছিলেন "আমার এই অহিংস অসহ-যোগ নীতি যদি কংগ্রেস গ্রহণ না করেন, তবে একা আমি নিজের দায়িত্বে এই অহিংস অসহযোগ মন্ত্র প্রচার করিব"। সুখের বিষয় কলিকাতা কংগ্রেস মহাত্মার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তদবধি নাগপুর, আহম্মদাবাদ ও গয়া কংগ্রেসে মহাত্মার সেই নীতি যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনের পর মুহূর্ত্তেই কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব লইয়া দেশমধ্যে একটা দলাদলি সৃষ্টি হইল। শক্তিশালী কতিপয় নেতার প্রভাবে ক্রমশঃ দিল্লী নগরীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গয়া কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ অনেক ওলটপালট হইয়া গিয়াছে।

যেহেতু মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার নীতির প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণ মনে করিতেছেন "ভারতীয় রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে মহাত্মার নীতি ধীরে ধীরে অপসারিত হইতেছে", মহাত্মার প্রভাবে যাহারা সে দিন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তন্মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা মহাত্মার এই নীতিকে জীবনের সাধনা রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এতন্মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের কতিপয় নেতা ও কর্ম্মী নানা কারণে আগামী কোকনদ কংগ্রেসের পর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য অপেক্ষা

করিতেছেন। বাংলা দেশের বহু সংখ্যক কর্ম্মীর পক্ষে কোকনদ কংগ্রেস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাও অসম্ভব হইয়া পড়ায় বিভিন্ন জেলার কর্ম্মীগণ স্বতন্ত্রভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছেন। উল্লিখিত কারণে আমরাও বরিশালের সেবা দায়িত্ব স্মরণ করিয়া স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ নামে এই প্রতিষ্ঠাসঙ্ঘ করিতে বাধ্য হইলাম। বিশ্ব কল্যাণ মূর্ত্তী শ্রীভগবান আমাদের সহায় হউন।

স্বরাজ সেবক সঙ্ঘের কার্য্য প্রণালী

১। বিশ্ব কল্যাণের জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রচারিত অহিংস অসহযোগ নীতিদ্বারাই ভারতবর্ষে অনতি বিলম্বে প্রকৃত স্বরাজ লাভ হইতে পারে জন সাধারণকে এইভাবে উদ্বুদ্ধ করা।

২। রাজনীতি, স্বদেশ প্রেম, স্বরাজ সাধনা প্রভৃতি ধর্ম্ম সাধনার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ জন সাধারণের ভিতর এই বোধ জাগ্রত করা।

৩। একমাত্র ভারতীয় জাতি বোধে সর্ব্ব সম্প্রদায়কে সম্মিলিত করার চেষ্টা।

৪। অহিংস সাধনা দ্বারা হিন্দু মুসলমান বিভিন্ন জাতির মিলন চেষ্টা।

৫। অনুন্নত জাতির উন্নতি ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন চেষ্টা।

৬। স্বরাজ সাধনায় অপরিহার্য্য নারী শক্তিকে ভারতীয় আদর্শে সঙ্ঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টা।

৭। কংগ্রেসকে মহাত্মা গান্ধীর অনুসৃত নীতিদ্বারা পরিচালিত করার চেষ্টা।

৮। কলিকাতা বিশেষ কংগ্রেসে গৃহীত ত্রিবিধ বর্জ্জনের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখা।

৯। সালিসী সভা স্থাপন।

১০। পাঠশালা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন।

১১। বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ।

১২। তুলা উৎপাদন এবং চরকা খদ্দর প্রচলনের বিশেষ প্রচেষ্টা।

১৩। বরিশাল জেলায় অন্ততঃ পাঁচ শত স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ।

১৪। আইন অমান্যের জন্য দেশকে প্রস্তুত করা।

সদস্য

এই সঙ্ঘের সদস্য নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন।

১। যাহারা অনন্যকর্ম্মী হইয়া এই সঙ্ঘে যোগদান করিবেন।

২। যাহারা স্বীয় সাংসারিক কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও সপ্তাহ মধ্যে নির্দ্দিষ্ট গঠনমূলক কার্য্যে ব্যয় করিবেন এবং স্বয়ং সঙ্ঘের আদেশগুলি পালন করিবেন, প্রয়োজন হইলে সঙ্ঘের আদেশ মাত্র আইন অমান্যের জন্য উপস্থিত হইবেন।

৩। যাহারা আর্থিক সাহায্য, পরামর্শ দান, প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা সঙ্ঘের উন্নতি সাধন কল্পে চেষ্টা করিবেন।

সদস্যের কর্ত্তব্য

(ক) ১ম ও ২য় দ্বিতীয় শ্রেণীর সদস্যগণ আহম্মদাবাদে রচিত স্বেচ্ছাসেবক সঙ্কল্প পত্রের যাবতীয় সত্য পালন করিবেন।

(খ) সর্ব্বশ্রেণীর সদস্য পূর্ণ খদ্দর পরিধান করিবেন। দৈনিক যথাসম্ভব চরকায় সূতা কাটিবেন ও পাঁচটি চরকা চালাইবার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন।

(গ) ২য় ও ৩য় বিভাগের সদস্যগণ স্বয়ং মাসিক বা বাৎসরিক একটা নির্দ্দিষ্ট চাঁদা প্রদান করিবেন।

(ঘ) যে পর্য্যন্ত কংগ্রেসের মূলনীতি ন্যায় সঙ্গত ও শান্ত উপায়ে স্বরাজ লাভ বজায় থাকিবে সেই পর্য্যন্ত প্রত্যেক সদস্য বার্ষিক চারি আনা চাঁদা দিয়া কংগ্রেসের সভ্য শ্রেণীভুক্ত থাকিবেন।

কর্ম্মক্ষেত্র

১। এই সঙ্ঘের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র সর্ব্বতোভাবে পল্লীগ্রামে রচিত হইবে। সমগ্র বরিশাল ও বিভিন্ন জেলার কর্ম্মীবর্গের সহিত যোগ রক্ষার জন্য বরিশাল সহরে সঙ্ঘের একটি কার্য্যালয় থাকিবে।

২। গঠনকার্য্যসমূহ বিশেষভাবে পরিচালন এবং স্বেচ্ছা সেবকগণকে শিক্ষাদানের জন্য জেলার একাধিক স্থানে গান্ধী আশ্রম নামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইবে এবং ঐ আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় গ্রামে কার্য্যারম্ভ করা হইবে।

৩। জেলার বহু স্থানে সঙ্ঘের শাখা স্থাপিত করিয়া চরকা প্রচলন ও প্রচার কার্য্যদ্বারা "অহিংস অসহযোগ মন্ত্রের" জনমত সংগঠনের প্রচেষ্টা করা হইবে।

গান্ধীভাণ্ডার

সঙ্ঘের কার্য সম্পাদনের জন্য গান্ধীভাণ্ডার নামে একটি তহবিল থাকিবে এবং শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় স্বাক্ষরিত মুদ্রিত রসিদদ্বারা অর্থ সংগৃহীত হইবে। তহবিলে মাসিক ও বার্ষিক চাঁদা, এক কালীন দান, মুষ্টি ভিক্ষা প্রভৃতি প্রবর্ত্তনদ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা হইবে।

আহ্বান

মহাত্মার পবিত্র নীতিতে শ্রদ্ধাবান কর্ম্মী ও সহানুভূতিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই সঙ্ঘে যোগ দিবার জন্য কারারুদ্ধ মহাত্মার নামে আহ্বান করা হইতেছে—সকলে অগৌণে যোগদান করুন।

পরিচালক ও কর্ম্মকর্ত্তা

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় এই সঙ্ঘের প্রধান পরিচালক ও শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কর্ম্মকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইলেন। সঙ্ঘ সম্বন্ধীয় যাবতীয় পত্রাদি কর্ম্মকর্ত্তার নামে জেল রোড বরিশাল এই ঠিকানায় পাঠাইবেন"।

সেদিন এই বিরাট কর্ম্ম পন্থা লইয়া সমস্ত বাংলায় শরৎকুমার যে আন্দোলনের ঝড় তুলিয়াছিলেন, তাহা এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শরৎবাবুকে দেশের লোক দেবতার মত শ্রদ্ধা করিত, আপন জনের মত ভালবাসিত, তাঁহার নির্দ্দেশে তাই আনন্দের সহিত পরিচালিত হইত। শরৎকুমার এই বিরাট কর্ম্মের ভিতর নিজকে বিলাইয়া দিলেও সঙ্গে সেই পাঁচটি মানুষ ছিলেন। সকল ঝড় বাদল মাথায় লইয়া সুযোগ্যা সহকর্ম্মিণী উষাঙ্গিনী

দেবী পুত্রকন্যাকে লইয়া হাসিমুখে স্বামীর কর্ম্মের অনুগমন করিয়া চলিয়াছিলেন। শরৎকুমারের ভাগ্যে ঘরের অন্ন আর কয় দিন জুটিয়াছে? বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে নিজকে বিলাইয়া দিয়া ঝড়ের মত তিনি সারা বাংলায় ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়-সর্ব্বস্ব শ্রীনিত্যগোপালের আশীর্ব্বাদ 'ভয় কি টেনে তুলব' এই অভয় মন্ত্রে তিনি দুর্জ্জয় বিপ্লবী ছিলেন। অখণ্ড বিশ্বের সেবক শরৎকুমার, তাই তিনি অনায়াসে এক ক্ষেত্র হইতে অন্য ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারিতেন, তাঁহার চলার গতি ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। সেই সময় ১০ই মাঘ ১৩৩১-এ তিনি আর একখানা আবেদন পত্র ছাপাইয়া ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মধারা বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে জন্য এখানে তুলিয়া দিলাম।

আবেদন

বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ মহাত্মা গান্ধী তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনলব্ধ স্বরাজ লাভের নিশ্চিত পন্থা অসহযোগকে আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া এক বৎসরের জন্য সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলকে একটি সাধারণ কর্ম্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে কর্ম্ম থাকিবে চরকা খদ্দর, জাতীয় বিদ্যালয়, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন। কর্ম্মিবর্গের এই এক বৎসরের কর্ম্মপটুতা বিচার করিয়া তিনি জাতির সম্মুখে আবার মুক্তির একমাত্র অমোঘাস্ত্র অহিংস অসহযোগ ঘোষণা করিবেন, দৃঢ়তার সহিত এ বিশ্বাস আমরা করিতেছি। আজিকার এ দিনেও মহাত্মাজী বেলগাঁও কংগ্রেসের অভিভাষণে বলিতেছেন:—

"বৃটিশ কার্যপ্রণালী জোর করিয়া ভারতবর্ষের উপর প্রয়োগ করিবার বিরুদ্ধে আমি মরণ পর্যন্ত যুদ্ধ করিব।"

* * * * *

"সম্ভবতঃ জনসাধারণ অবগত নহেন যে খদ্দর প্রচলনের পরেই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় সাফল্যলাভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে সামান্য কয়েক-জন মাত্রও ছাত্র থাকিবে সে পর্য্যন্ত সেগুলি কিছুতেই পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না! জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজগুলিকে প্রতিষ্ঠিত রাখা প্রত্যেক প্রদেশের পক্ষে আত্মমর্য্যাদা রক্ষার দিক হইতেও একান্ত প্রয়োজন। অসহযোগ প্রত্যাহৃত হইলেও জাতীয় বিদ্যালয়গুলির কোন ক্ষতি হইবে না, পরন্তু ঐ গুলিকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার ও পরিচালনা করিবার জন্য পূর্ববাপেক্ষা আরও অধিকতর চেষ্টা করিতে হইবে।"

* * * * *

কংগ্রেসের সভাপতিরূপে মহাত্মাজীর দুইটী মূর্ত্তি প্রকট হইতেছে। একটী সমগ্র ভারতীয় জাতির প্রতিরূপ, অপরটী তাহার ব্যক্তিগত স্বরূপ। সমগ্র ভারতীয় জাতির অক্ষমতা ও বেদনা আপন বক্ষে অনুভব করিয়া জাতির প্রতিনিধিরূপে তিনি অসহযোগকে আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া এক বৎসরের জন্য সাধন সংগ্রামকে সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছেন। আবার সেই সঙ্গেই স্বীয় ব্যক্তিগত স্বরূপ প্রকট করিয়া তাঁহার প্রাণের গূঢ় কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—"এখন আমি আমার বিশ্বাসের কথা

বলিব।······ব্যক্তিগত ভাবে আমি অসহযোগ স্থগিত রাখিবনা, রাখিতে পারিবনা, যতদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট এই প্রকারেই থাকিবে। আমার পক্ষে অসহযোগ একটা উপায় বা কৌশল নহে, —ইহা আমার মর্ম্মগত বিশ্বাস"।

ব্যক্তিগত হিসাবে অসহযোগী এবং জাতির পক্ষে অসহযোগ স্থগিতকারী মহাত্মাজীর এই দুই ভাবের মধ্যে যে এক শূন্যতাময় অন্তরের সৃষ্টি হইয়াছে, উহাকে অসহযোগী কর্ম্মিগণের মরণ দিয়া পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। মরণ ভিন্ন ঐ শূন্যতাকে ভরিয়া তুলিবার উপায়ান্তর নাই।

মহাত্মাজীর মর্ম্মগত বিশ্বাসে সমগ্র দেশকে বিশ্বাসী করিয়া তুলিতে বর্ত্তমান বর্ষে সঙ্ঘ গঠনের জন্য আমাদিগকে মৃত্যুপণ কাজ করিতে হইবে। বাখরগঞ্জের চরকা খদ্দর, এই দুর্দ্দিনের ভিতরে নব প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়, কর্ম্মিসংরক্ষণ, মহিলাসঙ্ঘ গঠন প্রভৃতি এক বৎসরের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য আমি ১৫০০০৲ পনর হাজার টাকা প্রার্থনা করিতেছি। বাখরগঞ্জের বাহিরে সমগ্র বাংলাদেশে আমার বন্ধু বান্ধববর্গের নিকটেও আমার দাবী জানাইতেছি। জনসাধারণের নিকট হইতে নিত্যপ্রাপ্ত স্নেহ ভালবাসা আমার বুকে অফুরন্ত সাহস দান করিতেছে। সর্ব্বশেষ আমার মায়েদের কাছে, যাঁহাদের নিকট হইতে আমার নিত্য পুষ্টকারী স্নেহাশীষ আমাকে প্রতিনিয়ত শক্তিমান করিতেছে, আমি যাহাদিগকে এই জাতীয় আন্দোলনের অগ্রণী বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই মায়েদের দৃষ্টি তাহাদেরই স্নেহ-

কাঙ্গাল এই দীন সন্তানের আব্দারের প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীভগবানের কৃপায় গত এক সপ্তাহ মধ্যে জনৈক ভক্তবন্ধু সহস্র টাকা, জনৈক ভদ্র মহিলা দুই শত টাকা এবং আরও কতিপয় দানে প্রায় দেড় সহস্র টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। অর্থ সংগ্রহের জন্য আমার যেন অধিক সময় নষ্ট না হয় ইহাই আমার সানুনয় প্রার্থনা।

পঞ্চম অধ্যায়

১৩৩০ সনের মাঘ মাসে মহাত্মাজী জেল হইতে বাহির হন। ১৩৩১ সনের ৮ই আশ্বিন শরৎবাবু মহাত্মাজীকে একখানি খোলা চিঠি পাঠান. নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

মহাত্মাজীর নিকট লিখিত পত্র

মহাত্মাজী মহাযোগীন্, তোমার শ্রীচরণে অভিবাদন জানাচ্ছি। বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যা কিছু আমার মনে উদয় হচ্ছে তোমার কাছে প্রাণ খুলে নিবেদন কর্ব্বো। ভরসা আছে কথাগুলি প্রাণের দিক দিয়ে যথাযথ ভাবে গৃহীত হবে। মদীয় আচার্য্যদেব বলতেন "আমি বিশ্বনাগরিক"। তোমার ভিতর এই বিশ্ব-নাগরিকত্বের মহান প্রকাশ দেখে তোমাকে ভালবাসতে প্রলুব্ধ হয়েছি। তাঁর মহাপ্রচার ছিল গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের সমন্বয়। তোমার ভিতর দিয়ে তাঁহার ধর্ম ও রাজনীতি সমন্বয় মূর্ত্তিতে ফুটে উঠেছে। তোমাকে আপনার জন বলে বরণ করে নিতে তাই প্রাণের এত প্রয়াস। তোমাকে সাক্ষাৎ ভাবে দেখিনি, তুমি যখন বরিশাল এসেছিলে তখন আমি বৃটিশের অতিথি। তবু আজ মনে হয় তুমি কত যুগ যুগান্তরের নিজজন। তোমাকে সকল দেহ মন দিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম কচ্ছি। আশীর্ব্বাদ কর।

আমরা আহাম্মদাবাদে তোমাকে কাঁদায়েছি, তোমার কোমল হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করেছি। যে বিষবৃক্ষ কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে নিজ হাতে রোপণ করেছ, তারই পরিষ্কার বিষ ফল আহাম্মদাবাদে তোমাকে খেতে হয়েছিল, তীব্রজ্বালা সহ্য করতে না পেরে কংগ্রেস কমিটি হতে পালাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছ। তুমি অসময়ে কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে আমাদিগকে দলবদ্ধ ভাবে দেশ-সেবা শিখাতে চেয়েছিলে, আমরা যে কত ভণ্ড তা তোমার সহজ সরল উদার প্রাণ কল্পনাও করতে পারেনি। তুমি চেয়েছিলে সংক্ষেপ, অথচ এই সংক্ষেপের সুযোগ নিয়েই আজ তোমায় আমরা পেয়ে বসেছি। আমরা তো চিরকালের আরামপ্রিয়, তাই কংগ্রেস কমিটির বাইরে সত্য দেশ-সেবার শুদ্ধ অধিকার আমাদের ভাল লাগেনি, তোমার দেশ-সেবার গতি আমরা আদৌ বুঝতে পারিনি। সাক্ষাৎ দেশ-সেবার অধিকারী না করে কেন আমাদের কংগ্রেস কমিটির মধ্যে পরোক্ষভাবে দেশ-সেবার জন্য আহ্বান করেছিলে। তোমার কাছে কংগ্রেস ও ভারতবর্ষ এক, যেমন ভক্ত ভগবান অভিন্ন। কিন্তু দেশের সাক্ষাৎ সেবায় তো আমাদের চিত্ত মুগ্ধ হয়নি, কাজেই আমরা দেশ-সেবা ও কংগ্রেস সেবাকে পৃথক বলে বুঝেছি এবং দেশ সেবার চেয়েও কংগ্রেস কমিটির সেবাকে বড় বলে স্থান দিয়েছি, তার ফল স্বরূপ আমরা দেশ-সেবার ছলে কংগ্রেসে নিজ ভোগ-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। আমরা কংগ্রেস কমিটি চিনি, দেশ আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। কবীরজী বলেছেন—

"দুধ গলি গলি ফিরে শুরা বৈঠল বিকায়"। যা কিছু সত্ত্বগুণ তাই জনসাধারণের, তাকেই যে গলি গলি ফিরে বিকাতে হবে। যা কিছু রজঃ বা যা কিছু তমঃ তা বসে বসেই বিকাবে। সরকারের স্কুল কলেজ আইন আদালত সব বসে বসে বিকাচ্ছে বলেই না ওর সঙ্গে শক্তিপূর্ণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিত্য ফেরি-ওয়ালা ভগবানের অনুচর রূপে ঐ বস্তুগুলিকে জন সাধারণের দ্বারে দ্বারে তুমি ফেরি করিয়া বেড়াইয়াছিলে। গলি গলি ফিরে সত্য ভারতবাসী হবার পূর্ব্বে আমাদেরকে কংগ্রেসের কেন্দ্রে নাম দিয়ে যা করেছ, তার যোগ্য ফল হাতে হাতেই পেয়েছ। তাই তুমি আজ পরাজিত। তোমার জেল গমনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও কংগ্রেস ভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা না নড়ে চড়ে কেবল কাগজে কলমে দেশ-সেবাই করে যাচ্ছি। সত্যব্রত—সত্যপ্রচারে তোমার কোন ভয় নাই। তুমি আজ সত্যসত্যই আমাদের কাছে হেরে গিয়েছ। তুমি আজ কংগ্রেসের বাইরে—যা কলিকাতা কংগ্রেসের পূর্ব্বে ছিলে। তুমি তো ছিলে আগে সত্যাগ্রহী তৎপর কংগ্রেস সেবক। তুমি যদি কংগ্রেসকে নিজের হাতে নেবার পূর্ব্বে ভারতের আকাশ বাতাস অহিংস অসহযোগমন্ত্রে ভরপুর করতে তবে এতদিনে কংগ্রেস তোমার হত, আমাদের হাতেও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত না, আমরাও বোধহয় মানুষ হতাম। তোমার শর্টকাট শট হয় নাই। আবার তাই প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হবে। তোমার প্রতিনিধিবর্গ কবে কোথায় কোন্ পথে প্রতিনিধিত্ব লাভ করলে?

আজকাল প্রতিনিধি হয় ভোটের জোরে। দেশ-সেবার জোরে নয়। এই প্রতিনিধিগণ দিয়েই তোমার ও তোমার প্রাণতুল্য আন্দোলনের এমন দুর্দ্দশা। তোমার আন্দোলন কিন্তু নিজে স্বপ্রকাশ, স্বয়ম্পূর্ণ। তোমাকে আজ কাঙ্গালের মত আবার গ্রামে গ্রামে ঘুরে সত্য প্রতিনিধি হবার সাধনা শিখাতে হবে। তোমার জেল-গমনের পর থেকে দেশবাসীর সহিত সাক্ষাৎ সঙ্গলাভ প্রায় উঠেই গেছে। তুমিই কংগ্রেস, কংগ্রেসই তুমি। কংগ্রেস' তো একটা কলকারখানা নয়, সে যে জীবন্ত বিগ্রহ। তোমাতেই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, অবশ্য তুমি একথা আমাদেরও উচ্চারণ করতে দিতে নারাজ। 'ওগো বত্রিশ কোটি ভারত বাসীর সত্য প্রতিনিধি মহাত্মাজী, আজ তুমিই কংগ্রেসের কেউ নও। তবুও যে তোমাকে চাই কেন জান? তোমার নামের আড়ালে আমাদের সর্ব্বস্বার্থ সিদ্ধি হবে, ব্রহ্মচারীর বেশ না ধরলে রাবণ আমরা সীতাহরণের সুবিধা হবে কি করে? তুমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরেছ। তোমার কংগ্রেসে তোমাদের গণশক্তি আজ "পারিয়া"। যদি মা তোমাকে বের করে দিয়েই থাকেন, জন সাধারণকে নিয়েই থাক। তোমার কথা— 'আমার দেশের অতি হীন লোকের মাঝে আমি ডুবে যাব, অথবা তাহাদেরকে সঙ্গে লইয়াই চলিব"—এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে তোমার জীবনে ফুটে উঠুক। জন সাধারণের তুমি ছাড়া কেহ নাই, তাদের ছেড়ে তোমার কাছে কোন কংগ্রেস বড় নয়, তুমিই তো বলেছ কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই

আমরা আত্মকেন্দ্রিকের দল। কতখানি সাক্ষাৎ সেবা করে প্রতিনিধি হবার অধিকার জন্মে তা তো দূরের কথা তার শতাংশের এক অংশও করিনি। ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি তুমি একাই অহিংস অসহযোগ সাধনায় দেশকে চেতন করে তোল, তোমার কাছে প্রোচেঞ্জার নোচেঞ্জার সব সম্প্রদায় সমান থাকুক। কোন দল করেই তোমার দরকার নেই, নোচেঞ্জার নিয়ে দল করতে বলেছি, তোমার পক্ষে তাও সঙ্গত হবে না। দলবদ্ধ হওয়ার সাধনা আমরা এতদিন করিনি। আমাদের মিলাতে চাইলে বিরোধই শুধু বাড়বে। মিলন চাইলে মিলন অমিলনের বাইরে যেখানে তোমার বিরোধের কথাও যায় নি সেখানে গিয়ে শুধু দেশ-সেবায় আমাদের সঞ্জীবিত কর। ওগো সচল ভারতবর্ষ, তুমি কোন্ মিলনের আশায় বসে আছ? গতিহীন ভারতবর্ষকে গতি-প্রধান কর, কংগ্রেস আজ গতিহীন নিশ্চল, তোমায় পর্য্যন্ত গতিহীন করার যোগাড় করেছে, যত দেরী হচ্ছে ততই আমাদের নিশ্চেষ্টতা বাড়াচ্ছে। আমাদের সঙ্কীর্ণ অহম্ উঁকি দিচ্ছে, তোমার ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনুষ্যত্বের চাপে আমাদের যা কিছু ক্ষুদ্রত্ব চূর্ণ হয়ে যাক্। মিলনের সূত্র যে তোমার অন্তরে, অন্য কোন বাইরের কংগ্রেসে মিলন হবে না বরং বিরোধ আরো ঘন হবে। সাধারণ প্রোগ্রাম বাইরে নেই, তাও যে তোমার আমিকে মুছে ফেলবার প্রয়াসে নিহিত। তুমিই লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক, তুমিই মূর্ত্তিমান সূত্র যজ্ঞের হোতা। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণতত্ত্ব ব্যতীত কে

অসুরত্বের হাত থেকে কবে মুক্ত হতে পেরেছে? প্রাণই সর্ব্বম্ভরী, সকলকে পুষ্ট করে, কারু কেউ নয়। তোমার প্রাণের স্পর্শে সাধারণ প্রোগ্রাম ফুটে উঠবে। কর্ম্ম বহু থাকবেই, কেউ তাকে এক কর্ত্তে পারেনি। প্রাণ তাদের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক। কংগ্রেসের প্রস্তাবের দুর্গতি কি এই কয় বৎসরেও পরিস্ফুট হয় নি? ভোটে পাশ করে কি ফল হবে আমি ভেবেই উঠতে পারি না। আশা করি প্রস্তাবের দিন বয়ে গিয়েছে, এখন ভারতের অন্তরাত্মা চায় জীবন্ত মানুষ। আমরা নাস্তিক, কিছু মানি না, কিছু মানিবও না। আমাদের জোর করে মানাতে হবে। তুমি একার মত চলে যাও, তোমার পিছনে সত্য দল আপনা আপনি গড়ে উঠবে। মিলন করা যায় না। ওটা হবার জিনিষ। মিলনটা যদি করার জিনিষ হয় তবে চুক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে; সব দল নিয়ে আলোচনা সভা করা চলে; কিন্তু কর্মী সভা হয় না। কংগ্রেস যে তোমার হাতে কর্মী সভা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি থাকতে মিলনের ভাবনা কি? তুমি যে ভারতের ছিন্ন প্রাণ জোড়া লাগাবার সিমেন্ট। তোমার কংগ্রেস সভাপতি হয়েও দরকার নেই; তুমি ওর বাইরে থাক। জগতে একও সত্য, বহুও সত্য, মিলনও সত্য, বিরোধও সত্য; ভগবান এক ও বহুর মিলন বিরোধের অতীত বলেই তিনি মেলাতে জানেন। কেবল এক করতে চাইলে বিরোধ বেড়েই যাবে। বিরোধ যে মিলনের অপর অর্দ্ধ। প্রাণের মাঝে একত্ব ও বহুত্ব মিলে মিশে থাকতে

পারে। শত চেষ্টাতেও বেলগাঁওয়ে সব দল এক হবে না। বাইরের জগতে এমন কোন কর্ম্মপন্থা নাই বা কেউ দিতেও পারে না যা অবিসম্বাদিতভাবে সকলে মেনে নিতে পারে। যারা এতদিন পরে চরকা মেনে নিতে চায় তারা শুধু তোমাকে পাবার জন্যই চায়, আদর্শের জন্য নয়। এভাবে কি বস্তুর প্রতিষ্ঠা হয়? তোমার আহম্মদাবাদের চরকার প্রস্তাব প্রতি-নিধিদের সংখ্যা হিসাবে কয়জন নিয়েছে? যে মিলনের কথা শুনতে পাচ্ছি, তাতে কোন দল তৃপ্ত হবে না। মিলন হতে গেলে সকলের মিলনই যে তোমার কার্য্য তা বুঝি, কেন না তোমার দ্বেষ্যও নেই, প্রিয়ও নেই। কিন্তু এই যান্ত্রিক মিলন যাহা ভিতর থেকে নয়, তা কি টিকবে? মহাত্মাজী, বড় ভয় হচ্ছে, মিলনের নামে ভীষণ বিরোধের সূত্রপাত হবে। এ মিলনে তোমার নোচেঞ্জার দল তুষ্ট হবে না। অসহযোগ যে তাদের সাধনা; ও যে বিরত করা যায় না। আমি তো আমার প্রাণের কথা বলছি, অহিংস অসহযোগ আমার ভাগবত। কংগ্রেস যদি অসহযোগ বর্জ্জনও করে, যতদিন সাধনা বলে বুঝব ততদিন একে কেমন করে ছেড়ে দেব বুঝতে পাচ্ছি না। এই অহিংস অসহযোগ নীতির উপরেই ভগবান বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তারই পরে তোমার এই আন্দোলন বাঁধা। যে স্কুল কলেজ আইন আদালতকে অসত্যের ধারক ও পোষক বলে বুঝেছি তাকে কেমন করে জড়িয়ে ধরব? জীবন নিয়ে এমন খেলা কি খেলতে পারব? একজনকেও যদি অসহযোগ সাধনায় বিপন্ন

করে থাকি শুধু তার জন্যই কি ঐ আন্দোলনকে বুকে রাখার পক্ষে যথেষ্ট নৈতিক যুক্তি নেই? আজ গ্রেপ্তার হলে কি জাতি হিসাবে বাধা দেব? না দেওয়াই সঙ্গত। বয়কট বলতে ঘরে ফিরে আসা ছাড়া তো আর কিছুই বুঝি না। বয়কট বন্ধ করলে গঠন কাজ দাঁড়াবে না। জন সাধারণের সহিত শহরের স্কুল কলেজ আইন আদালতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকলেও তারা সবাই শহরমুখো। এই শহরমুখিনী গতি রোধ করে অন্তর্মুখীন করাই না পণ্য বর্জ্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য? পণ্য বর্জ্জন স্থগিত রাখলেও জাতীয় বিদ্যালয় সালিশী বোর্ড সব শুকিয়ে যাবে। একা খদ্দর দাঁড়াতে পারবে না। ঐগুলি পতনের সঙ্গে ওটিও শুকিয়ে যাবে। তোমার প্রোচেঞ্জার দলই কি এতে তৃপ্ত হতে পারবে? যদি নন কোপারেশন কার্য্যতঃ স্থগিত থাকে তবে মডারেটদের শক্তি সামর্থ্যে তাঁরা সমকক্ষ থাকবেন? অসহযোগের শক্তিতেই না তাহাদের শক্তি? অসহযোগের অভাবে তারা ভারতের কেউ নয়। আবার নরমপন্থীদের কি এই মিলনে আনন্দের কোন হেতু থাকবে? তারা জনসাধারণের সাক্ষাৎ সেবা অপেক্ষা নিয়মানুগভাবে সরকারের সহিত বোঝা পড়ারই অধিক পক্ষপাতী; কর্মী হিসাবে তাদের মূল্যই বা কতটা হবে? কনষ্টিটিউশনাল আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া রক্তাক্ত বিদ্রোহ। তুমি এই দুইটি সর্ব্বনেশে বিরুদ্ধ আন্দোলনকে অহিংস অসহযোগের ভিতর এক করে জগৎ উদ্ধার করতে চেয়েছিলে। সব দল অতৃপ্ত হলে তার ফাঁক দিয়ে বেড়িয়ে পড়বে নিশ্চয় হিংস আন্দোলন।

সকলকে মিলাতে গিয়ে তুমি কংগ্রেস সভ্যদের জন্য বাধ্যতামূলক সূতাকাটা প্রবর্ত্তন করতে চেয়েছ কিন্তু তুমি ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্য্যও পছন্দ কর না। ওখানেও যে জুলুমের প্রশ্ন আছে। কোরাণও বলেছেন ধর্ম্মে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। চারিটি বর্জ্জন তুলে দেওয়াও যা, আমাদের দৃষ্টিকে শাসন যন্ত্র হতে তুলে নিয়ে বৃটিশের উপর স্থাপন করাও তা। যদি বর্ত্তমান সংগ্রাম ব্রিটিশের সঙ্গে ঘোষিত হয়ে থাকে তবে অব্রিটিশদের মিলন বুঝি, কিন্তু আমি যতদূর বর্ত্তমান আন্দোলন বুঝতে সক্ষম হয়েছি বর্ত্তমান যুদ্ধ ভারতীয়দের সহিত অভারতীয়দের। আমরা অব্রিটিশ হলেই যে ভারতীয় হব এমন কিছু বোঝা যায় না। যদি আমরা সকলে ভারতীয় হতাম তবে স্বরাজ আন্দোলনের দরকারই হোত না। যারা ভারতবর্ষীয় বলে পরিচিত হচ্ছে সবাই কি তারা ভারতবাসী? ভারতবাসীকে বেছে বের করাই এই অসহযোগের তাৎপর্য। ভারতের যদি আত্মস্থ হতে হয় তবে ভারতীয়দের সহিত অভারতীয়দের বিরোধ অনিবার্য্য। বর্ত্তমান সংগ্রাম চলছে ভারতীয় সভ্যতা ও বিদেশী সভ্যতার ভিতরে। বয়কট স্থগিত রেখে স্বরাজনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করার ফলে আমাদের যে আক্রমণ এতদিন শাসন যন্ত্রের উপর ছিল, তা বিরুদ্ধ হয়ে শাসকদের উপর স্থাপিত হবার অধিকতর সুযোগ জুটবে। এই ভাবে আমরা ধীরে ধীরে হিংস্র বিদ্রোহের ভিতর ঝাঁপ দিতে অগ্রসর হব। এই আশঙ্কায়, দেব, পায়ে ধরে বলছি আর একবার ভেবে দেখ। কংগ্রেসকে কংগ্রেস হয়েই

থাকতে দাও। তোমার মতে তুমি নিরন্ন নিরক্ষর জনসাধারণ নিয়ে জীবন কাটিয়ে দাও; তোমার নো-চেঞ্জার প্রো-চেঞ্জার মডারেট কিছু ভাববার দরকার নাই। তুমি গীতার সুরে সুর মিলিয়ে বল

"সমোঽহম্ সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাম্ ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

তুমি ত নিজেই বলেছ আমি ছাড়া আমার কোন অনুগামী নাই। যদি কেউ তোমার জীবন বরণ করে নেয় তুমি তাকে কোলে নিও। তোমার পিছন ফিরে দরকার নাই। তুমি এগিয়ে যাও আমাদের সব দলাদলি থেমে যাবে। তুমি কারুরই একচেটে সম্পত্তি হয়ো না, নিজের নীতি অনুমাত্রও সঙ্কুচিত কর না, সব ঠিক হবে। অসহযোগ নিজ হাতে স্থগিত করো না, দেশের অন্তরাত্মা এই প্রেরণা চায়, এ যে তাদের মন্ত্র। দেশকে যথেষ্ট শুনানো হয়নি, তুমি ঋষি কণ্ঠে আর একবার শোনাও, কংগ্রেস অচিরাৎ তোমার অনুকরণ করবে। হারান যা কিছু সব ফিরে পাবে। তুমি অসহযোগ বর্ত্তিকা নিয়ে একা আগে চল, আমরা বিভিন্ন পন্থা তোমার আলোকে স্ব স্ব ক্ষেত্র চিনে নিয়ে যে যার স্থানে দাঁড়াব। তখনই হবে জীবন্ত ঐক্য। নব সম্প্রদায় যে সামনে দাঁড়িয়ে এক হবে না, যে যার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সরলভাবে স্বধর্ম্ম রক্ষা করলেই মিলন হবে বাস্তব। তুমি সব পন্থার মিলিত হবার এক মাত্র উপায় প্রাণের প্রচার কর। ১৯২০ সনের চেয়েও অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত বহু সংখক নরনারী তুমি

পেয়েছ, তারা কিছুকে ভয় করে না। আবার বলি মিলন বাইরের কোন কর্মপন্থায় নাই। মিলনের কেন্দ্র দেশ, তুমি ও আত্ম বিলোপকারী মহাসাধনা। তোমার উদার সত্য মিলন হবে বেলগাঁওয়ে নয়। তুমিই ভারতের 'within' তোমার উপর থেকে মিলন গড়ে উঠবে। কোন বেলগাঁওয়ের সাধ্য নাই এই যোগ সূত্র রচনা করবে। আমার প্রাণভরা প্রণাম গ্রহণ কর। অদ্য এই পর্যন্ত!

শ্রীশরৎকুমার ঘোষ

শরৎকুমারের কর্ম্মের বিরাম নাই। বরিশালের ব্রজমোহন জাতীয় বিদ্যালয়কে স্কুলের কর্তৃপক্ষ পরিচালনায় অক্ষম হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিলেন। শরৎবাবু তাহার প্রতিবাদ করেন। সভা করিয়া তিনি বলেন "অশ্বিনীবাবু জীবিত কালে যে স্কুলকে জাতীয় ভাবধারায় গঠন করা হইয়াছিল, আজ তাঁহার অবর্ত্তমানে সেই স্কুলকে পুনরায় বৃটিশের ভাবধারায় পরিচালনা করার সঙ্কল্প দেখিয়া আমি বড়ই বেদনা বোধ করিতেছি। বরিশালের গৌরব অশ্বিনীকুমারের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য আমি জনসাধারণকে আহ্বান করি, আমি দরিদ্র কিন্তু জনসাধারণের সহায়তায় আমি ইহাকে রক্ষা করিতে পারিব"। কিন্তু সেদিন দেশবাসীর নিকট হইতে তেমন কোন সারা পাইলেন না। ব্রজমোহন জাতীয় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পুনরায় সেই পুরানো ছাঁচে পরিচালনা করাই স্থির করিলেন। এই ঘটনায় শরৎকুমারের হৃদয় বেদনায় ভরিয়া উঠিল। কাহাকেও

না জানাইয়া তিনি বরিশালে আর একটি ভারতীয় ভাব-ধারায় জাতীয় বিদ্যালয় গঠনের সঙ্কল্প মনে মনে গ্রহণ করিয়া সেই ব্রত উদ্‌যাপন মানসে ১৩৩১ সনের ১লা পৌষ হইতে অনশন ব্রত গ্রহণ করিলেন। উপবাস করিয়াও বক্তৃতার বিরাম ছিল না। গুরুবলে বলীয়ান শরৎকুমার উপবাসের ৪র্থ দিনেও একঘণ্টা বক্তৃতা দেন এবং নবম দিনেও তিনি কীর্ত্তনে বিশেষ ভাবে যোগদান করেন। তাঁহার অনশনে দেশবাসী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল এবং জাতীয় বিদ্যালয় গঠনের জন্য চারণ কবি মুকুন্দ দাস ও গোপেশ্বর সাহা দুইজনে ২০০০৲ টাকা জাতীয় বিদ্যালয় গঠনের জন্য প্রদান করেন। এইভাবে ২০০৲ ৫০০৲ ১০৲ ৫৲ করিয়া বহু অর্থ জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সকলে প্রদান করিলেন এবং বহু অনুরোধ করিয়া নেতাগণ ও জনসাধারণ শরৎকুমারের অনশন দ্বাদশ দিনে ভঙ্গ করাইলেন। বরিশালে জাতীয় বিদ্যালয় উঠিয়া যাইতেছিল কিন্তু মায়ের পূজার একটি প্রধান অঙ্গ জাতীয় বিদ্যালয়, তাই বরিশালে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গেল। ১৩৩১ সনের ৯ই মাঘ জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের দিন ধার্য্য করিয়া ঐ দিন বিদ্যালয় উদ্বোধনের জন্য বাংলার প্রসিদ্ধ অসহযোগী নেতৃবৃন্দকে বরিশাল আসিবার জন্য আহ্বান করা হইল। প্রসিদ্ধ নেতা শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও হরদয়াল নাগ উৎসবে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের ভিত্তিপত্তন কালে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের বাল গোপালের

সহিত তুলনা করিয়া এই জাতীয় বিদ্যালয়কে বালগোপালের পূজা বলিয়া এক অপূর্ব্ব বক্তৃতা প্রদান করেন।

এইরূপে মহাসমারোহে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের কার্য্য সমাধা না হইতেই ১০ই মাঘ স্বরাজসূয় যজ্ঞ উৎসব আরম্ভ হইল। বিপুল উৎসাহের সহিত চরকা উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। সে বিরাট আয়োজনের কথা এখানে লেখা সম্ভব নয়—অহোরাত্র চরকা কাটা চলিয়াছিল। সেই উৎসবে ঐ জেলার টাকী, গৈলা, চন্দ্রহার, নলচিরা, সরিকল, হোসনাবাদ, রায়পাশা, রূপতলী, নলছিটি, কোশাবর, খয়রাবাদ, মেহেন্দীগঞ্জ, গাগরিয়া, রায়পুরা, কালীগঞ্জ, লতা, পিরোজপুর, বানরিপাড়া, ভুলারহাট, পারের হাট, হবিবপুর, কাকরধা, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বাখরকাঠি, গাভা, স্বরূপকাঠী প্রভৃতি স্থানের নেতা ও কর্ম্মীবর্গ উপস্থিত হইয়াছিলেন। জেলার এতগুলি গ্রাম লইয়া শরৎকুমারের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। চরকা সম্বন্ধে শরৎকুমারের বক্তব্য—"স্বরাজ স্বতন্ত্র, চরকাই স্বরাজের মূর্ত্তি। সর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য ঘন হবে কোথায়? যাতে সকলের প্রয়োজন সমান, অথচ সকলেই যাকে নিজের শক্তির ভিতর দিয়ে সৃষ্টি করবার যোগ্যতা রাখে, সেইখানেই স্বরাজের সৃষ্টি সম্ভব। বেঁচে থাকতে হ'লে বর্ত্তমানে চাই অসহযোগের জন্যই অসহযোগ। প্রথমে অন্তরের দেবতাকে প্রাণ খুলে বলতে হবে "তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, নাহি কোন বাধা ভুবনে"। বেঁচে থাকবার প্রয়োজনের পর দ্বিতীয় প্রয়োজন অন্ন ও বস্ত্রের। কিন্তু অন্ন সৃষ্টি তো

সকলের দ্বারা সম্ভব হবে না, তাই যে বস্ত্র সৃষ্টিতে সকলেই যোগদান করতে পারে, সেইটেই হবে স্বরাজের প্রধান মূর্ত্তি”। এই জন্যই চরকা প্রচলনের উপর শরৎবাবু জোর দিয়াছিলেন।

সেই সময় মহাত্মাজীকেও আসিবার জন্য তার করিলেন। মহাত্মাজী সেই টেলিগ্রাফের উত্তর দিলেন ও পত্র দিলেন। তাহার সেই পত্রের বঙ্গানুবাদ যাহা বরিশাল হিতৈষীতে বাহির হইয়াছিল, তাহা এই—

“প্রিয় শরৎবাবু,

আপনার তারের উত্তর দিয়াছি। আপনার পত্র আমার সম্মুখে, বড় ইচ্ছা ছিল উপস্থিত হই, কিন্তু সমস্ত ফেব্রুয়ারী মাসটি মর্টগেজ করা। যাহা হউক, আপনাদের সফলতা কামনা করি। পরিবর্ত্তন-বিরোধী তত্ত্বগুলি বন্ধু প্যাক্টটি আমার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই বলিয়া আমি দুঃখিত কিন্তু আমি তাহাদের মতের সম্মান করি, তাহাদের অসুবিধা বুঝি এবং তাহারা যেরূপ সংযমের সহিত প্রতিবাদ করিয়াছেন তজ্জন্য গভীর কৃতজ্ঞ।

আপনার এস, কে, গান্ধী”

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকেও আসিবার জন্য পত্র দিয়াছিলেন, তিনিও আসিতে পারেন নাই এবং সুরেশ গুপ্ত কর্ম্মকর্ত্তার নিকট পত্র দিয়াছিলেন, তাহা এই—

“কল্যাণবরেষু

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। নানা প্রকার কাজে ও অকাজে আমার যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা কাটিয়া

গিয়াছে, বানপ্রস্থ অবলম্বনের দিনও আমার বহুদিন গত। আমি এতদিন মানুষের মাঝখানটিতে ধূলা খেলাতেই আমার আসন কায়েম করিয়া নিশ্চিন্ত বসে ছিলুম। এমন সময় চরকার পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি আমায় বাইরে ডাক দিলে—আমিও সেই দিন থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়েছি। ফিরে যাবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিও নেই। জীবন সায়াহ্নে যে প্রেরণার তাড়নায় আমি খদ্দর বাণীর শুভ্র পতাকা হস্তে বাইরে বেরিয়ে পড়েছি সেই পতাকা হস্তেই যেন অন্তিমে তাঁর কাছে পৌঁছিতে পারি।

তোমরা আমায় ডেকেছ তোমাদের ওখানে যেতে কিন্তু সরস্বতী পূজার দিন দিঘীরপাড় জাতীয় বিদ্যালয়ে চরকা ও খদ্দর প্রদর্শনীতে আমায় উপস্থিত থাকতে হবে। তাঁদের কথা দিয়েছি, তাই আন্তবিক ইচ্ছা থাকলেও বরিশালে এবার যেতে পারলাম না। শ্রদ্ধেয় শরৎবাবু ও তাহার সহকর্ম্মীগণ চরকা রূপী বর্ত্তিকা যার উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলো অগ্রবর্ত্তী হয়ে ভারতকে স্বরাজ লাভের পথে মুক্তি রাজ্যের পথ দেখিয়ে চলবে—তাকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন, ইহা দূর থেকেও আমার হৃদয়ে আশা ভরসার সঞ্চার করে। অশ্বিনীকুমারের বরিশাল স্বদেশ-প্রীতি জাগরণের উদয়গিরি, কর্ম্মধারার উষ্ণ প্রস্রবণ, মহান ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সমস্ত বাংলা আজ উৎসুক নেত্রে বরিশালের দিকে চেয়ে আছে, আশা করি চরকা প্রীতির সুরধুনী ধারা বরিশাল বাংলার প্রাণের ভিতর দিয়ে বইয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে পূত করে তুলবে। ভরসা আছে দেশের একাগ্র

আশাকে বরিশাল নিষ্ফল ও নিরাশ করবে না। ভগবান তোমাদের প্রাণে বল দিন। ইতি— শুভার্থী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়”

শরৎকুমার সহকর্ম্মী সুরেশ গুপ্তকে লইয়া অসীম উদ্যমের সহিত অসহযোগ নীতির প্রচার করিয়া চলিলেন। দিনরাত্রি সুরেশ গুপ্তের সহিত কর্ম্মের পন্থা ও পরিচালনার আলাপ অলোচনা চলিতে লাগিল। সুরেশ বাবু শরৎকুমারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন শরৎবাবু আপনি আমার বন্ধু ও গুরু। দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও শরৎবাবুকে যে পত্র দিয়াছেন—তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে সে প্রীতি কত গভীর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ। এখানে দুইখানি পত্রের কিছু তুলিয়া দিলাম।

‘শ্রীশ্রীচরণকমলেষু ওঁ হরিজন বরিশাল—দশহরা

জয়যাত্রার এলোমেলো পথে একদিন দেখা, সে তীর্থে নয়, মন্দিরে নয়, সভাক্ষেত্রেও নয়, এক অব্যবসায়ীর দোকানে -সে চল্লিশ বছর আগের কথা।

দীর্ঘ বছরের অজস্র উপেক্ষা ঔদাসীন্য দূরত্বের মধ্যেও পরিচয়ের সূত্র ছিন্ন হয় নাই। ধর্ম্ম রাজনীতির টানা-হেঁচরায় কেহই হার মানি নাই।

পথ ফুরায় নাই, গতিও বন্ধ হয় নাই। বেহদের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সাক্ষ্য মিলিবে তাহার বৈশিষ্ট্যে আপনার প্রভাবকেই আমার বলিয়া অসঙ্কোচে বিলাইব।

বেহজম না হয় তারি জন্য আজিকার এই চিহ্নিত বিজয়া দিবসে পুনরায় আশীর্ব্বাদ চাওয়ার ইচ্ছা জাগিয়াছে। আপনার

স্নেহ আমার জীবনে জয়যুক্ত হউক এই প্রার্থনা।

দ্বিতীয় পত্র হরিজন বরিশাল—বিজয়া দশমী
১৩৬২

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

আপনার নিকট হইতে শোনা, পূজা বিজয়ার মধুর স্তব গুলির মূলধনের বলে ভাবিয়া, বলিয়া, সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োগের সন্ধান দিয়া তৃপ্তি পাই, গৌরব অর্জ্জন করি আবার অযোগ্যতা ভাবিয়া জ্বালা অনুভব করি—আশীর্ব্বাদ করুন, আমার কৃতজ্ঞ প্রণতি গ্রহণ করুন। ...প্রতি মাসে দেখা হয়—আমি দেখা দিতে পারি না—মনে মনে অনেক কথা বলি। হয় তো শোনেন। ...শ্রীভগবান আপনাকে সুদীর্ঘ জীবন দান করিয়া দেশকে উপকৃত করুন।

আপনার সুরেশ গুপ্ত

চরকা উৎসবান্তে শরৎকুমার গ্রামে গ্রামে প্রচারে বাহির হইলেন। সেই সময় দেশবাসী যে অভিনন্দন করিয়াছিল তাহার দুইখানা বরিশাল হিতৈষী হইতে তুলিয়া দিলাম

বাগধাবাসীবৃন্দের অভিনন্দন

মহাত্মন্,

এই গ্রামে আপনার শুভাগমন উপলক্ষে আমরা আমাদের সাদর সম্ভাষণ আপনাকে জানাইতেছি। হে ত্যাগি, আপনাকে অভিনন্দিত করিয়া আজ আমরা কৃতার্থ হইতেছি এবং হৃদয়ে অসামান্য গৌরব অনুভব করিতেছি। বাখরগঞ্জের উৎপীড়িত

ও অবজ্ঞাত নরনারীর দুঃখ ও মর্ম্মন্তুদ বেদনায় ব্যথিত হইয়া আপনি কঠোর দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন এবং সকল প্রকার ভোগ বিলাস ত্যাগ করতঃ দরিদ্র নারায়ণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। এমন কি স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। জগদ্বরেণ্য মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ যজ্ঞের তুমি হোতা। এই যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক রূপে তিনি আমলাতন্ত্রের আইনের কবলে পতিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় যজ্ঞ পণ্ড হইবার উপক্রম হইলে ভারতে যে স্বল্প কয়েকজন ব্যক্তি সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া সে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাদের অন্যতম।

বরিশাল-প্রাণ অশ্বিনীকুমারের তিরোধানে বরিশালের কর্ম্ম জীবনে আলস্য জড়তার প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হইতেছে। আপনি তাঁহার যোগ্য শিষ্য, সেই মহাপুরুষের আদর্শ আপনিই যথাশক্তি জীবন্ত রাখিয়াছেন। সকল প্রকার ভেদবুদ্ধি দলাদলি গণ্ডীমুক্ত হইয়া আপনি ভারতের রাষ্ট্রগুরুর বাণী চরকা খদ্দরের সাধনায় নিমগ্ন, আপনি অনশন ব্রত গ্রহণ করিবার ফলে ১৩২৭ সালে বরিশালে জনসাধারণ কর্ত্তৃক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপর দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার বাখরগঞ্জ জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বি, এম, ইনস্টিটিউসান তৎসঙ্গে যুক্ত করিয়া দেশবাসীর সমক্ষে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করেন। দুর্ভাগ্য বরিশাল রবি অস্তমিত হওয়ার কিছু দিন পরে উক্ত বিদ্যালয়ের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলে আপনি প্রাণপণ চেষ্টায় এক অবৈতনিক

বিদ্যালয় স্থাপন করতঃ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া বাখরগঞ্জের মুখ রক্ষা করিয়াছেন। আপনি দেশের মঙ্গলজনক বিবিধ কার্য্যে নিমগ্ন থাকিয়াও আপনার প্রিয় বেদান্ত চর্চ্চা বিস্মৃত হন নাই। আপনিই বরিশাল কন্‌ফারেন্সে স্বরাজের বৈদান্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বাংলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। আপনি প্রাণের সাধক, দেশের ও দশের কাজে তিল তিল করিয়া প্রাণ বিলাইতেছেন। মৌন কৃতজ্ঞতা ব্যতীত কিছু দেওয়ার যোগ্যতা আমাদের নাই। শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা আপনার সাধনা জয়যুক্ত হউক। ইতি— বাগধা সেবক সঙ্ঘ

মহাত্মন্,

আপনার সাথক জীবনের পূত চরিত্রের ও গুণাবলীর সমালোচনার স্পর্ধা রাখি না। যে সর্ব্বস্ব ত্যাগের আদর্শে বরিশাল তথা বাংলা আজ গৌরব প্রভায় সমুজ্জ্বল, যে নির্ম্মল দেশাত্মবোধ আত্মপ্রকাশ করিতেছে, আপনার তাপস জীবনের ভিতর দিয়া মহাপ্রাণের গৈরিক নিঃস্রাব—তেজোদৃপ্ত ওজস্বিনী ভাষা বাঙ্গালীর মৃত প্রাণে আনিতেছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রসর হইবার মহতী প্রেরণা। ক্ষুদ্র আমরা উপযুক্ত রূপ ধারণ করিতে পারি না। একটু দূর হইতে ভক্তি ভারাবনত প্রাণের অকিঞ্চিৎকর পূজা নিবেদন করিতেই যেন আমাদের অধিকার বলিয়া মনে হয়। আপনার দর্শন ও সান্নিধ্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইব কল্পনা করিতেই পারিতাম না, তাহা আজ বাস্তবে পরিণত দেখিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে হর্ষ বিভোর প্রাণে ভাবিতেছি

—কোথায় আলো কোথায় মালা কোথায় আয়োজন।
রাজা আমার দেশে এলো কোথায় সিংহাসন?

ভাষা নাই সে অভাব বোধের দৈন্য প্রকাশ করিতে পারি? শুধু বলিতে চাই কাঙ্গাল বিদুরের ক্ষুদ সেই কাঙ্গাল-শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনি ত্যাগে ব্রাহ্মণ—আপনার অর্চ্চনা অর্ঘ্য সাজাইতে আছে শুধু মুগ্ধ প্রাণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি। আপনি তেজে ক্ষত্রিয়; আপনার সম্মান করিব কেমন করিয়া জানি না; দেশের স্বার্থ দেশের মঙ্গল কামনায় আপনি বৈশ্য, আপনার দীর্ঘ জীবন ও কর্মশক্তির চির নবীনতা প্রার্থনা করি মঙ্গলময়ের শ্রীচরণে।

অতি নগণ্য, শক্তিহীন সেবক আমরা আপনার সত্যপূত দেশপ্রেম প্লাবিত মহাপ্রাণের নিকট এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান যাহাতে সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। আপনার বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তব্যের গুরুত্বে, মহত্ত্বর বিস্তার মধ্যে আমরা বিস্মৃতির কৃষ্ণ যবনিকা অন্তরালে অচিরেই স্থান পাইব ইহাই আমাদের ধারণা। আবার মনকে সান্ত্বনা দিয়া বলি "ঐ মহৎ হৃদয়ে বুঝি আমাদের জন্যও একটু স্থান আছে। অমন প্রাণে স্থানাভাব নাই"।

১৩৩২ সনের আষাঢ় মাসে মহাত্মাজী বরিশাল আসিলেন। যেদিন তিনি আসিবেন সে দিন শরৎবাবু আকুল ভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি যাঁহাকে শ্রীনিত্য গোপালের দ্বিতীয় কলেবর হিসাবে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন

এবং তাঁহার ঠাকুরের গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের সমন্বয় আদর্শই জাতিগত ভাবে বাস্তবের ক্ষেত্রে যাহার ভিতর দিয়া তিনি স্ফুরিত হইতে দেখিয়া তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছেন অথচ তাঁহাকে তিনি কখন দেখেন নাই, একবার মহাত্মাজী বরিশাল আসিয়া শরৎবাবুর বাসায় গিয়াছিলেন, তখন তিনি জেলে ছিলেন, আজ সেই মহাত্মাজীকে দেখিবেন, সে দেখা যেন মধুর হয় ইহাই ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহাত্মাজী যখন লঞ্চ হইতে নামিলেন তখন এত ভিড়, দূর হইতে দেখিয়া প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া বাসায় ফিরিলেন। তিন ঘণ্টা কাল স্টীমার ঘাটে মহাত্মাজীকে দেখিবার অপেক্ষায় থাকিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে ভাবে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষরা চক্রব্যূহ রচনা করিয়া মহাত্মাজীকে লইয়া গেলেন তখন আর ঠেলাঠেলি করিয়া মহাত্মাজীর সহিত দেখা করা সম্ভব হইল না। বৈকালে খবর আসিল মহাত্মাজী আপনাকে ডাকিতেছেন। যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া শ্রীনিত্যগোপালকে প্রণাম করিয়া বলিয়া গেলেন, আমি মহাত্মাজীকে দেখিতে যাইতেছি, তাঁহার ভিতর দিয়া যেন তোমার স্নেহ-স্পর্শ পাই। অশ্বিনীবাবুর বাড়ীর দরজায় বহু বাধা প্রাপ্ত হইয়া তিনি মহাত্মাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। মহাত্মাজী তখন সূতা কাটিতেছিলেন। শরৎবাবুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, স্টীমার ঘাটে কেন দেখা হয় নাই? শরৎবাবু

বলিলেন আমি সব সময়েই তো স্টীমার ঘাটে উপস্থিত ছিলাম; যখন আপনি অশ্বিনীবাবুর বাসার সামনে পৌছেন তখন বেলা ১২টা তখন আর দেখা করা সঙ্গত মনে করি নাই; মহাত্মাজী আবার হাসিয়া বলিলেন তোমার বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি নালিশ আছে, উত্তর দিতে হবে। শরৎবাবু বলিলেন আমি চুপ করিয়া শুনিব, একটাও জবাব দিব না। সেই সময় কর্ম্মী সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য মহাত্মাজীর আহ্বান আসিল, তিনি তখন উঠিয়া বলিলেন আচ্ছা চল, সেখানে চুপ করেই বরং শুনিবে। চলিতে চলিতে মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করিলেন দুই পক্ষে তোমাদের কোথায় বিরোধ? শরৎবাবু কোন কিছু বলিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সভার কর্ম্ম হইয়া গেলে মহাত্মাজী আসল ব্যাপার জানিবার জন্য শরৎবাবুকে লইয়া উপরের ঘরে গেলেন।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শরৎবাবুর নামে বহু অভিযোগ মহাত্মাজীর নিকট উত্থাপিত হয়। মহাত্মাজী শরৎবাবুর সহিত দেখা যাহাতে না করিতে পারেন সে চেষ্টাও তাহারা করেন, কিন্তু মহাত্মাজী বার বার শরৎবাবুর সহিত দেখা করিতে চাওয়ায় তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠান হয়। দ্বিতলে বসিয়া প্রায় ৪৫ মিনিট মহাত্মাজীর সহিত শরৎবাবুর আলোচনা হয়। মহাত্মাজী আহার করেন ও শরৎবাবুর সহিত গল্প করেন, দুইজনে এত নিকটে বসিয়া আলোচনা করেন যে দূর হইতে কেহই তাহাদের আলোচনা শুনিতে পায় নাই। আলোচনা করেন

এই—"গান্ধীজী বল্লেন ব্যাপার কি? শরৎবাবু বল্লেন মহাত্মাজী এই বিরোধ নীতির উপরে। ওরা বিশ্বাস করে যে কোন উপায়েই হোক গন্তব্য স্থলে পেঁছানো দিয়ে কথা। কিন্তু আমি বলি যে উপায়ই গন্তব্য স্থলের নির্দ্দেশ দিবে। সত্য ও অহিংসা বাদ দিয়ে স্বরাজ আমি বুঝি না। ভারতবর্ষের মত বহু জাতি, বহু ধর্ম্মের দেশ, রক্তপাতের ভিতর দিয়ে স্বরাজ লাভ করতে পারে এ বিশ্বাস আমার নেই। মহাত্মাজী হেসে বল্লেন 'ঠিক'। আরও বললেন আচ্ছা চরকা দিয়েও ঐক্য আনা যেতে পারে। শরৎবাবু বল্লেন ওরা কি চরকাকে প্রাণ খুলে বিশ্বাস করেন? আপনার কথামত কংগ্রেস কমিটির কয়জন আধঘণ্টা করে সূতা কাটেন? আর স্বরাজ সেবক সঙ্ঘের কয়জন কাটে না একবার জানুন। মহাত্মাজী বল্লেন ওরা চরকায় সূতা কাটে না একথা সার্ব্বজনীন সত্য নয়। শরৎবাবু বল্লেন একথা সার্ব্বজনীন না হতে পারে, সাধারণতঃ ইহাই সত্য। ওরা চরকাকে exploit কচ্ছেন। চরকার কথা না বললে সমাজে দাঁড়ানো যায় না, তাই চরকার প্রতি টান। চরকার অর্থ গ্রাম ও জনসাধারণ মনোবৃত্তি। কাউন্সিল অর্থ শহর ও শ্রেণী মনোবৃত্তি। এই দুই পরস্পর বিরোধী রাজনীতি কেমন করিয়া একযোগে কাজ করতে পারে? মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা কল্লেন—আচ্ছা তোমার স্বরাজ সেবক সঙ্ঘের কাঠামো কি? শরৎবাবু বল্লেন 'ওখানের কাঠামো শক্ত—এক পরিবারের ভিতরে পিতাপুত্র ভাইভাই কোন ভোটের আশ্রয় না নিয়েও কার্য্য পরিচালনা করেন, আমরা এই রকম

কাঠামোকে আদর্শ বলিয়া মানি। আপনি লিখেছেন গভর্ণমেণ্ট অস্ত্রের সাহায্যে যাহা করেন, আমরা ভালবাসা দিয়ে তাহা করি। আপনি কাঠামোকে শক্ত না করার ফলে যত রকমের দুর্নীতি এর ভিতর প্রবেশ করেছে, আমি আপনার অহিংসা, অসহযোগ, হিন্দুমুসলমান মিলন ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সবই বেদান্ত ও ভাগবত আলোকে বুঝি কিন্তু বর্ত্তমান কংগ্রেস কমিটী বুঝি না। মহাত্মাজী বল্লেন এর প্রমাণ দিতে পার? শরৎবাবু বল্লেন ব্রিটিশ আদালতে যেমন ভাবে প্রমাণ দিতে হয় তেমন প্রমাণ দিতে পারব না। কিন্তু সেখানেও দণ্ডবিধি আইনে এমন সব ধারা আছে যার প্রমাণ জন সাধারণের impression মাত্র, তেমন সাক্ষী দশ হাজার উপস্থিত করতে পারি। মহাত্মাজী, আমি রাজনীতিতে ছিলাম না; যখন দেখলাম যে ভাগবত ও রাজনীতি এক হয়ে গিয়েছে, তখনই এর মাঝে ঝাঁপ দিয়েছি। এই সময়ে খাবার এল, মহাত্মাজী খাবার খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার স্বরাজ সেবক সঙ্ঘের কার্য্য কি? শরৎবাবু বল্লেন—'নূতন কিছুই নয়, আপনি যা দিয়েছেন তাই আমরা সরল প্রাণে কার্য্যে পরিণত করতে চেষ্টা পাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি চরকাই একমাত্র গণতন্ত্রের প্রতীক। শুধু ভারতবর্ষ কেন, ইংলণ্ড, ফ্রান্সকেও গণতন্ত্র হতে হলে চরকার শরণ নিতে হবে। মহাত্মজী বল্লেন—খুব ঠিক কথা। শরৎবাবু বল্লেন—বিরোধের মূল কারণ অসরলতা। হিংসায় বিশ্বাস কর, প্রকাশ্যভাবে তাহাই বল, চরকায় পুরা-

পুরি বিশ্বাস নাই, তাহাই জন সমাজে প্রচার কর। এর মধ্যে জাতীয় বিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। শরৎবাবু বল্লেন, এই দেখুন না ওরা ব্রজমোহন জাতীয় বিদ্যালয়কে পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ওরা ঘোষণা করেছেন দেশ জাতীয় বিদ্যালয় চায় না। আমার অপরাধ আমি কেন জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত করলাম। ১২ দিনের উপবাসের পর শ্রীগুরুদেব ও আপনার আশীর্ব্বাদে জাতীয় বিদ্যালয় পেয়েছি। স্বরাজ সেবক সঙ্ঘ না থাকলে আপনার চরকা থাকত না এ স্থির জানবেন। মহাত্মাজী জিজ্ঞাসা করলেন ছেলের সংখ্যা কত? শরৎবাবু, পঁচিশ। গান্ধীজী বল্লেন সংখ্যার জন্য ভেবো না, আদর্শ ঠিক রাখ। কয়জন শিক্ষক? শরৎবাবু, পাঁচজন এবং একজন তাঁত শিক্ষক। গান্ধীজী বল্লেন কেন সব শিক্ষকই তাঁতে দক্ষ নন কেন? জাতীয় বিদ্যালয়ের সব শিক্ষকই দক্ষ চাই। আরও বল্লেন ওরা বলেন, দুর্গামোহন সেন তোমার 'দুষ্ট বুদ্ধি দাতা'। শরৎবাবু বল্লেন—দুর্গামোহনবাবু আমাকে ভাল-বাসেন। যদি তিনি আমাকে কখনও মন্দ উপদেশ দিতেন বা কার্য্যে বাধা দিতেন তবে তাঁর সঙ্গে আমার থাকা হত না। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের সময় তিনি সাহস পান নি কিন্তু বাধাও দেননি, যতটুকু পারেন সাহায্য করেছেন। মহাত্মাজী! জেনে রাখুন শ্রীগুরুদেব ব্যতীত আমাকে চালাবার অধিকার কারুর উপরেই রাখিনি। আমার বল ভরসা সবই তিনি আমার বিরুদ্ধে হয়ত ওদের বলবার কিছু নেই তাই দুর্গামোহন

বাবুর হাতের পুতুল বলে যতটুকু খাটো করা যায় ততটুকুই লাভ। এরপরে শরৎবাবু বল্লেন, মহাত্মাজী, আপনি কি বুঝতে পাচ্ছেন না যে আপনার গান্ধীবাদ আজ বাংলা দেশে বিপন্ন? মহাত্মাজী বল্লেন, আমি তা মনে করিনা। শরৎবাবু বল্লেন যতটুকু দেখছেন তা আপনার নোচেঞ্জার ভক্তবৃন্দ বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করেছেন। মহাত্মাজী বল্লেন তা আমি অনুভব কচ্ছি। শরৎবাবু তৎপরে বল্লেন—আপনার এক নো চেঞ্জার ভক্ত ময়মনসিংহের শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ মৈত্রেয় সেদিন আমার নিকট এক পত্র দিয়েছেন যে মহাত্মা নো চেঞ্জারদের জন্য কিছুই কচ্ছেন না। তদুত্তরে মহাত্মাজী বল্লেন, আমি তোমাদের জন্য কিছুই করিব না—ভগবান যেমন আপন জনের জন্য কিছুই করেন না বরং লাঞ্ছনাই করেন মহাত্মাজী ঠিক এইভাবেই কথাটি বল্লেন বলে আমার মনে হল। শরৎবাবু বল্লেন গান্ধীবাদ আমার সাধনার জিনিষ, প্রয়োজন হলে গান্ধীবাদ রক্ষার জন্য গান্ধীজীর সঙ্গে লড়াই করব। মহাত্মাজী পরমানন্দে বল্লেন 'যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর'। শরৎবাবু বল্লেন, মহাত্মাজী আপনি কেবল উপর নীতি নিয়ে আছেন, তাই আপনার পক্ষে উদার হওয়া সহজ, আমরা প্রকৃত ক্ষেত্রে কাজ করি, সমস্ত ঘটনায় থাকি আমাদিগকে তত উদারতার জন্য পীড়াপীড়ি করলেও তা আমরা মানতে পারি না। মহাত্মাজী বল্লেন—আমি আর বেশী বাধা দিব না, আমি হরদয়াল বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, তুমি বরং আরও স্পষ্ট হও। এর পরেই মহিলা সভায় যোগদান করিবার জন্য তাগিদ

এল। শরৎবাবু তাঁর পায়ে হাত ঠেকিয়ে বল্লেন আপনি আশীর্ব্বাদ করুন। মহাত্মাজী বল্লেন—খুব আশীর্ব্বাদ করছি। তৎপর শরৎবাবু চলিয়া গেলেন।" —বরিশাল হিতৈষী।

পরের দিন ৯টায় মহাত্মাজী শরৎবাবুর বাসায় গেলেন এবং একাকী শরৎবাবুর গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রায় ৪০ মিনিট কাল নানাবিধ আলোচনা ও কৌতুক আদি করিলেন। শরৎবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যব্রত নিজে সূতা কাটিয়া কাপড় বুনিয়া মহাত্মাজীকে দিয়াছিল। মহাত্মাজী যাইবার সময় শরৎবাবুর দাদা প্রসন্নকুমারবাবু বলিলেন আপনি আমার ভাইকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। মহাত্মাজী হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ভাই তো আমার সহিত লড়াই করিতে চায়"।

"সেইদিন বৈকালে মহাত্মাজী বরিশাল হইতে যাইবার সময় সকলের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। সেই সময় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রশ্ন হয়, স্বরাজ সেবক সঙ্ঘের জন্য আমাদের কাজের অসুবিধা হইতেছে। তাহাতে মহাত্মাজী বলেন, না না, তাহা নিশ্চয়ই হইতে পারেনা, আমি শরৎ-বাবুকে বিশেষভাবে বিশ্বাস করি। তাঁহার চরিত্র, তাঁহার ত্যাগ মহান, তিনি খাঁটি অসহযোগী, কারাবরণ তিনি করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা তাঁহাকে বলা হইয়াছে এবং পত্র লিখিয়াও জানান হইয়াছে; তিনি তাহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা পাইয়া আমি আর তাহাকে কোন দোষ দিতে পারি না। তাঁহার লিখিত পুস্তক

আদি দেখিয়া বুঝিলাম তিনি পণ্ডিত বটেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথাই শুনিলাম, এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য বিস্তারিত না শুনিয়া আমি তাঁহাকে দোষী বলিতে পারিব না বা তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মত প্রকাশ করিতে পারিব না, তিনি কোন প্রকার যথেচ্ছামূলক কার্য্য করেন না এ বিশ্বাস আমার আছে। স্টীমার ছাড়িবার সময় সবাই মহাত্মাজীকে প্রণাম করিলে তিনি শরৎবাবুকে বলিলেন—তোমার সহিত আমার অনেক পত্রালাপ করিতে হইবে।" —বরিশাল হিতৈষী।

বরিশালের কংগ্রেস কর্ম্মীরা মহাত্মাজীর নিকট শরৎ-ঘোষের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তুলিয়া ছিল, তাহার মধ্যে একটি অভিযোগ ছিল শরৎবাবু বারবনিতাদের বাড়ী যাইয়া গীতা ভাগবত পাঠ করেন, তাহাদিগকে দিয়া চরকা কাটান ইত্যাদি। তাহাতে মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন 'উহা শরৎঘোষেই সম্ভব অন্য কেহ যেন সে পথের অনুসরণ করিতে না যায়। শরৎঘোষের চরিত্র সম্বন্ধে মহাত্মাজীর এতখানি বিশ্বাসই ছিল। শরৎকুমার সাধনা হিসাবে অসহযোগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সেবা বুদ্ধি ছাড়া কর্ম্মের ভিতর অন্য কোন অভিসন্ধি ছিল না, তাই তিনি কংগ্রেসের সভ্য না থাকিয়াও দেশ-মাতার সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সে দিন বলিয়াছেন "অশ্বিনীকুমারের বরিশালের বুকের ভিতর যে শক্তি ভগবান দিয়েছেন, তা দিয়ে সে বাঙ্গলার সেবা করতে সক্ষম—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। বরিশালের বুকে দাঁড়িয়ে, বরিশালের

অন্তরাত্মাকে সঙ্গে রেখে ক্ষুদ্র এই প্রতিষ্ঠানটী বাঙ্গলাময় তার সেবা-ক্ষেত্র ফুটিয়ে তুলতে চায়। সমস্ত দেহ অসার হ'য়ে এলেও ক্ষুদ্র একটি জীব-কোষ জীবনালোক ধরে রেখে নিস্পন্দ দেহে স্পন্দন ফিরিয়ে আনে; ভারতবর্ষে স্বরাজ-সেবক সঙ্ঘ অতি ক্ষুদ্র, তথাপি সত্য আন্দোলনকে বুকে করে জাতির আত্মচেতনা লাভের পথে রামচন্দ্রের সেতু বন্ধনে ক্ষুদ্র কাঠ-বিড়ালীর মত সে কথঞ্চিৎ সাহায্য করতে চায়"। এই ছিল কর্ম্ম করিবার মূলে তাঁহার প্রেরণা।

১৩৩২ সনের ভাদ্র মাসে রাধাষ্টমীর দিন শরৎবাবু 'উজ্জ্বল ভারত' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিলেন। বাস্তবের সহিত আদর্শকে সমন্বিত করিয়া যে বেদান্ত তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রচার করিতেছিলেন, তাহাই উজ্জ্বল ভারত অবলম্বনে দেশবাসীর নিকট লিখিতভাবে উপস্থাপিত করিতে লাগিলেন। পত্রিকার প্রচুর গ্রাহক হইল, বিজ্ঞাপন ব্যতিরেকেই পত্রিকা চলিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে অনেক ব্যবসায়ী শরৎবাবুর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার জন্য সাধাসাধি করিয়া ছিল, শরৎবাবু তাহা গ্রহণ করেন নাই। সেই সময় উজ্জ্বলভারত পত্রিকার গ্রাহকগণের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা এখানে তুলিয়া দিলাম, কেননা তাঁহার নূতন যুগের নূতন কথা আজও যেমন মানুষ ধরিতে পারিতেছে না, সে দিনও পারে নাই—

উজ্জ্বল ভারতের পাঠকবর্গ সমীপে

"আমার যে সকল আপন জন উজ্জ্বলভারতকে স্নেহের চক্ষে দেখে এর গ্রাহক হয়েছেন, তাঁদের অনেকে উজ্জ্বলভারত বুঝতে অসুবিধা বোধ কচ্ছেন, একথা নানা মুখে আমার কাছে এসেছে। আমার প্রাণের যে কথাগুলোকে এতদিন বুকের ভিতর চেপে রেখে বাঙ্গলাময় ছুটে বেড়াচ্ছিলাম তাকে সুহৃদ্-বর্গের নিকটও খুলে বলতে না পারার জন্য আমি নিজে মনো-বেদনা বোধ কচ্ছি। আমি নিরুপায়। অসুবিধা যে বাস্তবিক কোথায়, তা আমি নিজের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পাচ্ছি। অসুবিধার মূল কারণ দূর না করে তাকে কেবল বাইরে একটা প্রলেপ দিয়ে বোঝবার মত করতে পারতাম; কিন্তু তাতে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হত! ভাষা সরল কি কঠিন, তা নিয়ে বোধহয় তত অসুবিধা হয় নি। আমার কোন সুহৃদ্ ঠিকই বলেছেন অসহযোগের কথা বলতে বলতে হঠাৎ দাক্ষা-য়ণীর কথা, রাধার কথা এসে পড়লেই বুদ্ধি যেন কেমন ওলট পালট হয়ে যায়, তখন আর সূত্র ঠিক রাখতে পারি না। বুঝি আর না বুঝি, তবুও যেন "দাক্ষায়ণী বুঝেছি" ব'লে একটা যে কোন রকমের সংস্কার আমাদের আছে; সংসারের বাইরের খোলসটাকে কোন রকমে আমাদের মনের মত করেই বেশ আরামে আছি বা সংসার তত্ত্ব বোঝা হয়েছে। সব জিনিষই যে ভাষা ভাষা দেখতে শিখেছি, এ বোধ আমাদের নেই। দাক্ষায়ণীও বুঝিনি, সংসারের সমাজ-নীতি, রাজনীতি প্রভৃতিও বুঝিনি। সংসারকে

বেদান্ত-ভাগবত থেকে আলাদা করে রেখেছি, বেদান্ত-ভাগবতকে সৃষ্টি ছাড়া ক'রে তাকে বনবাস দিয়েছি; এই বনবাসী বেদান্ত ভাগবতকে ও তার অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী উমারাণীকে গৃহস্থালীর মাঝে পরিপূর্ণ "আমি"র মূর্ত্তিতে ফিরিয়ে আনবার জন্যই উজ্জ্বলভারতের সাধনা; যা মনের দুঃখে গিয়েছিল বনে, তাকে মনের অন্তঃস্তলে পূরে রাখবার জন্যই উজ্জ্বলভারতের প্রয়াস; এর মূল মন্ত্র "মনে বনে এক করি মানি"। এই সংসারের চক্রব্যূহে যারা অভিমন্যুর মত প্রবেশ করতেই জানেন, বের হবার কৌশল যাদের শেখবার সৌভাগ্য হয় নি, নিশ্চয় মৃত্যুর হাত থেকে তাদের উদ্ধার করবে কে?

আজ যে বোঝবার ও বোঝাবার অসুবিধা হচ্ছে তারও একমাত্র কারণ গৃহের মাঝে ঐ আপনা আপনির ঝগড়া। বেদান্ত-ভাগবত মানবাত্মার অস্তিত্ব প্রদান করবে, রাজনীতি, সমাজনীতি হবে তারই অর্দ্ধাঙ্গিনী; এদের বিরোধে আমরা আজ সব রকমে শ্মশানের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। এই যুগল মিলনের পথে দূতির সাধনা গ্রহণ করবার লোভ জেগেছে আজ এই উজ্জ্বলভারতের। যে মন দিয়ে আমরা সংসার করি ও যে মন দিয়ে ধর্ম্ম করি, সেই দুই আলাদা মনকে এতদিন আলাদা রেখেই সংসারে চলতে অভ্যাস করেছি। ঠাকুর ঘরে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে যে আমরা একই মানুষ—এ তত্ত্ব ত কেউ তেমন ক'রে আমাদের সামনে ধরে নি। হয় আমরা সংসারের বাঁধা পথে, নয় ধর্ম্মের বাঁধা পথে, নয় ত কখনও বা সংসারে

কখনও বা ধর্ম্মে বিচরণ করছি। ঘরে বাইরে দুইজন হ'য়েই আমরা যে ব্যবসায়বুদ্ধি শূন্য, প্রতি পদে তার পরিচয় দিচ্ছি। ঘর যদি ঠিক থাকত, বাইর ঠিক হত, আবার বাইর যদি ঠিক থাকত ঘরও ঠিক হত। কোন একটির উপর বেশী জোর বা কোন একটি আগে ধরে নিলেই বিপদ। যেখানে দাঁড়িয়ে ঘর ও বাইর দুইয়ের সংস্কার একই সাধনায় সম্ভব হবে, সেই ক্ষেত্রের সহিত পরিচিত হওয়াই উজ্জ্বল ভারতের সাধনা। সংসার করতে হ'লে লক্ষ্মীর কৃপা চাই, অথচ ঠাকুর ঘরে বসে সেই লক্ষ্মীর বীভৎস মূর্ত্তি কত রকম বিনায়ে বিনায়েই না অঙ্কিত কচ্ছি! বিষ্ণুর স্তর থেকে দেখলে লক্ষ্মী বৈষ্ণবতার জননী; সেই বিষ্ণুর ক্ষেত্রের সহিত পরিচয় না হ'লে কিছুতেই সংসার-আশ্রমে লক্ষ্মী ফিরে আসবে না। বিষ্ণু না থাকলে সংসার করতেও যে গোল লাগবে; বিষ্ণু যে আমার practical necessity। ধর্ম্মও ত নাই। ধর্ম্ম থাকলে পুলিশের ভয়, উপবাসের ভয় আমাদিগকে এত তাড়া করতে পারত না। যে মন দিয়ে সংসার করি, ও যে মন নিয়ে ধর্ম্ম সাধনা করি সেই দুই ফাঁকা মনের পিছনে যে বাস্তব ভারতীয় একটী উজ্জ্বল মন রয়েছে, সেইখানে বিশ্রাম লাভ করেই ভারত স্বরাট্ হবে। ভারত ঋষির দেশ; ঋষির রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে; সেই রক্তের স্বাদ ফিরে না পেলে সিংহের গর্জ্জন ভারতের হৃদয় থেকে আর বেরোবে না। ঋষি-রক্তে রঞ্জিত হয়েই উজ্জ্বল ভারত চির-উজ্জ্বল রবে। প্রবন্ধের মাঝে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার ক'রে অসুবিধা

আরও বাড়িয়ে দিচ্ছি, কিন্তু ঐ বাক্যগুলিই যে ঋষি রক্তের বাহিরের বিকাশ, আমাদের আত্মার খাদ্য। কেমন ক'রে রাধানীতি ও রাজনীতিতে মেশামিশি হলো, সেই সূত্রটীকে ধরবার জন্য শাস্ত্র থেকে সূত্রাদির অবতারণ করি। বেদান্ত-ভাগবতের পারিভাষিক শব্দগুলির রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্যবহার হ'লে সে গুলোর 'একঘরে' দোষ কেটে যাবে, এই আশায় ইচ্ছা করেই ওগুলি ব্যবহার করি। অসুবিধা হচ্ছে আলোচনার বিশেষ ধারা নিয়ে; সে ধারাকে এর চেয়েও সরল সহজ ভাষায় ব্যক্ত করতে পারলে তার জন্যও যথেষ্ট প্রয়াস পাব। প্রাণ-প্রিয় বন্ধুগণ, কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে একটু মন দিয়ে আলোচনার সহিত যুক্ত থাকুন, অচিরাৎ আমার প্রাণের কথাগুলি তাদের গোচর করাতে সক্ষম হব। আমি তাদের ধৈর্য্য কিছুদিনের জন্য ভিক্ষা চাচ্ছি।

আর কয়েক জন বন্ধু উজ্জ্বলভারতে বিজ্ঞাপন নেবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ক'রে পত্র লিখেছেন। তাদের উদ্দেশ্য পত্রিকাটী দীর্ঘকাল স্থায়ীভাবে রক্ষা করার পাকা বন্দোবস্ত করা; বিশেষতঃ বিজ্ঞাপন নিলে কিছু সস্তাও করা যেত। তারা আমায় ভালবেসেই এ অনুরোধ জানিয়েছেন, কিন্তু ঐ পন্থা অবলম্বন করলে আমার উদ্দেশ্য হানি হবে এই আশঙ্কায় আমি ঐ পথে যেতে পারিনি। ব্যবসায়ের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে অনেক দূর এসেছি, প্রাণের ব্যবসায় যদি চলে তবে চলতে পারে, নচেৎ ব্যবসায়-অনভিজ্ঞ আমার দ্বারা উজ্জ্বল

ভারত চালান হয়ে উঠবে না। প্রথম কথা আমার পত্রিকার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পত্রিকার পাঠকদের সঙ্গে, তারা যদি না পড়েন তবে বিজ্ঞাপন দাতাদের অর্থ দিয়ে পত্রিকা রেখেই বা লাভ কি? যাদের জন্য মুখ্যতঃ পত্রিকা, তারাই পত্রিকার দায়িত্ব বহন করবে এবং তাহাই পবিত্র। আমার অর্থ থাকলে বিনা পয়সায় ছড়িয়ে দিতাম। অর্থের জন্য বিজ্ঞাপন দাতার শরণ নিলে মূল গ্রাহকদের সঙ্গে পাছে মলিন, গৌণ ও অবহেলার সম্বন্ধ এসে দাঁড়ায় তাই ও পথে যেতে আমি আদৌ রাজী নই। কোথায় বিজ্ঞাপন দাতা খুঁজে বেড়াব! খুঁজতে হয় প্রাণের মানুষ খুঁজব, যারা প্রাণের কথা শুনতে ভালবাসে। যারা অর্থ দেয় তারাই হয় বাস্তব মালিক; পত্রিকার বাস্তব মালিক হওয়া উচিত গ্রাহকবর্গের। আমি চিরকাল সাক্ষাৎ ভজন ভালবাসি। আর্থিক দুই এক টাকা লাভের জন্য বিজ্ঞাপন দাতাদের কাছে গ্রাহকবর্গের স্থান খাট করতে চাই না। পত্রিকার সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রাহকবর্গের। দ্বিতীয় কথা, আদর করে পত্রিকা না পড়লে সে পত্রিকার প্রয়োজনীয়তাও নেই; বাঙ্গলাদেশে ত পত্রিকার অভাব পূরণের জন্য উজ্জ্বলভারতের সৃষ্টি হয়নি। যে ভালবাসা আমি বাঙ্গলা দেশে পেয়েছি, সেই ভালবাসার উপর ভিত্তি ক'রে উজ্জ্বলভারত বের করেছি! আমার স্নেহ পরায়ণ বন্ধুগণ তাদের সম্পত্তি জ্ঞানে এই উজ্জ্বলভারত রক্ষা করবেন, এর প্রসারের জন্য প্রাণ দিয়ে খাটবেন, ইহাই তাদের প্রাণের সামনে আমার কাতর প্রার্থনা। বন্দেমাতরম্ ১৩৩২, ১৯শে কার্ত্তিক"

শরৎকুমারের চিন্তাধারা এবং তাঁহার হৃদয়ের সহিত পরিচিত হইবার সাহায্য করিবে তাঁহার এইসব লেখা, সেই জন্যই ইহা তুলিয়া দিতেছি। স্বরাজ সেবক সঙ্ঘের আদর্শ প্রচারে শরৎবাবু প্রায়ই বাহিরে থাকিতেন, বরিশালের কাজ-কর্ম্ম সুরেশ গুপ্ত মহাশয়ই চালাইতেন। এমন সময় ১৩৩৩ সনে কলিকাতায় মস্‌জিদের সামনে দিয়া রাজ-রাজেশ্বরী প্রতিমা বিসর্জ্জন দিবার জন্য লইয়া যাইবার কালে মুসলমান কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া হিন্দু মুসলমানে বিরোধ হইল, উহাই সারা বাঙ্গলায় ছড়াইয়া পড়িল। মুসলমান হিন্দুর আদর্শকে আঘাত হানিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, হিন্দুর বিগ্রহ, হিন্দুর প্রতিমা নষ্ট ও হিন্দুনারী হরণ তাহাদের নিত্যকার্য্য হইয়া উঠিল। পাবনা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে অমানুষিক অত্যাচার হইতে লাগিল। সেই সময় হিন্দু জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী কলিকাতা হিন্দুপল্লী রক্ষা মণ্ডলী নামে এক সমিতি স্থাপন করিয়া সেই সমিতির কার্য্যভার শরৎবাবুর উপর অর্পণ করিলেন। সেই সময় হিন্দুরক্ষা নামে এক বিজ্ঞপ্তি বিলি হইয়াছিল তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে শরৎবাবুর কর্ম্মধারা একই প্রবাহে নূতন নূতন পরিস্থিতে প্রবাহিত হইয়াছে।

হিন্দুরক্ষা

"পাবনার বিপদ হিন্দুর বিপদ, সমগ্র হিন্দুস্থানের বিপদ। পাবনা বলিয়া দিতেছে হিন্দু কত নিরাশ্রয়, আত্মশক্তিতে তার কত অনাস্থা। হিন্দু যদি এখনও আত্মশক্তির উদ্বোধনে দৃঢ় সঙ্কল্প

না হয়, তাহাকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইতেই হইবে। হিন্দু তার বেদ বেদান্ত, তার জগদ্বিজয়ী আধ্যাত্মিকতার গর্ব্ব করেন, কিন্তু সে গর্ব্ব করিবার অধিকার তার আর আছে কি? সে যদি অধ্যাত্মবলেই বলী, তবে কেন সে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে "আত্মন্যেবাত্মনাতুষ্ট" হইতে পারিল না? কেন সে আজ শূন্য পথের পথিক? তার শাস্ত্র, তার সাধনা কি তাকে আত্মরতি, আত্মানন্দ, স্বরাট্ হইবার উপদেশ দেয় নাই? যেদিন থেকে হিন্দু আত্মা বলিতে পরিবার, সমাজ ও জাতি বর্জ্জিত আত্মা বুঝিয়াছে, যেদিন ধর্ম্ম ও সংসারের মাঝে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়িয়া পরস্পরের মিলনসূত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, সেদিন থেকে ধর্ম্মও গিয়াছে, সংসারও ডুবিয়াছে। আজ চাই সেই স্রোতকে ফিরাইয়া হিন্দুর যথার্থ শিক্ষা, সভ্যতা ও মুক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত করা।

ভারতের আদর্শ রাজর্ষি জনক। জনক ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী ও কৃষক একাধারে, কৃষি বর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান আজ নিরাশ্রয়, কৃষিক্ষেত্র হিন্দুর হাতছাড়া; এই লুপ্ত কৃষিক্ষেত্রকে আবার উদ্ধার করিতেই হইবে। যুবকদল যাহাতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কৃষি অবলম্বনে নিজ নিজ ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে পারে এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকে যাহাতে স্বল্পহিন্দু পল্লীতে কৃষকরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায় তজ্জন্য দৃঢ় পণ আবশ্যক। জাতির হৃদয় ঐ অস্পৃশ্যকুল ও পল্লীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঐ নারীশক্তিকে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দান হিন্দুর মহাসাধনা। এইভাবে সবল দেহ, সুস্থ মন ও অধ্যাত্ম

বীর্যের সমন্বয়ে হইবে হিন্দুর উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য আত্মশক্তির উদ্বোধন। পাবনাকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র বাঙ্গলায় এমন একটি সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে, যাহা হইবে আর্য্যশিক্ষা, আর্য্য-সভ্যতা ও আর্য্য-সাধনার জীবন্ত বিগ্রহ। এজন্য চাই সাধক কর্ম্মী ও দীন-দরিদ্র জনসাধারণের পবিত্র "বিদুরের খুদ"। খুদ ভগবানের লোভনীয়। বাঙ্গলায় এই সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে অন্ততঃ পাঁচশত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবক সাধক ও প্রারম্ভিক ব্যয় বাবদ একলক্ষ টাকার প্রয়োজন। চাই সাধকের সেবা-উন্মুখ প্রাণ ও প্রাণ-মাখানো সাত্ত্বিক অর্থ। বাঙ্গলা চিরদিনই প্রাণের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। আমরা বাঙ্গলার দ্বারে দ্বারে এই খুদ সংগ্রহ করিব। সংগৃহীত খুদে ভগবৎ সেবা সুচারু-সম্পন্ন হইবে, এই আশায় বুক বাঁধিয়া আমরা জনসাধারণের নিকট এই নিবেদন জানাইতেছি। ভগবান আমাদের এই যাত্রায় সহায় হউন। ওঁ তৎ সৎ।

বিনয়াবনত

শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—টাকা কড়ি ২৩৬ নং বহুবাজার স্ট্রীটে সার্ভেণ্ট অফিসে শ্রীমান শরৎকুমার ঘোষের নিকট পাঠাইবেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার ভার তাহার উপরই অর্পিত হইয়াছে"।

শরৎবাবু তখন সেই দায়িত্ব মাথায় লইয়া জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া বাঁচিতে হইলে, স্ত্রীলোক-

দিগকে ও পুরুষদিগকে কোন্ আদর্শে গঠিত হইতে হইবে, বাস্তবের ক্ষেত্রকেই বা কিভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে সেই জীবন বেদান্ত প্রচার করিতে লাগিলেন। এই মানুষটি ছিলেন কি অদ্ভুত, তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল কি ব্যাপক। কোন প্রতিষ্ঠানেই তিনি আট্‌কা ছিলেন না। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার এমন কি প্রতি মানুষের সকল ক্ষেত্রের মুক্তিকামী ছিলেন তিনি। সারা বাঙ্গলা ছিল তাঁহার কর্মক্ষেত্র। সেই সময় পাবনা প্রভৃতি স্থানে ঊষাঙ্গিণী দেবীকে সঙ্গে লইয়াই প্রচারে গিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে ঘর-বাহির এক হইয়া গিয়াছিল, বিশ্ব তাহার জীবনে ঘর হইয়া গিয়াছিল তাই কোন ঘর, কোনও মানুষ কোনও প্রতিষ্ঠানই তাঁহাকে আটকাইতে পারে নাই। তিনি শ্রীনিত্যগোপালের জীবনে জীবন লাভ করিয়া মুক্ত জীবন, অবধূত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু পল্লী রক্ষা সমিতির কাজ করিতে যাইয়া গৌরাঙ্গ গোষ্ঠী গঠনের প্রেরণা আসিল। সেই সময় শরৎবাবুর নামে যে বিজ্ঞাপন ছাপা হইয়াছিল, তাহা হইতে তাহার উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যাইবে জন্য এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীগৌরাঙ্গ গোষ্ঠী

একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয়েই বাঙ্গলার বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি পুনরায় কেন্দ্রীভূত হইতে পারে। যাঁহারা এই অপূর্ব্ব চরিত্রটিকে মনুষ্য জীবনের একদেশবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা কেবল মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতিই অবিচার করেন নাই,

বাঙ্গলার চিন্তা এবং কর্ম্মধারাকেও বন্ধ্যা করিয়া ফেলিয়াছেন। আজ যে বঙ্গ দেশের সুধী সমাজে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি এবং অর্থনীতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায় ভুক্ত বিবেচিত হইতেছে, তাহা একটি পূর্ণ ও অখণ্ড জীবনের সহিত সম্যক ও প্রকৃত পরিচয়ের অভাবেই সম্ভব হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্ম্ম যে এক বিরাট সংহতি শক্তির নামান্তর ইহার বহুল এবং বিশদ আলোচনার একান্ত প্রয়োজন। তাহা হইলে আপনা হইতেই এমন এক সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবে যাহাতে প্রেম, বীর্য্য ও জ্ঞানের একত্রস মাবেশদ্বারা জাতীয় উন্নতির সকল কার্য্যই সুসাধ্য হইবে। বর্ত্তমানে জাতিসংগঠনের জন্য যে সমস্ত কার্য্য প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইতেছে, কোন মূর্ত্ত আদর্শের সহিত যুক্ত না থাকায় কোনটীই জনসাধারণের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। বাঙ্গলার শ্রীগৌরাঙ্গ এই সকল সমীকরণের প্রথম পথ প্রদর্শক। আজ যে চিত্তের সজীবতা সরসতার অভাবে সকল কার্য্যই ক্ষণভঙ্গুর, মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত ভক্তিমার্গ সেই চিত্ত-শুদ্ধির একমাত্র উপায়। তাই মহাপ্রভুর জীবনের পূর্ণ ও বৈষ্ণব-মহাজনানুমোদিত আলোচনা দ্বারা বঙ্গসমাজকে গৌরাঙ্গ রসের রসিক করা, বর্ত্তমানের সমস্ত জটিল সমস্যার এক মাত্র মীমাংসা”।

এই সঙ্কল্প লইয়া কলিকাতা ৪এ রাজা লেনে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপনা করিয়া তাঁহার চরণতলে গৌরাঙ্গ গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া তাহার উদ্দেশ্য প্রচার করিবার জন্য শরৎবাবু

শ্রীধাম নবদ্বীপ গমন করেন, সঙ্গে ছিলেন দিনাজপুরের কর্ম্মী সাধক শ্রীনিশীথ নাথ কুণ্ডু মহাশয়। নবদ্বীপ আমপুলিয়া পাড়া অবধূত আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন। যেহেতু স্বামীজী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, সেই হেতু প্রথমে কেহই তাঁহার বক্তৃতার জন্য স্থান দিতে রাজী হয় নাই। পরে পঞ্চতত্ত্বের বাড়ী বেশী লোকজন যায় না জন্য কর্ত্তৃপক্ষ রাজী হন। প্রথমে মহাপ্রভুর প্রাঙ্গনেই সভার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু তাহারা সম্মত হন নাই রাজনীতির সংশ্রব আছে বলিয়া। প্রথমে পঞ্চতত্ত্বের বাড়ীতেই দুইদিন সভা করেন, সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "বর্ত্তমান যুগ ও মহাপ্রভু"। শরৎবাবুর বক্তৃতার সার অংশ ঃ- "বর্ত্তমানে পরস্পর বিরোধী যে দুটি দলের—সংসার ও সন্ন্যাস, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি, অন্ন সমস্যা ও মুক্তি সমস্যা—সমন্বয় না হলে বিশ্ব আর হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারবে না, অথচ কোন জীবন্ত বিগ্রহ ব্যতীত সমন্বয়-তত্ত্বের কোন বস্তু-তন্ত্রতাও সম্ভব না। শ্রীগৌরাঙ্গদেবই এই সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। তিনি সন্ন্যাসী হয়েও মায়ের ঋণ শোধ করতে পারেন না, তিনি পরম প্রেমিক হয়েও কাজীর বে-আইনী হুকুম মানতে রাজী নন, তিনি বিশ্বপ্রেমিক হয়েও বিশেষভাবে বাঙ্গলার। মহাপ্রভু বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের কর্ণধার, তিনিই বাঙ্গলার অণু পরমাণুতে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। বাঙ্গালীর আত্মপরিচয়ের জন্য প্রয়োজন গৌর-পরিচয়"। এই দিনের আলোচনায় সেখানে উপস্থিত গোস্বামী ও পণ্ডিতগণ এবং বৈষ্ণবমণ্ডলী সবাই অতীব

প্রীতিলাভ করায় পুনরায় সভার ঘোষণা করা হয়। সেদিনের আলোচ্য বিষয় ছিল "কেমন করে নৃসিংহ ধারা, রাম ধারা ও কৃষ্ণ ধারা মিলনে বাঙ্গলার গৌর ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। যে প্রকৃতিকে অস্বীকার করবার জন্য পুরুষ একটা বিরাট শুষ্ক প্রয়াস অদ্বৈতবাদের নামে করে আসছিল এবং যার ফলে দেশে না আছে প্রকৃতির কমনীয়তা ও সেবাভাব, না আছে পুরুষের পৌরুষ ও কোন কিছুতে থাকবার দৃঢ়তা, ব্রহ্মতত্ত্ব সেই প্রকৃতির মাঝে ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করে কেমন করে গৌর হলেন"। তারপর মহাপ্রভুর বাড়ীতে দুইদিন সভা হয়। আলোচনা হয় ভাগবত ধর্ম্ম কেমন করে মানুষের জীবনের সমস্ত বিভাগকে এক সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে, ইহাই বিশদ ভাবে বলেন। ভাগবৎ ধর্ম্ম যে ভগবান থেকেই সাধনার সুরু করেছে, ভাগবত যে ভগবানকে দিয়ে জগদ্ব্যাখ্যানের অপূর্ব্ব রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছে, আমরা যতখানি ভগবানকে পাব, ততখানিই যে জগতকে পাবার অধিকারী, ভগবানকে না নিয়ে সংসার স্পর্শ করবার অধিকারও যে নেই এই গভীর সাধনার বিস্তৃত আলোচনা করেন। যাঁহাকে প্রথমে বক্তৃতার জন্য স্থান দিতেই চাহিয়াছিল না, শেষে বক্তৃতার চমৎকারীত্বে মুগ্ধ হইয়া নানা স্থানে বক্তৃতার জন্য ডাকাডাকি করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল এমন হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা কখনও শুনি নাই।

এইভাবে বহু জেলার গ্রামে গ্রামে গৌরাঙ্গ গোষ্ঠী প্রচার ও শাখা স্থাপন করিয়া শরৎবাবু বরিশাল ফিরিয়া যান এবং

একমাস বরিশালে থাকেন। স্বপ্নে নিত্যগোপালের আদেশ পান "শরৎ মহানির্ব্বাণ মঠে আসিয়া থাকুক"। গুরুগত প্রাণ শরৎ-কুমার সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। প্রাণের অবস্থা ঊষাঙ্গিণী দেবীকে জানাইয়া তাঁহার অনুমতি লইলেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প স্থির করিয়া, বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া পুত্র সত্যব্রতকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা রওনা হইলেন। যাঁহার সন্ধানে তিনি অবিশ্রান্ত দেশ বিদেশে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন, তাঁহারই চরণতলে সম্যক প্রকারে নিজকে সমর্পণ করিবার প্রয়াসে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প লইয়া মহানির্ব্বাণ মঠে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গুরুভ্রাতাগণকে লইয়া শ্রীনিত্যগোপালের পুণ্য সমাধিতলে বসিয়া সন্ন্যাসের নাম পুরুষোত্তমানন্দ স্থির করিলেন এবং সত্যব্রত গেরুয়া দিয়া কাপড় রং করাইয়া দিলে উহা গুরুপীঠে স্পর্শ করিয়া সেই কাপড় পরিধান করিলেন। ১৩৩৪ সন ১৮ই ভাদ্র শ্রীরাধাষ্টমীর দিন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং কয়েকদিন মহানির্ব্বাণ মঠে থাকিয়া, ব্রজমুখীন প্রাণ তাঁহার, তিনি শ্রীবৃন্দাবনমুখে রওনা হইয়া গেলেন। ১৯২০ তে তিনি যে বেদান্তের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন তাহা গুরুভাই নিতাই পালের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি অতি যত্ন সহকারে সেই বেদান্তের ভাষ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। আড়াই বৎসর পর বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া উহা বরিশাল লইয়া গিয়াছিলেন।

সত্যব্রত বরিশাল ফিরিয়া আসিলে, খাদি প্রতিষ্ঠানের সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয় তাহাকে তাহার সোদপুর আশ্রমে লইয়া যান এবং মাসে ২০ টাকা করিয়া ঊষাঙ্গিণী দেবীকে পাঠাইতেন। বাড়ী হইতে কিছু চাউল পাইতেন ইহা দ্বারা ঊষাঙ্গিণী দেবী দুই পুত্র ও এক কন্যা লইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কবিতেন। বড়লোকের মেয়ে ছিলেন, ভাইয়ের তাহাদের নিকট যাইয়া থাকিতে বলায় শরৎকুমারের সুযোগ্য পত্নী বলিয়াছিলেন—তিনি আমাকে যেখানে রাখিয়া গিয়াছেন আমি সেখানেই থাকিব, আর আমাদের চালচলনের সহিত তোমাদের চালচলন মিলিবেও না অতএব আমি যাইব না। স্বামীর দেওয়া দরিদ্রতা হাসিমুখে বরণ করিয়া পুত্র কন্যা সহ বরিশালের বাসাতেই রহিলেন। শরৎকুমার বৃন্দাবন যাওয়ায় উজ্জ্বলভারত সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া গেল স্বরাজ সেবক সঙ্ঘের কাজ শ্রীযুক্ত সুরেশ গুপ্ত মহাশয় চালাইতে লাগিলেন।

শরৎকুমারের জীবন ছিল নমনধর্ম্মশীল; কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির ছিল অপূর্ব্ব সমাবেশ সেই জীবনখানিতে। আমরা চারিবর্ণের একত্র সমাবেশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি তাঁহার জীবনে তিনি ছিলেন দিব্য ব্রাহ্মণ, দিব্য ক্ষত্রিয়, দিব্য বৈশ্য, দিব্য শূদ্র। তাঁহার উজ্জ্বলভারতের এক স্থানে লিখিতেছেন—"ব্রাহ্মণের

মত তৃণ হতেও নীচ, ক্ষত্রিয়ের মত তরু হতেও সহিষ্ণু, বৈশ্যের মত অভিমান-শূন্যতা, শূদ্রের মত মানদানী না হলে জগৎ-মঙ্গল আন্দোলনের পূর্ণাধিকার জন্মাবে না। পদদলিত হয়েও সুখ প্রদান করার সাধনা তৃণের কাছ থেকে তোমাকে শিখতে হবে, তুমি যে নিত্য ব্রাহ্মণ, শত বজ্র মাথায় নেমে এলেও বৃক্ষের মত মাথা উঁচু করে তোমায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তুমি যে নিত্য ক্ষত্রিয়; পুনঃ পুনঃ হয়রাণ করলেও যে তার দুয়ারে প্রেমের পশরা বয়ে নিয়ে যেতে হবে, তুমি যে নিত্য বৈশ্য; পায়ে ধরেও যে তোমার প্রাণের বারতা দ্বারে দ্বারে পৌঁছিয়ে দিতে হবে, তুমি যে নিত্য শূদ্র"। ইহাই তাঁহার জীবনে তাঁহার গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপালের দান। সমন্বয়ের আলোকে তাঁহার জীবন খানি ছিল সমুদ্ভাসিত। তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই ছিল তাঁহার জীবন। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূতের শিষ্য, গুরুর জীবনে জীবন বিলাইয়া দিয়া অবধূত-জীবন লাভ করিয়াছিলেন। অবধূত জীবনের লক্ষণ শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন—"অবধূত জ্ঞানীর ন্যায় যোগ নিয়মের বশীভূত নহেন, বিষয়ীর ন্যায় ভোগপরায়ণও নহেন, জ্ঞানীর ন্যায় মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নহেন, বীরের ন্যায় বল প্রকাশক নহেন, ধীরের ন্যায় সংযমাভ্যাসী নহেন, তপ জপাদি মন্ত্র সাধকও নহেন। তিনি শৈব নহেন, শাক্ত নহেন, বৈষ্ণবও নহেন।

তিনি কোন উপাসক সম্প্রদায়ের নিয়ম নিষেধের অনুবর্ত্তী বা বিদ্বেষ্টা নহেন, তিনি পরমানন্দ স্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য বিরাজ করিয়া থাকেন"। পুরুষোত্তমানন্দের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে আমরা এই লক্ষণগুলিই দেখিতে পাই।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

"...একজন মানুষকে জীবনে বরণ করিতে হয় সব আবেষ্টনকে পিছনে ফেলিয়া তাহাকে হজম করিবার শক্তি লাভ করিবার জন্য। যাহাদিগকে সৃষ্টি করিতে হইবে, লোকসংগ্রহ করিতে হইবে, তাহাদিগকে একজনের জীবনে যুক্ত হওয়া চাই-ই। যাহারা পলাইয়া বাঁচিতে চায়, তাহাদের একা থাকা সম্ভব, চলেও বটে।..."

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ



শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ—৬৩ বৎসর মত বয়সের সময়ে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

দ্বিতীয় খণ্ড

সেবক সব ব্যাপারে মুক্ত না হলে চলবে কেন? সঙ্ঘ থাকবে স্বচ্ছ, লঘু, প্রকাশক। কিন্তু সঙ্ঘ যদি তার বিপ্লবের আদর্শ ভুলে গিয়ে কর্ম্মের ভিতর দিয়ে নিজকে বাঁচাতে ও বাড়াতে চায়, তবে তার ধ্বংস অনিবার্য।

বর্ত্তমান ঘনান্ধকারের মাঝে চাই একদল সত্যাগ্রহী, যারা মানুষ নিয়ে টানাটানি না করে' সত্যকে প্রাণ খুলে আচরণ করতে পারেন এবং সেই আচরণের যুক্তি নির্ভীক ভাবে, বিদ্বেষ-মুক্ত হয়ে জাতির হৃদয়ে অঙ্কিত করতে পারেন।

—উজ্জ্বলভারত পত্রিকা—

পূর্ব পর্যায়

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীনিত্যগোপাল কোলাহলময় রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দকে কিছু দিনের জন্য শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দের শীতল ছায়ায় লইয়া গেলেন। আড়াই বৎসর কাল তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন, এই সময় তাঁহার জীবনে তত্ত্বের বৃষ্টিধারা অবিশ্রান্ত ভাবে বর্ষিত হইয়াছে। শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের জীবনে যে জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির সমন্বয়-ধারা অবিরাম বহিয়া চলিত, তাহা তাঁহার জীবনে তাঁহার গুরু-কৃপায় অনুভূতির ভিতর দিয়াই আসিয়াছিল। সেই জন্যই তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার দেহ মন প্রাণ নিংড়াইয়া সহজ সরলভাবেই বাহির হইয়াছে। তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই তাঁহার জীবন-বেদান্ত। যে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব পৃথক পৃথক ভাবে তাঁহার জীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেবার বৃন্দাবন-বাস কালে সেই রাধা-কৃষ্ণ, পুরুষ-প্রকৃতি ভাব ও রসের সমন্বয় মূর্ত্তি যে শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব, সেই তত্ত্বই তাঁহাব জীবনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বৃন্দাবনে থাকাকালীন পুরুষোত্তমানন্দ প্রিয়নাথ মৈত্র নামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সহিত বিশেষ ভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেই পুরুষোত্ত-

মানন্দের প্রতি অনুরক্ত হইয়া বহু সেবা আড়াই বৎসর করিয়াছেন, পুত্র কুমারনাথ সর্ব্বদাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার, ছোটর প্রতি বড়র শোষণ ইহার বিরুদ্ধেই যাহার অভিযান তাঁহার বিশ্রাম কোথায়? বৃন্দাবনে এই শোষণ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। পোষণঘন পুরুষোত্তম মতবাদ প্রচার করিবার জন্য তিনি হিন্দী শিখিতে আরম্ভ করিলেন; দিন নাই, রাত্রি নাই হিন্দী শিখিতে লাগিলেন। তিন মাসের মধ্যে হিন্দী শিখিয়া হিন্দীতে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পোষণ-ঘন তত্ত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনের কূপগুলিতে মেথর ডোম প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতির জল লইবার অধিকার ছিল না। পুরুষোত্তমানন্দ এই অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন, এমন করিয়াই বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে পোষণ-ঘন রাধাকৃষ্ণ ও গৌরতত্ত্ব উপস্থাপিত করিয়া তাহাদের হৃদয়কে দ্রবীভূত করিলেন, যাহাতে তাঁহারা সকল অস্পৃশ্য জাতির জন্য কূপগুলি ছাড়িয়া দিলেন। মেথর ডোম সকলেই কূপ হইতে জল লইবার অবাধ অধিকার পাইল।

পুরুষোত্তমানন্দ সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবনে থাকিলেও স্ত্রী পুত্র কন্যার সংবাদ রাখিতেন, কেহ কিছু দিলে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। প্রিয়নাথ বাবুর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ঊষাঙ্গিণী দেবীকে সর্ব্বদা পত্রাদি দিতেন, দূরে থাকিয়াও তাহাদের সহিত ঊষাঙ্গিণী দেবীর প্রাণের একটা ঘনিষ্ঠ

সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। এমনি করিয়া একটা প্রাণের সঙ্ঘ রচনা করিবার প্রচেষ্টা পুরুষোত্তমানন্দের মধ্যে ছিল। প্রচলিত সন্ন্যাস তিনি করিয়াছিলেন না, যে সন্ন্যাসে স্ত্রী পুত্র কন্যার সংবাদ রাখা দোষের কারণ হইত। তিনি স্বভাব সন্ন্যাসী; তাঁহার সাধনা সংসার ছাড়ার নয়, সংসারের মাঝে তত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীনিত্যগোপালকে আস্বাদন করা এবং সংসারের প্রতি ক্ষেত্রকে পুরুষোত্তম ছাঁচে গড়িয়া তোলার সাধনাই ছিল তাঁহার সাধনা। বিশ্বসঙ্ঘ রচনার, বিশ্ব-বৃন্দাবন গড়িবার উজ্জ্বল আলো তাঁহাকে দিনরাত্র পাগল করিয়া রাখিয়াছে। 'আমার দেবতা আমাতে জাগিলে কে মোর আত্মপর'—এই ছিল তাঁহার জীবন; সকল সংস্কার-বর্জ্জিত শুধু একটা প্রাণ-প্রবাহ ছিল সেই মানুষটীর মাঝে। এই সময় পুরুষোত্তমানন্দের গুরু-ভ্রাতাগণের কয়েক জন ব্রহ্মচারী শিষ্য বৃন্দাবন গিয়াছিলেন; তাঁহারাও মাধুকরী করিয়া আনিয়া পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজকে দিতেন। একদিন একজন বলিয়াছিলেন, মহারাজ, আপনি শিষ্য করুন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, কেন, তোমরাই তো আছ; আমার ছেলেও যা, আমার ভাইর ছেলেও তাই। তাহাতে সেই শিষ্যটি বলিয়াছিলেন, না মহারাজ, তাহা হয় না; আমার গুরুদেব যদি আপনার নিকট আসিতে নিষেধ করেন তখন তো আর আমরা আপনার নিকট আসিব না, আপনি আপনার কাজের জন্য শিষ্য করুন। পুরুষোত্তমানন্দের চিন্তাধারা ও হৃদয়

এতই ব্যাপক ছিল যে বর্ত্তমান জগতের মানুষের সঙ্কীর্ণ চিন্তাধারা তিনি বুঝিতেন না, দেখিলে খুবই বেদনা পাইতেন।

হিন্দীভাষা আয়ত্ত করিয়া তিনি বৃন্দাবন ও মথুরা প্রভৃতি স্থানে হিন্দী ভাষায় ভাগবত ধর্ম্মের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাগবত ধর্ম্মের অপূর্ব্ব ব্যাখায় একটা অভিনব নূতনত্ব আস্বাদন করিয়া শ্রোতাগণ মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। পুরুষোত্তমানন্দের বক্তৃতায় পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নূতন রূপ তাঁহাদের নিকট প্রকটিত হইল। চারিদিক হইতে বক্তৃতার জন্য আহ্বান আসিতে লাগিল। ১৯৩০ সনে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামীজী আহুত হইয়া সেখানে গমন করেন, কুমারনাথ মৈত্র তাঁহার সঙ্গে যায় এবং সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। একদিন প্রয়াগের গঙ্গায় উভয়ে স্নান করিতে যাইয়া গঙ্গা গর্ভে দাঁড়াইয়া কুমারনাথের আকুল প্রাণের ইচ্ছায় তাহাকে শ্রীনিত্যগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি অল্প কয়েক জনকেই কৃপা করিয়া দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কুমারনাথ মৈত্রই তাঁহার প্রথম শিষ্য। কুমার নাথ একদিন স্বামীজীকে বলিয়াছিল, আপনি যে আমাদিগকে সংসার সত্য, ভগবান সত্য শিখাইতেছেন, ইহাতে কিন্তু এমনি আমাদের সংসারের প্রতি টান বেশী, সংসার সত্য বলায় সংসারই আমাদিগকে পাইবে, আপনি অর্থাৎ ভগবান বাদ পড়িয়া যাইবে আমাদের জীবনে। কোন্ কৌশলে সংসার

করিলে সংসার সত্য হয় সে তত্ত্ব যদি কেহ না জানিয়া সংসার করে তাহা হইলে ভগবান তো বাদ পড়িবেই। বর্ত্তমান সভ্যতা তাহারই প্রতীক। ইহাই মায়াবাদের পরিণতি। সেই সময় পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা কুমারনাথ মৈত্রের স্বহস্ত লিখিত যাহা পাইয়াছি তাহা এখানে তুলিয়া দিলাম।

"প্রয়াগে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ

কুম্ভমেলা উপলক্ষে কল্যাণ-সম্পাদক, শ্রীশ্রীগীতা জ্ঞান যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত হনুমান প্রসাদ পোদ্দার মহাশয় কর্ত্তৃক আহুত হইয়া শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ১০ই মাঘ ২৩শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার প্রয়াগ ধামে গমন করেন। স্বামীজীর পূর্ব আশ্রমের সহিত শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের পরিচয় ছিল। সম্পাদক মহাশয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শ্রীমৎ স্বামীজীর নিকট হতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ শ্রবণ। সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে স্বামীজীর প্রায় অনেক সময় আলোচনা হতো যে, ধর্ম্মকে কোণঠাসা করে রাখলে আর চলবে না। পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, জাতীয় জীবনে, এমন কি রাষ্ট্রে পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মকে নামিয়ে নিয়ে আসতে হবে, তবেই হবে ভারত "উজ্জ্বলভারত"। ভারত নিজের বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন ক'রে মরণের পথের যাত্রী হ'তে

চলেছে। ধর্ম্মই ছিল ভারতের যা কিছু বৈশিষ্ট্য। ভারত ধর্ম্ম করতো বিশ্বকে সঙ্গে নিয়ে, একলার জন্য ধর্ম্ম করতে ভারত জানতো না। কিন্তু আজ হয়ে গিয়েছে তার উলটো। আজ মাত্র আমরা ব্যক্তিগত ধ্যান জপকেই ধর্ম্ম আখ্যা প্রদান করছি।

তিন দিন হিন্দি ভাষায় তিনি বক্তৃতা দেন। হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা তাঁর জীবনে এই প্রথম হ'লেও জন সাধারণের চিত্ত বেশ আকৃষ্ট হয়েছিল। আর কিছু বলবার জন্য সভার মধ্য হ'তে জন সাধারণ বার বার অনুরোধ করলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল "বৈকুণ্ঠ-পতি জীবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে কেমন করে জীব হয়ে জীবের দুঃখ আস্বাদন করলেন"। তৃতীয় দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল "ভক্তি এবং তাহার সাধনা"। এ সম্বন্ধে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "শ্রীগৌরাঙ্গ একাধারে ভক্ত ভগবান"। শ্রীগৌরাঙ্গ ভারতের বুকে এমন কোন জিনিষ দিয়ে গিয়েছেন যাহা আজ হোক কাল হোক ভারতকে বরণ করে নিতেই হবে। ১লা ফেব্রুয়ারী শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরী মহারাজের আশ্রমের সেবকবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে তাঁদের আশ্রমে গিয়ে ভক্তি সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কিছু বল্‌তে বাধ্য হন। প্রায় ২॥ ঘণ্টা কাল তিনি বলেন। বহু সংখ্যক শ্রোতা নিষ্পন্দ ভাবে তাঁর সেই আলোচনা শ্রবণ করেন। আলোচনা শেষে ভক্ত-

বৃন্দ স্বামীজীকে ঘিরে কেঁদে আকুল। মায়ের দল তাঁকে আশীর্ব্বাদ করেন "বাবা, তুমি কেঁদে জগৎকে মাতিয়ে তোল, তোমাকে দিয়ে জগৎ শিখুক, তারা কি ছিল, কি হয়েছে, কি হ'তে হবে"।

প্রয়াগে অবস্থান কালে বহু ভক্ত, সন্ন্যাসী, গৃহী স্বামীজীর নিকট আগমন করতেন। তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য।

'হরিবাবা'—ইনি ছিলেন মায়াবাদী সন্ন্যাসী। ধীরে ধীরে গৌর সুন্দর এঁর ঘরে ঢুকেছেন। এখন তিনি গৌর নামে পাগল। গৌর সুন্দরের কীর্ত্তন এদেশে ছিল না। তিনিই এদেশের গৌর-কীর্ত্তনের প্রথম প্রবর্ত্তক। এঁর আশ্রম অনুপ শহরে গঙ্গার বাঁধের উপর। আশ্রমে ষড়ভুজ মহাপ্রভুর চিত্রপট বিরাজিত।

স্বামী অদ্বৈতানন্দ, বিশ্বানন্দ এবং স্বয়ম্জ্যোতি—এঁদের নির্দিষ্ট কোন আশ্রম না থাকলেও অধিক সময় ঋষিকেশেই অবস্থান করে থাকেন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ পূর্ব্বে ছিলেন ব্যারিষ্টার, স্বামী বিশ্বানন্দ ছিলেন সিভিল সার্জ্জন, স্বামী স্বয়ম্জ্যোতি বাল্যসন্ন্যাসী। স্বামী অদ্বৈতানন্দ প্রভৃতি কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁদের বন্ধু এলাহাবাদের মিউনিসি-প্যাল ইঞ্জিনিয়ার এম সী গুপ্তার বাসায় স্বামীজী গমন করেন। সেখানে মহাপ্রভুর দর্শন সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল আলোচনা হয়। মায়াবাদী হয়েও মহাপ্রভুর

দর্শন শুনে তাঁরা তৃপ্ত। একদিন এলাহাবাদের এম, এ, ক্লাসের দর্শনের ছাত্র দুই জন এসেছিলেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা ছিল 'জীবন কোন্ স্থানে দাঁড়িয়ে সত্য'। মহাপ্রভুর ফিলোসফি দিয়ে বিশদভাবে স্বামীজী তাঁদের সে বিষয় বুঝিয়ে দেন। যাবার বেলা তাঁরা বলেন, 'সত্যিই আজ কোন নূতন জিনিষ আপনার কাছ থেকে পেয়ে গেলাম'। একদিন শ্রীকৃষ্ণ-সন্দেশ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ গর্দ্দে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

৩রা বেলা ৪টার সময় উপস্থিত জনমণ্ডলীর অশ্রু-জলের ভিতর দিয়ে শ্রীবৃন্দাবন রওনা হয়ে ৪ঠা বেলা ১১টার সময় স্বামীজী শ্রীধামে পৌছান। শ্রীধাম বৃন্দাবন। ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০।

আমরা ৭ই ফেব্রুয়ারী শ্রীধাম বৃন্দাবন হতে সন্ধ্যা ৭টার সময় মথুরা এসে রাত্রি ১১॥০টার ট্রেনে বরদাভিমুখে রওনা হই। কোটা স্টেশনে শ্রীযুক্ত চুন্তিরাজ গনেশ বাগত সম্যাজি বলে একটি মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইনি "বৈদিক রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম" বলে একখানি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পত্রিকা আছে তারই সম্পাদক। ইনি পুণাতেই অধিক সময় অবস্থান করিয়া থাকেন। ট্রেনের মধ্যে স্বামীজীর ২।১টা মাত্র কথা শুনে, পুণাতে যাবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করে গেলেন। ওঁর আগ্রহ দেখে স্বামীজী বললেন, "যদি ওধারে যাই আপনার ওখানে যাবার চেষ্টা

করবো"। ৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১০৷৷০টার সময় আমরা বরদা রাজ্যের অন্তর্গত মিয়াগাঁও নামে একটি গ্রাম আছে সেই গ্রামে শ্রীরামজির একটি মন্দির আছে, সেখানে উঠি। মন্দিরে শ্রীরাম লক্ষণ সীতাদেবীর পিত্তল মূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরটি ছোট হইলেও সাজানো গোছানো বেশ সুন্দর। শ্রীবৃন্দাবন হতে রওনা হবার আগে আমরা ঠিক এই দিনে যে পৌঁছাব সে খবর দেওয়া ছিল। মহান্ত মহারাজ মন্দিরে উপস্থিত না থাকলেও সেবকবৃন্দ আমাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। খাবার ছিল মাত্র ডাল আর ভাত। সমস্ত দিন না খাওয়ার পর ঐ ডাল আর ভাতই বেশ তৃপ্তির সহিত খাওয়া গেল! আমাদের দেশে যেরূপ ভাবে ডাল রান্না হয় সেরূপ তো আছেই আরও এক প্রকার ডাল এ দেশে রান্না হয়। সে হচ্ছে নুন ঝাল ইত্যাদি তো আমাদের মত থাকেই আরও থাকে অম্বল আর মিষ্টি, খেতে বেশ লাগে। সেই ডাল আর ভাত খেয়ে রাত্রে শোওয়া গেল। তৎপর দিবস ছিল একাদশী। একাদশীর দিন তো আর অন্ন খেতে হয় না, সেই জন্য স্নানের পর সামান্য আলুর খুন্নি খেয়ে বেলা ১১টার ট্রেনে মালাসায় রওনা হয়ে ১টার সময় মালাসায় পৌঁছালাম। মালাসায় এসে শ্রীমৎ পরমহংসাচার্য্য মাধবদাস বাবাজি মহারাজের আশ্রমে উঠি। ইনি ছিলেন বাঙ্গালী। সমস্ত দেশ ঘুরে এই স্থানটিকে ভজনের অনুকূল ভেবে এখানে

আশ্রম করে সমস্ত বন্দোবস্ত করে যান। ইনি ছিলেন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের। মহাপ্রভুর নাম এ দেশ জান্‌তো না। তিনিই এ দেশে মহাপ্রভুর নামের বীজ রোপন করে গেছেন। বর্ত্তমানে প্রায় তিন হাজার গুজরাটী এঁর কৃপায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু দুঃখের বিষয় উপযুক্ত প্রচারকের অভাবে এই সব শিষ্যবর্গ মহাপ্রভু সম্বন্ধে খুবই অনভিজ্ঞ। স্বামীজীকে পেয়ে আশ্রমের বর্ত্তমান মহান্ত মহারাজ এবং আশ্রমের অন্যতম শিষ্য কেশবদাস বাবাজী খুবই আহ্লাদিত। তাঁরা বলেন আমরা আন্তরিক ভাবে গৌরের পদে প্রার্থনা করি তাঁর নাম এদেশে আপনার দ্বারা প্রচারিত হোক্। গৌর আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। ভক্তদের আশীষের ভিতর দিয়ে আমরা মিয়াগাঁও হতে রওনা হই। মিয়াগাঁও হতে রাত্রি ৮॥০টার ট্রেনে বরদাভিমুখে রওনা হয়ে রাত্রি ১০॥০টার সময় বরদাতে পৌছি। বরদাতে এসে হাই-কোর্টের উকিল শ্রীযুত প্রাণলাল ঠাকুরলাল মুনসী মহাশয়ের বাসায় অবস্থান করি। বরদাতে ১৩ই ১৪ই এবং ১৫ই এই তিন দিন স্বামীজীর বক্তৃতার বন্দোবস্ত হয়। শ্রীমৎ স্বামীজী বরদাতে এসেছেন শুনে সুরাটের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত নর্ম্মদাশঙ্কর পাণ্ডে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য বরদাতে এসে উপস্থিত হন। ইনি স্বামীজীর পূর্ব্বাশ্রমের সহিত কাগজে কলমে পরিচিত। শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামীর মৌখিক স্বামীজীর কথা শুনে ইনি অগ্রেই

স্বামীজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। এখন স্বামীজীকে সাক্ষাৎ পেয়ে পরম আহ্লাদিত। সুরাটে স্বামীজীর বক্তৃতার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করলেন। কাগজে স্বামীজী সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করলেন।

বরদাতে যে তিন দিন বক্তৃতার বন্দোবস্ত ছিল তার আলোচ্য বিষয় ছিল 'বেদান্ত ও শ্রীগৌরাঙ্গ'। এ সম্বন্ধে নারায়ণ কেমন করে জীবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে জীবের সঙ্গে নিজের দুঃখ মিলিয়ে প্রেম বিলাতে গৌর হলেন, তা বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন—নারায়ণ ছিলেন বৈকুণ্ঠে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়ে, লক্ষ্মী-সেব্য হয়ে। সনক সনন্দ সনৎকুমার প্রভৃতি চারি ঋষি বালক বৈকুণ্ঠ দ্বারে নারায়ণ-দর্শনে উপস্থিত, প্রহরী জয় বিজয়। নেংটা ছাই-মাখা ঋষি বালকদের ঐশ্বর্য্যাধিপতি নারায়ণের সামনে যেতে দিতে প্রহরীরা নারাজ। ঋষি বালকদের ক্রোধ হল, ক্রোধান্বিত হয়ে ঋষি বালকগণ জয় বিজয়কে শাপ দিলেন, তোমরা এই স্থানের অযোগ্য, মর্ত্ত্যে গমন কর। জয় বিজয় শাপ শ্রবণে অধীর হয়ে ঋষিদের চরণে পতিত হলেন। নারায়ণ এলেন, সমস্ত বিষয় শুনে জয় বিজয়কে বললেন, ঋষি-বাক্য লঙ্ঘন হবে না, তোমাদের মর্ত্ত্যে গমন করতে হবে। ভক্তরূপে ৭ জন্মের পর এবং অসুর রূপে ৩ জন্ম পর পুনরায় তোমরা এই স্থানে ফিরে আসবে। এখন তোমরা বল কোন্ জন্ম প্রার্থনা কর? জয় বিজয়

অসুর-জন্ম প্রার্থনা করলেন। এই সময় নারায়ণের প্রাণ কেঁদে উঠলো, সনক সনন্দ সনৎকুমার প্রভৃতি আমার ভক্তদেরই যখন আমার দুয়ারে এই লাঞ্ছনা, আমার জীবের তবে কি দুর্দ্দশা হচ্ছে, তাদের বার্ত্তা তো আমার কাছে পৌঁছায় না; শোন জয় বিজয়, এবার আমি জগতের বুকে নামিব। জয় বিজয় বললেন, কোথায় যাবে তুমি ঐশ্বর্য্যের ঠাকুর পচা গলা মাটির রাজ্যে? নারায়ণ জয় বিজয়ের মানা শুনতে নারাজ, জয় বিজয় ঐশ্বর্য্য ছেড়ে নারায়ণকে জীবের মাঝে নামতে দিতে নারাজ। নারায়ণ যখন জয় বিজয়ের হুকুম শুনতে কিছুতে রাজী নন, তখন জয় বিজয় হেঁকে বললেন—যুদ্ধং দেহি। এই যুদ্ধের প্রথম অনুষ্ঠান হিরণ্য-কশিপুর রাজ্যে। যুদ্ধের পুরোহিত প্রহ্লাদ, ভগবান নৃসিংহ। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান ত্রেতাযুগে রাম অবতারে। রাম অবতারে নারায়ণ লক্ষ্মী ত্যাগ করলেন। বৈকুণ্ঠে ছিলেন লক্ষ্মী নিয়ে, কুণ্ঠা বিরহিত হয়ে; রাম অবতারে লক্ষ্মী ছেড়ে জীবকে ডেকে বললেন, এস জীব, এখন তোমাদের সঙ্গে আমি মিল্‌বো। বৈকুণ্ঠে আমি ছিলেম লক্ষ্মী নিয়ে, আর তোমরা লক্ষ্মীছাড়া; তোমাদের সঙ্গে আমার প্রেম করবার সুবিধা হয়নি, এবার তোমাদের সঙ্গে আমার মিলবে। নারায়ণ ছিলেন পণ্ডিত কুলীন পুরুষদেরই, আর রাম অবতারে ভগবান দেখালেন, আমি শুধু্ কুলীনদেরই নই, আমি অকুলীনেরও। ইত্যাদি—

সুরাটে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজী বরদাতে তিন দিন বেদান্ত ও শ্রীগৌরাঙ্গ আলোচনা করিবার পর সুরাটে পদার্পণ করিয়াছেন। ২০শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী সুরাট কংগ্রেস কমিটি ইউথলীগ ও ১১শে ফেব্রুয়ারী হিন্দু মহা-সভার তরফ হইতে হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা দেন।

কংগ্রেস কমিটি এবং ইউথলীগেব তরফেব আলোচ্য বিষয় ছিল ধর্ম্ম ও স্বতন্ত্রতা; হিন্দুমহাসভার আলোচ্য বিষয় ছিল—'বৃন্দাবন লীলা রহস্য'। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন—বর্ত্তমান সভ্য সমাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বৃন্দাবন-লীলা বাদ দিয়া বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু যদি পূর্ণ মানব হইতে হয়, যদি সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র সংস্কার করিতে হয় তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীবৃন্দাবন-লীলা আলোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য। পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবন লীলার মধ্য দিয়াই কোন্ স্থানে দাঁড়াইয়া জগতের আদর্শ সে কথা তিনি ভাগবত হইতে এক একটি শ্লোক উত্থাপন করিয়া বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলিলেন—জগতের সকল স্তরের মানুষ বৃন্দাবন-লীলা আস্বাদন করিতে পারেন। বর্ত্তমান জগতের ধারণা বৃন্দাবন-লীলা মানুষকে ক্লীবে পরিণত করে, কিন্তু তিনি বলেন যদি বীর ভক্ত হইতে হয় তাহা হইলে বৃন্দাবনই এক মাত্র সে আদর্শের আদর্শ স্থান। বিলাতী কাপড় পরিয়া মানুষ

ভক্ত হইতে পারে কিন্তু বৃন্দাবনের ভক্ত যে হওয়া যায় না তাহাও তিনি আলোচনা করেন। তিনি বলেন—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পোষণের দেবতা, তিনি স্থাপন করিতে আসিয়াছেন শোষণের স্থানে পোষণ, কলকারখানা সব শোষণের মূর্ত্তি আর চরখা পোষণের মূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণ যদি পোষণেরই দেবতা হন তাহা হইলে চরখার স্থান আগে না দিয়া কেমন করিয়া কলের স্থান অগ্রে দিবেন।

প্রায় ২॥০ ঘণ্টা তিনি এই বিষয় আলোচনা করেন। বহু সংখ্যক শ্রোতা তাঁর সেই আলোচনা অবিচলিত চিত্তে শ্রবণ করেন। বক্তৃতা অন্তে শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজীকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া বলেন—বাঙ্গালীর দ্বারাই এরূপ আলোচনা সম্ভব, সত্য সত্যই বাঙ্গালী ভারতের আদর্শ। যে দেশে স্বামীজীর মত পুত্র-রত্নের আবির্ভাব হয়, সে দেশও ধন্য। শ্রোতাদের আরও অভিমত সুরাটে এরূপ আলোচনা এই প্রথম।

আগামীকাল পুনরায় স্বামীজী এখান হইতে বরদাতে রওনা হইবেন। ১৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩০

পুনরায় বরদাতে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজী

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজী সুরাট হইতে পুনরায় বরদাতে পদার্পণ করিয়াছেন। বরদাতে শিবরাত্রি উৎসব খুব ধূমধামের সহিত পালিত হইয়া থাকে। সেই উৎসবের

সভাপতিত্ব করিবার জন্য শিবরাত্রি কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামীজী বরদাতে পদার্পণ করেন। গত ২৬শে এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে তিনি হিন্দিতে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হিন্দুর অমূল্য গ্রন্থ। শ্রীশ্রীগীতা-জীবন যাপন করিলে মানুষ সকল ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পারে। পারিবারিক, জাতীয়, রাষ্ট্রীয় সকল জীবনের সমন্বয়-মূর্ত্তি গীতা-জীবন।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গায়কোয়াড় মহারাজ প্রতিষ্ঠিত বিঠলজীর মন্দিরে তিনি "বৈষ্ণবধর্ম্ম ও ভক্তি" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, বর্ত্তমান জগতের ধারণা বৈষ্ণব হইলেই মানুষ হীনবীর্য ও ক্লীব হইয়া যায়, কিন্তু তিনি বলেন যদি যথার্থ বীর ভক্ত হইতে হয় তাহা হইলে সাধককে বৈষ্ণবতার মধ্য দিয়াই সে পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বৈষ্ণব ভক্তদের জীবনীর সহিত তিনি এই বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করেন।

বহু সংখ্যক শ্রোতা তাঁর সেই আলোচনা শ্রবণ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন। বক্তৃতা শেষে শ্রোতৃবৃন্দ বলেন—ধর্ম্মের মধ্যেও যে এরূপ তেজস্বিতা আছে তাহা আমাদের ধারণার অতীত ছিল। আজ আপনি ধর্ম্মেরও এক নূতন পথ বরদাবাসীকে দেখাইয়া দিলেন। হিন্দু সভার পক্ষ হইতে সুরাটে আলোচনা করার জন্য অদ্যই স্বামীজী

পুনরায় সুরাটে রওনা হইলেন। ১লা মার্চ্চ, ১৯৩০।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজী বরদা হইতে পুনরায় সুরাটে গমন করেছিলেন। গত ৬ই এবং ৭ই মার্চ্চ সুরাট হিন্দু সভা ও তাপী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম জ্ঞান প্রচারক সমিতির পক্ষ হতে তিনি "ভাগবত ধর্ম্ম" সম্বন্ধে হিন্দিতে বক্তৃতা দেন। ভক্তিকে কেন্দ্র করেই তিনি ভাগবত ধর্ম্ম বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন—সমস্ত বাদের অপূর্ব্ব সমন্বয় এই ভাগবত গ্রন্থ। জাতিকে এখন এই ভাগবত-ধর্ম্মী হতে হবে। বর্ত্তমানে ধর্ম্ম ও রাজনীতিতে চলেছে ভীষণ দ্বন্দ্ব। রাজনীতি ধর্ম্মের গন্ধ সহ্য করতে পারে না, ধর্ম্মও রাজনীতির গন্ধ সহ্য করতে নারাজ। ধর্ম্ম ও রাজনীতি যখন এই ভাবে ঠোকাঠুকি করতে থাকে, তখনই প্রয়োজন হয় ভাগবত ধর্ম্মের অবতারণা। বর্ত্তমান যুগেও সে ভাবের ব্যতিক্রম হয় নাই। আবার ভাগবত ধর্ম্ম আমাদের মাঝে অবতরণ করবে, জাতি নিজ স্থানে স্থিত হবে, ভারত উজ্জ্বল হবে। ভারতবর্ষে ধর্ম্ম ও রাজনীতি কোনও কালেই পৃথক নহে, এখনও থাকবে না।

ভক্ত হতে হলে খদ্দর যে পরতেই হবে তা তিনি মনু স্মৃতি ভাগবত মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ হতে শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেন। বহু সংখ্যক শ্রোতা তাঁর সেই আলোচনা শ্রবণ করে বিশেষ তৃপ্তি পান। শ্রীমৎ স্বামীজী

সুরাট হতে ৮ই মার্চ্চ ২টার ট্রেনে রওনা হয়ে ৮॥•টার সময় পেটলাদ পৌঁছান। পেটলাদ ১২ই মার্চ্চ ১৯৩০।

(শ্রীকুমারনাথ মৈত্র লিখিত ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত)

স্বামীজী এইভাবে সুরাট ও বরদাতে বহুবার বক্তৃতা দিতে গিয়াছেন এবং গুজরাট প্রভৃতি স্থানেও গিয়াছেন। কুমারনাথ সঙ্গেই থাকিত। এইরূপ পর্য্যটনের পর তিনি পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করেন। সেখানে যাইয়া কুমারনাথের ভগ্নি শান্তি দেবীকে দীক্ষা প্রদান করেন এবং তাহাকে প্রতিদিন গীতা পড়াইয়াছেন। এইভাবে তিনি যখন যাহাকে কাছে পাইয়াছেন তাহাকে পুরুষোত্তম ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে আড়াই বৎসর শ্রীবৃন্দাবনধামে কাটিয়া গেল। একদিন ভোরে স্বপ্ন দেখিলেন, তুমুল সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে, তাহার ভিতর শ্রীগৌরাঙ্গ দেব; তাঁহার চরণে শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে যত রকম চিহ্ন সমস্তই রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ দেব বলিলেন "তুই বাঙ্গলায় যা, বাঙ্গলায় কাজ আছে"। স্বপ্ন ভাঙ্গিলে গুরুভাই নগেনবাবুকে বলিলেন। পরম ভক্ত কৃষ্ণদাস বাবাজী নামে এক বৃদ্ধ সেখানে ছিলেন, তিনি পুরুষোত্তমানন্দকে খুব ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন— শরৎবাবু, 'তুমি বাঙ্গলায় ফিরিয়া যাও, এখান হইতে তোমার যাওয়ার আদেশ হইয়াছে'। তবুও স্বামীজী আসিতে চাহেন না। একদিন ভীষণ জ্বর, সেই দিন

বলিয়াছিলেন, আমি কি বৃন্দাবন মরিবার জন্য আসিয়াছি? আমাকে যে বাঙ্গলায় কাজের জন্য যাইতে আদেশ হইয়াছে। সুস্থ হইয়া বরিশাল যাইবার দিন স্থির করিয়া পত্র দিলেন।

১৩৩৬ সনের ৮ই চৈত্র শনিবার ভোর ৫টায় যখন খুলনা এক্সপ্রেস স্টীমারখানি ঘাটে আসিয়া লাগিল, বরিশাল-বাসীর কি আনন্দ! সমবেত শত শত কণ্ঠ বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে বরিশালকে কম্পিত করিয়া তুলিল। প্রায় তিন বৎসর পর সেই ষ্টীমারে বরিশাল-প্রাণ শরৎকুমার গৈরিক বসন পরিহিত পুরুষোত্তমানন্দ রূপে বরিশালবাসী জনগণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে শিষ্য কুমারনাথ মৈত্র। তাঁহাকে পাইয়া ম্রিয়মান জনগণের প্রাণে নব বলের সঞ্চার হইল, আনন্দ উদ্দীপনার অভিব্যক্তি হইতে লাগিল, মুহুর্মুহুঃ বন্দেমাতরম্ ধ্বনির ভিতর দিয়া প্রাণের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল। পুরুষোত্তমানন্দ সকলকে প্রত্যভিনন্দন জানাইয়া বন্ধুজন দুর্গামোহন বাবু ও সুরেশ গুপ্ত প্রভৃতির সহিত ধীরে ধীরে স্বরাজ সেবক সঙ্ঘে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে সমবেত মহিলাবৃন্দ শঙ্খ ধ্বনি উলুধ্বনির ভিতর দিয়া পুরুষোত্তমানন্দকে পুষ্পমাল্যে ও চন্দনে ভূষিত করিয়া অভিনন্দিত করিলেন। পুরুষোত্তমানন্দ সন্ন্যাসী হইয়া আসিয়াছেন, বন্ধুগণের চিন্তা তিনি কোথায় থাকিবেন? বীর সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দ বলিলেন, আমি আমার বাসাতেই

থাকিব এবং সকলের সহিত প্রীতিপূর্ণ আলোচনা করিয়া কুমারনাথ সহ নিজ বাসা অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি বলিতেন, আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা তো আমার ভগবৎ পথে অগ্রসর হইতে কোন বাধা সৃষ্টি করে নাই বরং সাহায্যই করিয়াছে, কোন্ অপরাধে সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব?

মহাত্মাজী লবণ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু বরিশাল তখনও নীরব, মহাত্মাজীর আন্দোলনে সাড়া দেয় নাই। এহেন সময় পুরুষোত্তমানন্দ বরিশাল আসিলেন, তিনি আসিয়াই পুনরায় দেশবাসীর পুরোভাগে দাঁড়াইয়া লবণ আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করিলেন, তাঁহার ডাকে দেশবাসী সাড়া দিল, কমিটি গঠিত হইল, কাজ আরম্ভ করিলেন। পুরুষোত্তমানন্দের এক বন্ধু জন বলিয়া ছিলেন আপনি যেন কেমন মানুষ, এতদিন পর আসিলেন, আমরা আপনাকে ডাকিব, তাহা না, আপনি আসিয়াই, আমাদের ডাকের অপেক্ষা না করিয়াই কাজ আরম্ভ করিলেন। পুরুষোত্তমানন্দ দেশসেবাকে ভগবৎ সেবা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য সে কাজ তাঁহারই কাজ মনে করিয়া করিয়াছেন, কাহারও ডাকের অপেক্ষা তিনি করেন নাই।

১৩৩৭ সনের বৈশাখ মাসে পুরুষোত্তমানন্দ স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী গঠন করিয়া লবণ আইন অমান্য করিতে

অভিযান করিলেন। ২২ জন পুরুষ এবং ৩ জন স্ত্রীলোক এই ২৫ জন লইয়া তিনি প্রথমে যাত্রা করেন। সেই স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনীতে তাঁহার স্ত্রী উষাঙ্গিণী দেবী, কন্যা নিত্য-রঙ্গিণী, নিত্যব্রত দেবব্রত পুত্রদ্বয় এবং শিষ্য কুমারনাথ মৈত্র ছিলেন। পদব্রজে কীর্ত্তন করিতে করিতে পুরুষোত্তমানন্দ এই ২৫ জন সহকারে বরিশাল হইতে রওনা হইলেন। প্রতিদিন এক গ্রামে যাইয়া দ্বিপ্রহরে আহারাদি করিতেন এবং তথাতে সভা করিয়া লবণ আইন অমান্য সম্বন্ধে অর্থাৎ শোষণের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেন। উষাঙ্গিণী দেবী প্রভৃতি সেই সভাতে নারিকেল পোড়াইয়া লবণ তৈরী করিয়া সভায় বিক্রী করিতেন। এইরূপে ১৮ দিনে ৮০ মাইল যাওয়ার পর লবণ আইন অমান্যের অপরাধে বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক পুরুষোত্তমানন্দ ধৃত হইয়াছিলেন। সেই সময় তিনি বরিশাল জেলাবাসীর নিকট হইতে বহু ভাবে অভিনন্দিত হইয়া-ছিলেন; তাহার তিন খানি অভিনন্দন পত্র এখানে তুলিয়া দিলাম।

বরিশাল-গৌরব স্বামী শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমানন্দ

মহানুভব!

আমাদের সঞ্চিত বহু সৌভাগ্যের ফলে তোমার পরম হিতকর, পবিত্র মধুর সাহচর্য্যলাভে ধন্য কৃতার্থ আমরা শ্রদ্ধাপ্রীতি ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য লইয়া তোমাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি।

দেশমাতৃকার সুসন্তান !

পরাধীনতার অরুন্তুদ যন্ত্রণা প্রাণে প্রাণে সম্যক উপলব্ধি করিয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মুক্তির জন্য, জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মহামানব অসহযোগ মন্ত্রের ঋষি মহাত্মা গান্ধীর অসহ-যোগনীতির অনুসরণে ব্যক্তিগত স্বার্থ সুখ ভবিষ্যৎ এক কথায় তোমার যথা সর্ব্বস্ব ত্যাগের অনলে আহুতি প্রদান করত মুক্ত বীর প্রেমিক তুমি যে মহান্ সমুজ্জ্বল আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছ তাহাতে সকলেই আমরা বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে তোমার নিকট মস্তক নত করিয়াছি। ওহে ত্যাগের গৌরব-মুকুট-ধারী ! "তোমার পুণ্য পরশে ধন্য আমরা" তোমাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি।

সাধক।

পুরুষোত্তম তোমার মন্দিরের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহেন। তিনি বিশ্বব্যাপী, তাই তো তুমি বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধন মানসে মধুর বৃন্দাবন পরিত্যাগ করত অহিংসা ত্যাগ নির্ভীকতা ও শক্তির বাণী লইয়া পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছ। অহিংস। প্রেমিক ! তোমাকে আমরা সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি।

কর্ম্মিন্ !

বরিশাল যখন অবসাদ ঘুমে অচেতন, জড়তায় সমাচ্ছন্ন, তখন সত্যাগ্রহ বাহিনী সংগঠনে তুমিই বরিশালের প্রাণে মৃত

সঞ্জীবনী সুধা সিঞ্চন করিয়া দিয়াছ। হে বরেণ্য! তোমাকে আমরা সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি।

ওহে বিঘ্ন-বহুল দুর্গম পথের যাত্রী!

লাঞ্ছনা নির্য্যাতন তোমার বজ্রদৃঢ় কর্ম্মশক্তিকে পঙ্গু করিতে পারে নাই, পরন্তু উহা শৈল-প্রতিহত স্রোতস্বিনীর ন্যায় বাংলার সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়া তোমাকে আজ অধিকতর শক্তিমান ও বরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। আত্মার অমরত্বে গভীর বিশ্বাসবান্ তুমি, তোমার "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।" নির্ভীক! তোমাকে আমরা সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি।

দেশহিত-নিবেদিত-প্রাণ সন্ন্যাসিন্! দেশপ্রীতি ও ভগবদ্ভক্তির অপূর্ব্ব সম্মিলনে গরীয়ান্ মহীয়ান্ তুমি। অকিঞ্চন আমরা, কি দিয়া তোমার অভ্যর্থনা করিব? তথাপি দেশপূজ্য পুণ্যশ্লোক অশ্বিনীকুমার, বিশ্ব-প্রেমিক প্রেমানন্দ ও সন্ন্যাসীপ্রবর প্রকাশচন্দ্রের জন্মভূমিতে তোমাকে আমরা সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি। মহা তীর্থযাত্রা-পথে তুমি আমাদের হৃদয়ের অভ্যর্থনা গ্রহণ কর। তোমার সাধনা সফল ও অভিযান জয়যুক্ত হউক। ইতি—

বাটাজোড় শ্রদ্ধাবনত তোমার গুণমুগ্ধ

৭ই বৈশাখ ১৩১৭, ১৯৩০ বাটাজোড়ের অধিবাসীবৃন্দ

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

অগণিত পুণ্য-কাহিনী বিজড়িত কীর্ত্তি-মালিকা চন্দ্রদ্বীপের কীর্ত্তি আজ প্রায় বিস্মৃতির পথে এসে দাঁড়িয়েছে দেখে, বহু ভীমকর্ম্মা মল্ল ও দুর্দ্ধর্ষ বীরগণের শৌর্য্য-গাথা সুগন্ধার মতই নিশ্চিহ্ন-প্রায় লক্ষ্য করে, বেদ-মন্ত্র-মুখরিত যজ্ঞ-ধূম-পবিত্র চন্দ্রদ্বীপের নিসর্গসুন্দর বিশাল আকাশ আজ রেষারেষি দলাদলি, পরনিন্দা, পরনির্য্যাতন, আসুরিক আত্মপ্রতিষ্ঠার ঘৃণ্য ও হেয় পূতিগন্ধে বিষাক্ত হ'তে দে'খে তুমিই ধরেছিলে "উজ্জ্বল-ভারতের" আলো-বর্ত্তিকা সর্ব্বজন সমক্ষে তার প্রতিকার কল্লে ; সবরমতির ঋষির অহিংসা অসহযোগ-সিদ্ধ মন্ত্রের মূর্ত্তি তুমিই দেখেছিলে তোমার "স্বরাজ সেবক সঙ্ঘে" ; বর্ত্তমান সভ্যতার বিশ্বহিতের মিথ্যা মুখোস উন্মোচন করে দিয়েছিলে তোমার "বিশ্বকল্যাণে" ; বহু শতাব্দীর পূঞ্জীভূত অখণ্ডনবাদের পরিবর্ত্তে বিজ্ঞান-প্রসূত সাম্যবাদের অপূর্ব্ব "বেদান্ত ভাষ্য" জগতে তোমার এক মহৎ দান।

অশ্বিনীকুমার বিরহিত বরিশালের এ ঘোর দুর্দ্দিনে তুমিই ছিলে প্রকৃত কর্ণধার, ধ্বংসের ভিতর সৃষ্টি মাধুর্য্য বাণী প্রচার করতে যেয়ে স্বার্থান্বেষী কুচক্রীদের হাতে তোমাকেই সর্ব্ব প্রথম লাঞ্ছনা বরণ করতে হয়েছিল ; বরিশালের নির্বীর্য্য আত্মম্ভরী জন-শক্তির কাছে তুমি তোমার কাজের পুরস্কার পেয়েছিলে পদে পদে লাঞ্ছনা, অপমান, উপেক্ষা—ছুটে গিয়েছিলে তাই তুমি দধীচির প্রাণ পেতে

নিভৃত তপস্যায়, অন্তরাত্মায় শুনেছিলে তুমি নিরস্ত্র সেনাপতির জগৎ-বিমুগ্ধ অভিনব সমরাভিযানে বরিশালের নায়কত্বে তার আকুল আহ্বান—তাই ছুটে এসেছ পুনঃ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নিয়ে গো-গৃহ যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ বীর একক অর্জ্জুনের মত বীর দম্ভে সকল অনাচার অবিচার ধ্বংস করে মানুষের ন্যায্য দাবী ও অধিকার স্থাপন করতে।

শরৎকুমার! অশ্বিনীকুমারের লীলা-নিকেতনে, জগদীশচন্দ্রের তপোবনে, কালীশচন্দ্রের সেবাতীর্থে, সতীন্দ্র নাথের কর্ম্মভূমে তোমার দান অতুলনীয়; সার্থক হোক তোমার প্রতিজ্ঞা, পূর্ণ হোক তোমার অভিলাষ, সফল হোক তোমার দেশমাতৃকার প্রকৃত আরাধনা ও বাস্তব পূজা।

শরৎকুমার! তোমার এই নিরুপদ্রব বিজয় অভিযানের সাফল্যের উপর, তোমার এই ধীর শান্ত ভিক্ষুকের যাত্রার সার্থকতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে জন-বহুল এই বরিশালের ভাগ্যচক্র, দ্বাদশ ভৌমিকের এই সুজলা সুফলা বাংলার জীবন মরণ আর আসমুদ্র হিমাচল এই বিশাল ভারতের উত্থান পতন।

প্রাণে কামানের লড়ায়ে ফিরে এস তুমি ধর্ম্ম সংস্থাপনে কুরুক্ষেত্রে পার্থ-সারথি কৃষ্ণের মত সিদ্ধকাম হ'য়ে, দেবতার চরণে এই আমাদের ঐকান্তিককামনা—বন্দেমাতরম্।

চৈত্র, ১৩৩৬, রহমতপুর, ১৯২৯ তোমার গুণমুগ্ধ

রহমতপুর কেন্দ্রের অধিবাসীবৃন্দ

ভারতের সুসন্তান দেশপূজ্য শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের রহমতপুর আগমন উপলক্ষে অভিভাষণ

মহাত্মন্!

জগতের শ্রেষ্ঠতম পুরুষের সমর শয্যায় সেনাপতিরূপে আপনাকে আমাদের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া আমাদের পল্লী আজ গৌরবান্বিত। তাই সমস্ত বালকদলের পক্ষ হইতে আপনার এই জয়-যাত্রায় আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন প্রদান করিতেছি।

দেব! সবরমতি ঋষির প্রিয় শিষ্য আপনি; আপনার চরিত্র-মাধুর্য্যের অভ্যন্তরে আমরা তাঁহারই অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি। যেদিন অসহযোগ আন্দোলনের তূর্য্য-নিনাদ শ্রবণে উন্মত্তের ন্যায় আপনি "সকলকিছু" ত্যাগ করিয়া সেই সংগ্রামে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন, আপনার সে দিনের জলদ গম্ভীর আহ্বানে আসমুদ্র হিমাচল চিহ্নিত এই বঙ্গদেশ মরণদোলায় দুলিয়াছিল। সেদিনের ভৈরব রব আজও আমাদের কর্ণে বিচিত্র ভাবে ধ্বনিত হইতেছে।

তারপর আসিল দমন-নীতির ভৈরব রথ, সে চক্র-নেমীর পেষণে সমগ্র ভারতবর্ষকে দলিত মথিত করিবার অবিরাম চেষ্টা চলিয়াছিল, সে নিষ্পেষণে আপনার বিরাট স্বাধীন আত্মাকে জাতির চক্ষে যেন অধিকতর মহান্ ও অধিকতর বরণীয় করিয়া দিল।

ইহার পর যখন ভারতের রাজনৈতিক গগন গৃহ-বিচ্ছেদে ও দলাদলির ঝঞ্ঝায় আলোড়িত, তখন গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপনিও রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সেই চির-কিশোর রসরাজের অনুসন্ধানে শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

হে চিরবিদ্রোহি! আত্মা যার বিদ্রোহে রত তিনি কখনও অত্যাচার অবিচারের সম্মুখে উদাসীন থাকিতে পারেন না, তাই বৃন্দাবনের চির শান্তিময় ক্রোড়ে অবস্থান কালেও আপনার সেই বিদ্রোহী আত্মার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আমরা বিস্মিত হইয়া যাই।

এবার আসিয়াছে ভারতব্যাপী মরণের আহ্বান, ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে অহিংস মন্ত্রের ঋষি ডমরু ধ্বনিতে সমগ্র ভারতবর্ষকে আইন অমান্য সমরে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছেন। যখন সমগ্র ভারতবর্ষ সেই আন্দোলনের দোদুল দোলায় দুলিয়া উঠিয়াছে, তখন বরিশালবাসী সকলে আমরা কর্ণধারবিহীন হইয়া দিশেহারা হইয়াছিলাম। আজ প্রাতঃস্মরণীয় অশ্বিনীকুমারের বরিশাল নেতৃত্ববিহীন হইয়াছিল। বরিশালের আদরের দুলাল সতীন্দ্র নাথ আজ কারাগারে। চারিদিকের এই বিপদপাতে যখন আমরা বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি সেই সময় আপনার সেই চির পরিচিত জলদ গম্ভীর ধ্বনি বরিশালের আকাশ বাতাস

প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। আজ আর আমাদের ভয় নাই, চিন্তা নাই! আজ জয়ের আশা লইয়া সমগ্র বরিশালবাসী সেনাপতির একটি ইঙ্গিতে জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

পূর্ব্ব গৌরবচ্যুত রহমতপুরের পক্ষে আপনার মত বিরাট মানবকে অভিনন্দিত করিবার কল্পনা বাতুলতা বলিয়া মনে হইতে পারে, তাই আপনার নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন আমাদের শত শত অপরাধ আপনি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। রহমতপুরের আজ আর পূর্ব্ব গৌরব নাই, কিন্তু গত স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই রহমতপুর গ্রাম বরিশালের অন্যান্য গ্রামের সমতালেই তাহার আন্দোলন পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই স্বদেশী যুগের "বাঙ্গলার মুকুটহীন রাজা দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথের" পদার্পণে এই রহমতপুর গৌরবান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ আমরা শক্তি-সামর্থ্যহীন, আমাদের আদর্শ স্থানীয় দেশপ্রেমিক ৺বাবু মতিলাল চক্রবর্ত্তী ও ৺বাবু সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর মহাপ্রস্থানে আমরা পরিচালকবিহীন হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু আয়োজন আমাদের যতই সামান্য হউক না আপনার আদর্শ সংগ্রামে যোগদান করিবার জন্য এই রহমতপুর অন্য কোন গ্রাম হইতে বোধ হয় পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না।

হে চির সন্ন্যাসী! স্বাগতম্! আজ সর্ব্ব কার্য্যের যিনি কর্ত্তা তাঁহার শ্রীপদে আমরা সকল গ্রামবাসী একমনে

এক কণ্ঠে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার জয়যাত্রা সফল হউক। "শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ"

২৬শে চৈত্র, বুধবার ১৩৩৬ সন। ইতি বিনীত নিবেদক

রহমতপুর বাল্যবন্ধু সমিতি।

সরকারের বিচারে লবণ আইন অমান্যের অপরাধে পুরুষোত্তমানন্দের ৬ মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হইল। নলচিড়া হইতে প্রথমে বরিশাল আনিয়া সেখান হইতে প্রথমে ঢাকা জেলে তাঁহাকে প্রেরিত করে, সেখান হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে রাখিয়াছিল। পুরুষোত্তমানন্দ জেলে যাওয়ার পর উষাঙ্গিণী দেবী গ্রামে গ্রামে মহিলা সভা করিয়া তেজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। যে দিন সরোজিনী নাইডু কারাগমন করেন, সেদিন বরিশালে ভোর ৩টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত হরতাল হয়, উষাঙ্গিণী দেবী প্রভৃতি পিকেটিং করেন। সেই দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উষাঙ্গিণী দেবীকে বলিয়াছিল—আপনারা ঘরে ফিরিয়া যান। তদুত্তরে উষাঙ্গিণী দেবী বলিয়াছিলেন—ঘর কি আমাদের রাখিয়াছ? স্বামী পুত্র সবাইকে জেলে পুরিয়াছ, তাঁহাদের অসমাপ্ত কর্ম্মভার আমাদের উপর পড়িয়াছে, আমরা সেই দিন ঘরে ফিরিব, যেদিন এই কর্ম্মের শেষ হইবে। যোগ্য পত্নী উষাঙ্গিণী দেবী এই ভাবে স্বামীর আরব্ধ কর্ম্মকে তাঁহার অবর্ত্তমানে জিয়াইয়া রাখিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তমানন্দ জেলে বসিয়াও বিশ্ব এবং বিশ্বনাথের সেবায় রত ছিলেন। যে ছয়মাস তিনি জেলে ছিলেন, প্রতিদিন গীতার ক্লাস করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অমিয় চরিত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করিয়াছেন। সেই সময় বাংলার প্রায় বিশিষ্ট নেতাগণই জেলে ছিলেন, দিনের পর দিন গীতা ভাগবতের এক যুগোপযোগী অভিনব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। জেলের ভিতর দিনাজপুর নিবাসী রসিকলাল গুহ নামে এক ভদ্রলোক পুরুষোত্তমানন্দের প্রতি ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে ছয়মাস কারাবাসের পর পুরুষোত্তমানন্দ বরিশাল ফিরিয়া আসিলেন। কয়েক দিন বিশ্রাম করিয়া পুনরায় নূতন করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি ভঙ্গি লইয়া তাঁহার প্রচারিত ভাগবত ধর্ম্মের প্রচার মানসে স্বরাজ সেবক সঙ্ঘের গৃহে 'আনন্দ-মঠ' নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। আরম্ভের দিন শ্রীনিত্যগোপালের চরণ-তলে বসিয়া উষা কীর্ত্তন গীতা ব্যাখ্যা এবং বক্তৃতা করিয়া আনন্দ-মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সময় উজ্জ্বলভারত নামে একখানি পুস্তিকা ছাপাইয়া বাহির করিয়াছিলেন। বিপ্লবী পুরুষোত্তমানন্দের সামনে আবার এক নূতন সমস্যা আসিয়া দেখা দিল। তিনি জেল হইতে আসিয়া দেখিলেন বরিশালে তিনটী সিনেমা চলিতেছে,

আবার কলিকাতা হইতে মিনার্ভা ও মনোমোহন থিয়েটার আসিতেছে এবং এই সবের জন্য অশ্বিনীকুমারের টাউন হল ভাড়া দেওয়া হইবে। ইহার বিরুদ্ধে তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। দরিদ্র দেশবাসীর অর্থ এইভাবে শোষণ তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। তিনি দেশবাসীর নিকট এক আবেদন পত্র ছাপাইয়া বিলি করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল—'অর্থের অভাবে দেশে হাহাকার উঠিয়াছে। কলিকাতা গোলাঘর, বরিশালে আজ ধান বিক্রয় নাই। এমন দারুণ দুর্দ্দিনে বরিশালে ৩টি সিনেমা চলিতেছে, আর একটি নির্ম্মিত হইতেছে। সর্ব্বোপরি মিনার্ভা ও মনোমোহন থিয়েটার আসিতেছে। এ দারুন পাপ ও কলঙ্ক হইতে বরিশালকে রক্ষা করিতে এ যাবত কেহ অগ্রসর হইতেছে না, বাধ্য হইয়া তোমাদের দীন সেবক কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। এই শোষণের পথ, পাপের পথ রুদ্ধ করিতেই হইবে। বরিশালবাসীর স্নেহ মমতা আমার চির সম্বল। সে ভরসা আমার আছে বলিয়াই তোমাদিগকে অনুরোধ করি, তোমরা কেহ এই সিনেমায় ও থিয়েটারে গমন করিও না, আমার লাঞ্ছনা বৃদ্ধি করিও না, ইহাই আমার নিবেদন।'

স্নেহ-ভিক্ষু পুরুষোত্তমানন্দ

সিনেমা পাপ কেন? বলিয়া তিনি একটি লেখা ছাপাইয়া বাহির করিয়াছিলেন তাহাতে ছিল—

"সিনেমা ও আর্ট"

হাসিতে আর্ট আছে, চোখের জলেও আর্ট আছে; জীবনে আর্ট আছে, মরণেও আর্ট আছে; ফুল-শয্যায় আর্ট আছে, শ্মশানে আর্ট আছে। কিন্তু সব সময় সব দেশে সব পাত্রে সব আর্ট শোভা পায় না। স্বামীর বেঁচে থাকবার দিনে নারীর যে আর্ট, তা যদি সে স্বামীর মরণের দিনেও আস্বাদন কর্ত্তে যায়, তবে হয় সে উন্মাদিনী, নয় তো ব্যভিচারিণী। তোমাদের রামকৃষ্ণ, দীনেশ—জানি তাদের পন্থা ভুল, তবুও তারা দেশের ছেলে, মাকেই ভালবাসতে চাইত যে দিন মা মা বলে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেছিল, সেদিন যদি ফাঁসি কাষ্ঠের পাশে দাঁড়িয়ে আর্ট উপভোগ করে থাক, তাতে কি জাতির মনুষ্যত্ব বেদনায় চিৎকার করে ওঠেনি? জাতি আজ দিশেহারা, আত্মহারা! ওগো তোমরা তার হৃদয়ের বেদনাকে হাসির নেশায় উড়িয়ে দিয়ে আর আত্মহত্যার পথে ছুটিয়ে দিও না। মদ খেয়ে পুত্রশোক ভুলতে দেখেছি, ভারতও তাই নেশার ভিতরে সকল শোক ভুলবার চেষ্টা কচ্ছে?

পরাধীন জাতির অধিকার নেই, শক্তিও নেই যে সে ভোগের পথে আর্টের আস্বাদন করে, তার জন্য প্রয়োজন তপস্যার ও বৈরাগ্যের আর্ট। মহাযোগী শুকদেব রাসলীলার আর্ট বর্ণনা কর্ত্তে পারেন, আর মরণের কোলে বসে মরণকে সকল প্রাণ-মন দিয়ে বরণ ক'রে মহারাজ পরীক্ষিৎ রাস

লীলার আর্ট আস্বাদন কর্ত্তে পারেন। তোমরা কি এ আদর্শ মেনে নিতে রাজী আছ? বদ্ধের পক্ষে প্রথমে আর্টকে যোগের পথে নিতে হবে, মুক্ত হলে তবে বটে অধিকার হবে হাসির পথে আর্টকে পাবার। আর্ট পরাধীন জাতিকে আরও পরাধীন করে। বদ্ধের হাসি-খেলা সবই প্রেতের হাসির মত বিড়ম্বনাময় বস্তু-তন্ত্রহীন, সামান্য দুঃখের সামনে সে হাসি বিলীন হয়ে যায়। বদ্ধের জীবন সার্থক হয় ত্যাগ-বৈরাগ্যে। মহামানবের উপাসক তোমাদের লেনিন দীর্ঘকাল ঘর ছেড়ে পথে পথে সাদা বরফের মাঝে আর্ট খুঁজে ছিলেন; তাই না আজ তার দেশে সিনেমায় আর্ট প্রসারিত হচ্ছে? যখন বলতে শুনি—ইংলণ্ড জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশ যুদ্ধও করে, আমোদ-প্রমোদও করে, তখন কি ভুলে যাই না যে তারা আমাদের মত পরাধীন নয়, তারা আর একটা জাতির পায়ের তলে এমনি করে জুতো খেয়ে দিন কাটায় না। বিজ্ঞান তাদের গোলাম, তাই তারা বিজ্ঞানের সাহায্যে অন্য জাতির রক্ত শোষণও কর্ত্তে ও সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফোয়ারা তুলতে পারে। ভারতবর্ষ কি ইংলণ্ড না জার্ম্মেনী? বিজ্ঞান তোমার কাছে বিজ্ঞান নয়, অজ্ঞান। পরাধীন জাতির বিজ্ঞান, অর্থ, শিল্প কলা কিছুই নেই। তার যদি বিজ্ঞান শিখতে হয়, তবে প্রথমে শিখতে হবে মরণ-বিজ্ঞান, মরণ কলা। মহাত্মাজী লিখছেন, Art kills life, art gives life। বর্ত্তমান দুঃখ বেদনার

মাঝে হাসি শুধু কান্নাকেই বাড়িয়ে তুলবে। মরণকে বরণ কল্লেই তার মরণ জীবন হয়ে ফুটে উঠবে। উপনিষদ্ ঐ শোনাচ্ছেন "বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যা অমৃতমশ্নুতে"—মরণ দিয়ে মরণ পার হতে হবে—তবে বটে জীবনের সবকিছু সম্ভব হবে ও অমৃতের আস্বাদন মিলবে।

স্বাধিকারপ্রমত্ত পাশ্চাত্ত্য প্রকৃতিকে লুট কচ্ছে, তাতে সে ভারতের চেয়ে অধিকতর দক্ষ হলেও অচিরাৎ প্রকৃতির সামনে তাকে মাথা হেঁট কর্ত্তে হবে; প্রকৃতির প্রতিশোধ তার দর্প চূর্ণ করবে। প্রকৃতির সর্ব্বোচ্চ বিলাসই আর্ট। কিন্তু সে প্রকৃতিকে বিশ্বেশ্বরের কিম্বা বিশ্বের সেবায় না লাগিয়ে নিজের ভোগে লাগাবার জন্য মানুষ যখন বদ্ধপরিকর হয়, তখন সে প্রকৃতির উপর ব্যর্থ বল প্রয়োগই করে, সে প্রকৃতিকে অসতী বানাতেই চায়। প্রকৃতি দীর্ঘকাল তার কাম জোটায় না, তার রুদ্রাণী মূর্ত্তি একদিন তার সকল বিজ্ঞানকে ভেঙ্গে চুড়ে একাকার ক'রে দেয় এবং সেই শ্মশানের উপরে সে সেবাময় বিজ্ঞান স্থাপন করে। নারীত্বের যেমন ব্যবসা চলা উচিত নয়, জগৎ যত সভ্য হবে, আর্টের ব্যবসাও তত চলবে না। ইংলণ্ড জার্ম্মেনী যতই সভ্যতার দাবী করুক, ভারতীয় আদর্শের কাছে তারা শিশু। আর্ট মানুষের মধুরতম প্রবৃত্তিকে সেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে, তবেই সে সতী, সে সর্ব্বমঙ্গলা; তাকে নীচে নামিয়ে কেবল দু' মুঠো অন্নের জন্য কিম্বা পরের রক্ত

শোষণ করবার জন্য কিম্বা আর একটা জাতিকে নেশায় মাতাল ক'রে রাখবার জন্য প্রয়োগ কল্লে আর্ট ব্যভিচারিণী হয়। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মত কলাবিৎ (Artist) দ্বিতীয়টি নেই; তিনি আর্টকে শোষণের পথে না লাগিয়ে ত্যাগের পথে—মরণের পথে লাগাতে পেরেছিলেন। যা সত্য আর্ট, তাতে শোষণের গন্ধ থাকবে না, থাকবে শুধু পোষণ। যারা আর্ট নিয়ে ব্যবসা কচ্ছেন আর যারা সেই ব্যবসায়ের খোরাক যোগাচ্ছেন, উভয়েই তুল্য অপরাধী। আর্টকে অমনতর বাজারে নাচাতে নেই, মা সরস্বতী নাচতে পারেন ভগবানের সামনে, ভগবৎ-সেবার জন্য, কারও কোন ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নয়। এর একটা মোটা দিকও আছে যাকে মানুষ আত্মসুখের জন্য লাগালেও লাগাতে পারে, কিন্তু যা মানুষের সবচেয়ে উন্নততম, উজ্জ্বলতম প্রকৃতি তাকে কখনও বিশ্বের সেবা ব্যতীত অন্য কোথাও লাগালে তা পরিষ্কার ভগবৎদ্রোহ, বিশ্বদ্রোহ বা দেশদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়। মহাত্মাজী যেদিন খদ্দরের বাণী শোনাচ্ছিলেন তখনও এমনিতর একদল লোক "আর্ট গেল—আর্ট গেল" বলে চিৎকার আরম্ভ করেছিল, তাদের চিৎকার আজ থেমে গিয়েছে, বর্ত্তমানের চিৎকারও থেমে যাবে আমরা জানি। তাই মরণের ভিতরে দাঁড়িয়ে আমি সকলের পায়ে পড়ে অনুরোধ জানাচ্ছি—তোমরা অবহিত হও, সিনেমার অমঙ্গল স্পর্শ পরিত্যাগ কর, বেদনাকে আরও

তীব্র করে তোল; বেদনার ভিতরে আত্ম সাক্ষাৎকার মিলবে, জাতি মুক্তির আস্বাদন ক'রে কৃত কৃতার্থ হবে।

আনন্দমঠ, বরিশাল — স্নেহভিক্ষু

৩০শে শ্রাবণ ১৩৩৮ — পুরুষোত্তমানন্দ

যে দিন মিনার্ভা ও মনোমোহন থিয়েটার বরিশালে আসিল, সেইদিন হইতেই পুরুষোত্তমানন্দ সদল বলে থিয়েটারের প্রবেশ দ্বারে পিকেটিং আরম্ভ করিলেন, যাহাতে কেহ থিয়েটারে না যায়। কিন্তু অভিনয়-অনুরাগী উন্মত্ত জনতাকে রোধ করা সম্ভব হইল না। অল্প কিছু লোক গোপন পথে ঢুকিয়াই অভিনয় দেখিল। এই ভাবে দ্বিতীয় তৃতীয় দিনও পিকেটিং চলিল এবং কিছু লোক লইয়া অভিনয়ও চলিল। চতুর্থ দিনে সাব ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু কতকগুলি লাঠিধারী বন্দুকধারী পুলিশসহ ঘটনাস্থলে আসিয়া হাজির হইল এবং জনতাকে নিরস্ত করিবার প্রচেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দুইজন সার্জেন আরও কিছু সংখ্যক পুলিশসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াই পিকেটিংকারীদিগের উপর বেপরোয়া ভাবে লাঠি চালাইতে আরম্ভ করিল। তাহারা শরৎবাবুকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সেই অহিংস দেশ-সেবক সর্ব্বস্ব-ত্যাগী সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দকে লগুড়াঘাতে জর্জরিত করিয়া তুলিল। সেই আঘাতে তাঁহার একটি আঙ্গুল শেষ দিন পর্য্যন্ত কম

জোড়ী হইয়া ছিল। এই নির্ম্মম ঘটনায় বরিশালের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জোড় আন্দোলন করিতে লাগিলেন। বীর সাধক পুরুষোত্তমানন্দ পুলিশের অত্যাচারে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে চ্যুত হইলেন না, অহিংসব্রতী সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দ দেশের পাপ, দেশের কলঙ্ক মুক্ত করিবার প্রয়াসে প্রায়োপ-বেশন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উপবাসের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য একটি লেখা ছাপাইয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাহাতে ছিল—

"আমার উপবাস

'উপবাসপ্রিয়ঃ হরিঃ'—'কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ'

যেখানে অহর্নিশ খাওয়া-পরা নিয়ে কাড়াকাড়ি চল্‌ছে, সেখানে যদি না-খাওয়া, না-পরার একদল না থাকত, তা হলে কি কাঙ্গালের ভাগ্যে এক কণা অন্ন, কিম্বা এক টুকরা ছেঁড়া কাপড়ও জুটত? না লোভীদেরই শিক্ষা হত যে খাওয়া-পরার পথই সংসারে বড় হওয়ার পথ নয়? বড় যে, সে খায় না, সে পরে না, সে ঘরে থাকে না, সে অনন্ত দুঃখই বরণ করে। তাই উপবাস হরির প্রিয়। তাই কৃষ্ণের প্রীতির দিকে তাকিয়ে শাস্ত্র ভোগ ত্যাগ কর্ত্তে বলছেন, কৃষ্ণ যে পালক ও পোষক, তিনি ত শাসক ও শোষক নন্। দেহকে ভোগের পথে অতি মাত্রায় বাড়িয়ে তুল্লে দেহ ও আত্মার কোন রকমেই সমন্বয় হতে পারে না। স্বর্ণ সিন্দুর যতই ঘর্ষিত হয়, ততই যেমন তার ভিতরের শক্তি

বাড়ে, হোমিওপ্যাথির ঔষধের ডাইলিউসন যতই বাড়ে ততই যেমন তার শক্তি বাড়ে, তেমন দেহকে যতই ভোগ-ত্যাগের দ্বারা ঘর্ষণ করা যায়, ততই তার অন্তর্নিহিত প্রাণ-শক্তির বিকাশ উপলব্ধ হয় এবং সেই প্রাণ নারায়ণ ও নরের সেবায় লাগান চল্‌তে পারে। তাই হিন্দুর যখনই কোন ব্রত উদ্‌যাপন কর্ত্তে হবে, তখনই তার উপবাস বরণ করে নিতে হবে।

উপবাস দু' রকমে চলতে পারে—(১) সারাজীবন অতি অল্প মাত্রায় খেয়ে কিম্বা (২) দীর্ঘ দিন একেবারে অনাহারে থেকে। দেশ, কাল ও পাত্র যখন ব্রত-উদ্‌যাপনের অনুকূল থাকে, তখন প্রথম শ্রেণীর উপবাস চল্‌তে পারে, তখন দিনের পর দিন তিল তিল ক'রে রক্ত দিলেও ব্রত পূর্ণ হতে পারে; কিন্তু দেশ, কাল, পাত্র যখন প্রতিকূল, তখন একদম নরবলির প্রয়োজন, short cut-এর প্রয়োজন। তখন তিল তিল করে প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ, কিম্বা তিল তিল করে প্রাণ দেওয়ার সুযোগ সাধকের জুটবেই না। তাই অমাবস্যার মাঝে যেখানে নিজকে চিনবার পর্য্যন্ত পথ নেই, সেখানেই নরবলির ব্যবস্থা। ভগবতী সতী, ম্যাকসুইনী ও যতীন দাস এর দৃষ্টান্ত স্থল। শাক্ত ঐ সাধনা জানত, শাক্তের সাধনা যতই সিদ্ধির পথে যেতে থাকে, বৈষ্ণবের তিল তিল করে মরবার পথ ততই সরল ও সুগম হয়ে থাকে। শাক্ত ও বৈষ্ণব একই অখণ্ড

জীবনে দুইটী ধারা। হিন্দু মুসলমান মিলনের পথ মহাত্মা যেদিন খুঁজে পান নি, তখন মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘ ২১ দিনের উপবাস বরণ করেছিলেন—এ তাঁর শাক্ত সাধনা। কিন্তু এখন যে তিনি না খেয়ে না দেয়ে ঘরে না থেকে তিল তিল করে মরছেন—এ তাঁর বৈষ্ণব সাধনা। কোন একটী পথেই আত্মশুদ্ধি চলে না, এ-যে শাক্ত বৈষ্ণব সমন্বয়ের যুগ। উপবাস মানুষের সঙ্গে আড়াআড়ি করে নয়, নিজের সুপ্ত প্রাণকে জাগ্রত ক'রে মানুষের ভিতরে তার প্রাণের সাড়া জাগিয়ে অদ্বয় প্রাণের আস্বাদন করাই উপবাসের প্রয়োজন। ঘরের কোণায় চুপ করে হরিনাম করার চেয়ে মহাপ্রভু প্রকাশ্য রাস্তায় উচ্চ কীর্ত্তনের মহিমা কীর্ত্তন করেছেন। নীরবে উপবাসের চেয়ে জন-সাধারণের ভিতরে বসে উপবাস করার শক্তি অনেক বেশী। নীরব সাধনায় ব্যক্তিগত জীবনের শুদ্ধি হয় বটে, কিন্তু প্রকাশ্য সাধনা ব্যতীত মানুষের জাতীয় জীবন কখনও বিকশিত হয় না। যে জগৎকে ও জগন্নাথকে নিজে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, সে সব সময়ই এ সাধনা বরণ কর্ত্তে পারে।

আমি বর্ত্তমানে যে উপবাস-ব্রত গ্রহণ করেছি, তার নৈতিক মূল্য হিসাবে কারও কারও সন্দেহ আছে, তাই আমি আট দিন উপবাসের মধ্যেও নিজেই উপবাসের ব্যাখ্যা দিচ্ছি। যারা মহাত্মাজীর দোহাই দিয়ে আমার উপবাসকে সঙ্গত বোধ করেন না, তাঁদের নিকট নিবেদন

এই—আমি উপবাসকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসবার বহু পূর্ব থেকে সাধন বলে বুঝেছি। তারপর মহাত্মাজীর অনুশাসনের আলোচনা করলেও দেখতে পাই, যেখানে শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্বন্ধ রয়েছে, সেখানে উপবাস-ব্রত গ্রহণ করার ব্যবস্থা তিনি দিয়াছেন। বরিশালের জনসাধারণ আমাকে শ্রদ্ধা করেন, চকবাজারের ব্যবসায়ীগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই আমায় বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। তার পরিচয় আমি বহু বার বহু ক্ষেত্রে পেয়েছি। আড়াআড়ির দিক দিয়ে দেখলেও—অবশ্য আমি অত নীচুতে উপবাসকে টেনে আনতে চাই না—আমি বরিশালের সঙ্গে, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বালকের মত, বন্ধুর মত অভিমান ভরেও উপবাস বরণ করে নিতে পারি।

কংগ্রেস বিদেশী-বস্ত্র দূর কর্ত্তে যা পারেন করেছেন, বাড়ী বাড়ী ঘুরে ২০টী সেবক রাখবার সুবিধাটুকু তার হয় নি। নারী-সমিতিও এ বিষয়ে সাধ্যানুরূপ চেষ্টা কর্চ্ছেন, সফলতা আসে নি। এই অন্ধকারের মাঝে মায়ের কৃপা লাভ করবার জন্য নিজকে সোজাসুজি বলি দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখিনি। আমার পথে চলবার জন্য কাউকে টানাটানি করিনি। তবুও যদি আমার কার্য্যে কাহারও হৃদয়ে বেদনা লাগে, তাদের বেদনা দূর করবার উপায় আমার মরণ ছাড়া আর কিছুই নেই। আমার সম্বল শুধু বেদনা। কারও নেতৃত্ব বা কর্ত্তৃত্ব লোপ করবার আকাঙ্ক্ষাও আমার নেই।

বরিশালের সর্ব্ব ক্ষেত্রে আজ যে অমানিশার ঘন অন্ধকার ছেয়ে পড়েছে, তার মাঝে মা মুক্তকেশীর মধুর হাসি দেখবার জন্যই নিজের বুকে শ্মশান টেনে এনেছি। আমার কোন দুঃখ নেই, আমি বেশ আরামেই ব্রজের পথে চলেছি। বাঙ্গলার নর-নারী আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

চক বাজার, বরিশাল স্নেহ-ভিক্ষু
২৫শে ভাদ্র ১৩৩৮ সন। পুরুষোত্তমানন্দ"

এইভাবে দিনের পর দিন পুরুষোত্তমানন্দ চক বাজারে অনশন রত, দেশবাসীর আন্দোলন, তবুও অর্থলোভী কর্ত্তৃপক্ষ অচল অটল তাহাদের সঙ্কল্পে। একমাস কাটিয়া গেল পুরুষোত্তমানন্দ মুমূর্ষু-প্রায়, বাংলা দেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল একনিষ্ঠ দেশসেবকের এই ভীষণ মৃত্যু-পণ দেখিয়া। কলিকাতার গুরু-ভ্রাতাগণ এবং বিশিষ্ট নেতাগণ বরিশাল যাইয়া উপনীত হইলেন। এই নিদারুণ সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সকলে মিলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কত স্থান হইতে যে এই ভীষণ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য পত্র আসিতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সময় যে সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সিনেমায় যাইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা-পত্র দিয়াছিল তাহা এখানে তুলিয়া দিলাম।

(১) পরম ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

পরম ভক্তিভাজনেষু মহাত্মন্,

আপনি যে মহান উদ্দেশ্য লইয়া অনশনে মরণ পথের যাত্রী হইয়াছেন, তাহা আমরা অবগত আছি এবং থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আপনার যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আপনার বরিশাল আপনাকে মরিতে দিতে পারে না এবং আমরাও আপনাকে মরিতে দিব না। আমরা আপনার নিকট একবার সঙ্কল্প করিয়াছি এবং পুনরায় সেই সঙ্কল্প স্মরণ করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে—বর্ত্তমানে বরিশালে প্রচলিত দুর্নীতিমূলক বায়স্কোপ বর্জ্জন করিয়া আমরা আপনার মহতী প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিতে যথা-শক্তি চেষ্টা করিব।

ভক্তি-প্রণত

বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ।

(২) আমরা বরিশাল ব্রজমোহন মেডিকেল স্কুলের ছাত্রবৃন্দ সমবেত ভাবে শ্রীযুত স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজকে আমাদের সবিনয় অনুরোধ জানাইতেছি যে, আমরা দুর্নীতিমূলক বায়স্কোপ বর্জ্জন করিয়া আমরা তাঁহার মহতী প্রচেষ্টার সহায়তা করিতে যথা সম্ভব চেষ্টা করিব।

(৩) হ্যানিমান মেডিক্যাল কলেজ

স্থানীয় ব্যবসায়ী বায়োস্কোপ ও থিয়েটারে যাইয়া লোকের নৈতিক চরিত্রহীন হওয়ার আশঙ্কায় উপবাস গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া হ্যানিমান

মেডিকেল কলেজের প্রফেসর এবং ছাত্রবৃন্দ সমবেত হইয়া এই মন্তব্য স্থির করিলাম যে, এই কলেজের কোন শিক্ষক কি ছাত্রগণ বরিশালের ব্যবসায়ীর থিয়েটার ও বায়োস্কোপে যোগদান করিবে না।

(৪) নথুল্লাবাদ ইংরেজী বিদ্যালয়

নথুল্লাবাদ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের এবং উক্ত গ্রামবাসীগণের এই সভা বরিশাল অশ্বিনী কুমার টাউন হলের কর্ত্তৃপক্ষকে এই অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন অবিলম্বে উক্ত টাউন হল হইতে সিনেমা দূর করিয়া দেন। এই সভা এই স্কুলের ছাত্রবৃন্দকে এবং বিশেষ করিয়া ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার জন্য যাহারা বরিশাল যাইতেছে তাহাদিগকে এবং গ্রামবাসীদিগকে অনুরোধ করিতেছে যে তাহারা যেন সিনেমা দেখিতে না যান।

(৫) চন্দ্রদ্বীপ স্কুল

চন্দ্রদ্বীপ ইনষ্টিটিউসনের শিক্ষক ও ছাত্রদিগের এই সভা বরিশাল অশ্বিনীকুমার টাউন হল কমিটীর ট্রাষ্টীদিগকে এই অনুরোধ জানাইতেছে যে, তাঁহারা যেন অনতিবিলম্বে উক্ত টাউন হল হইতে সিনেমা দূর করিবার বন্দোবস্ত করেন। চন্দ্রদ্বীপ ইনষ্টিটিউসনের শিক্ষক ও ছাত্রদিগের এই সভা আগামী মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে তাঁহারা যেন সিনেমা দেখিতে না যান।

এইরূপে ৪৫ দিনের অনশনের পর কর্ত্তৃপক্ষ অশ্বিনীকুমার টাউন হল হইতে সিনেমা তুলিয়া দিবার প্রতিজ্ঞাপত্র সহি করিল, এবং পুরুষোত্তমানন্দও ধীরে ধীরে আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সুস্থ হইয়া আবার আনন্দমঠের কাজে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। শ্রীযুক্তা উষাঙ্গিনীদেবীকে সঙ্গে লইয়া গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতি করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পোষণ-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। সেই সময় নদীয়া জেলায় ভেড়ামারা গ্রামে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন, সেইদিন তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম। তখনও তিনি দুইবেলা ভাত খান না, আমরা ফল কাটিয়া দিলাম, তাহাই আহার করিলেন। মানুষের জীবনে মনুষ্যত্ব জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা তিনি করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া নারী জাতির মাতৃশক্তিকে, পরাশক্তিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সময় তিনি শ্রীযুক্তা উষাঙ্গিনীদেবী, কন্যা নিত্যরঙ্গিণী ও শ্রীসুধাংশুকুমারী ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজনকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দীক্ষা প্রদানের মূল উদ্দেশ্য ছিল, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে সংহত হইয়া গলিয়া গিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া একটি পুরুষোত্তম কৃষ্টির সংঘ গড়িয়া তোলা।

পুরুষোত্তমানন্দের জীবনদেবতা তাঁহাকে স্থির থাকিতে

দেন নাই, যেহেতু তিনি গতিকে জীবনে স্বীকার করিয়াছিলেন। চার মাস পর পুনরায় বরিশালে সিনেমা আসিল, পুরুষোত্তমানন্দ সেবারেও সিনেমাকে বাধা দিবার জন্য বরিশালবাসীকে আবেদন জানাইয়া বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া বিলি করিলেন।

"ওঁ নিত্য

সিনেমা ও বরিশালের নরনারী

প্রায় চা'র মাস পরে আবার জিলাব্যাপী অনশন-আর্ত্তনাদের দুর্দ্দিনে, শ্মশানে সোনার প্রদীপের মত সহর-প্রান্তে ব্যবসায়ীর অভিসন্ধিপূর্ণ সিনেমা লিমিটেডের বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। উই পোকার মত পুড়িয়া মরিতে আবার একদল নরনারী ঐ পাপানলে নিজের সর্ব্বস্ব আহুতি দিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। হোক্ তারা মুষ্টিমেয়—কিন্তু বরিশালবাসীর পক্ষে যে উহা ঘোরতর কলঙ্ক। সহরবক্ষ হইতে এই পাপ-কালিমা বিদূরিত করিতে গত চা'র মাস পূর্ব্বে তোমরা যে দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলে, আজ আবার তাহার ব্যভিচার হইতে চলিয়াছে। সঙ্কল্প গ্রহণকারী বরিশালবাসী! আবার সকলকে স্মরণ করাও—"বরিশালে সিনেমা চলিতে পারিবে না।"; দৃঢ়তার সহিত সহস্রকণ্ঠে ঘোষণা কর—"সিনেমা দর্শন পাপ।", "সিনেমা শান্ত সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করে।", "নর-নারীর চিত্তকে অসংযমে মাতাল করিয়া তোলে।", "মদের

নেশার চেয়ে সিনেমার নেশা উগ্র।", "সিনেমা হিংসার জনয়িত্রী।", "সিনেমা সুশিক্ষা নয়, কুশিক্ষা বিতরণ করে।", "সিনেমা দরিদ্রের দেহ নিংড়াইয়া অর্থ শোষণ করে।", "সিনেমা স্বাধীনতা নয়, অধিকতর গোলামী আনয়ন করে।"।

সিনেমায় ধর্ম্ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, ক্ষণিক মোহ ব্যতীত শান্তির সম্ভাবনা নাই, ভগবৎ সম্পর্ক বিন্দুমাত্র নাই!—আছে, অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার একটা পৈশাচিক শোষণ মাত্র।

বরিশালবাসী! ধ্বংসের পথে চলিও না। বরিশালের আবহাওয়া বিশুদ্ধ করিতে, এই নবাঙ্কুরিত শোষণ-প্রচেষ্টাকে অগৌণে ধ্বংস করিয়া দাও। সিনেমার দুয়ারে তোমাদের যেন আর না দেখি। প্রাণ খুলিয়া বলিতেছি—আমার ঠাকুর তোমাদের মঙ্গল করিবেন। ইতি—

বরিশাল, ৬ই শ্রাবণ, ১৩৩৮ তোমাদেরই পুরুষোত্তমানন্দ।

দেশবাসীকে আবেদন জানাইয়া পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার দলবল লইয়া চকবাজারে অহিংসভাবে পিকেটিং আরম্ভ করিলেন। তিনি সর্ব্বদা সেখানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে সেবারেও দেশবাসীকে সিনেমায় যাওয়ায় প্রতিনিবৃত্ত করিলেন, সিনেমা বন্ধ হইয়া গেল। বিপ্লবী পুরুষোত্তমানন্দের সহগামিনী ও সহধর্ম্মিণী উষাঙ্গিণী

দেবীর দেহ এই কঠোর পরিশ্রমে অসুস্থ হইয়া পড়িল। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর যাবৎ স্বামীর সহিত তাঁহার সকল অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া দেশসেবা করিয়াছেন, দেহ আর কত সহ্য করিবে, স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। পুরুষোত্তমানন্দ ১৩৩৮ সনের অগ্রহায়ণ মাসে অসুস্থ পত্নী ও পুত্র-কন্যা-সহ স্ত্রীর চিকিৎসার্থে কলিকাতা চলিয়া গেলেন। বরিশালের কর্ম্মজীবন এইখানেই সমাপ্ত হইল।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ সামগ্রিক জীবনবাদের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। দেশ যখন দৈনন্দিন জীবন হইতে ধর্ম্মকে পৃথক করিয়া ফেলিয়া গভীর অন্ধকারের পথে আগাইয়া যাইতেছিল, তখন পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার জীবন দিয়া সংসার জীবন, রাজ-নীতির জীবন, ধর্ম্মজীবন কোন্ ছন্দে একই সঙ্গে সহজ ভাবে চলিতে পারে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার লিখিত বেদান্ত গীতা উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই পথভ্রান্ত মানব জীবনের সামনে সেই আলোর পথের সন্ধান প্রদান করিয়া, যুগ-জীবনের সামনে এক নূতন যুগের সামগ্রিক জীবনবাদের আহ্বান রাখিয়া গিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

এদিকে পুত্র সত্যব্রত সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে বাহির হইয়া কয়েকজন বন্ধুসহ ৩৩ নং কাঁকুরগাছি রোডে 'দেশী কালী সমবায়' নামে একটি ছাপার কালী তৈরী করিবার জন্য কারখানা খুলিয়াছিল। সেইখানে ঊষাঙ্গিনী দেবীকে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। পুরুষোত্তমানন্দ নিজে কলিকাতাতে বন্ধুবান্ধবদের নিকট থাকিয়া পুরুষোত্তম-শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব আস্বাদন করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার বুকের ভিতর কলিকাতাতে আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প জাগিল। তিনি কংগ্রেস আন্দোলন বা সমাজ সেবামূলক কার্যদ্বারা ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে, কোন আন্দোলন বা গঠনমূলক কাজ কার্য্যকরী হইবে না যদি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের কাঠামোকে বদলাইয়া না দেওয়া যায়। ভারতীয় দর্শনের প্রস্থানত্রয়ের ভিত্তির উপর স্থিতি গতি সমন্বয়ের কাঠামো প্রস্থাপিত করিয়া দার্শনিক বিপ্লব একটা সমাজের বুকে আনিতে হইবে, এবং তাহার কাঠামো বদলাইতে হইবে, নতুবা কিছুই গড়িবে না। ইহার জন্য চাই একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান যেখান হইতে এই কাজ

আরম্ভ করা যাইবে। যাঁহার হাতে একটি পয়সাও নাই তিনি কেমন করিয়া কলিকাতার বুকে বাসা ভাড়া করিয়া স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ ছয় সাত জন লোক লইয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব-প্রচারে ব্রতী হইবেন? কিন্তু এই দুঃসাহসের কার্য্যে ব্রতী হইবার প্রেরণাই তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের নিকট নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কেহ বারণ করিল, কেহ উৎসাহ প্রদান করিল। পুরুষোত্তমানন্দের বুকের মাঝে শ্রীনিত্যগোপাল যখন যে প্রেরণা দান করিয়াছেন, তাহা লোকের নিকট যত অসঙ্গত বা দুর্বোধ্যই হউক তিনি শ্রীগুরু-পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বলিতেন, কর্ম্ম নিত্যগোপালের, কর্ম্মের আরম্ভ তিনি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আমার প্রয়োজন তাহাকে রূপ দান করা, বর্ত্তমান যুগের যে দর্শন নিত্যগোপাল রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাকে লোকসমাজে পরিবেশন করা আমার কাজ। তিনি সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী ছিলেন বলিয়াই কোন কিছু করিতে বা বলিতে ভয় পাইতেন না। তিনি অভিঃ মন্ত্রের উপাসক ছিলেন।

বন্ধুবান্ধবগণ কেহ ৫৲, কেহ ২।১ টাকা করিয়া মাসিক চাঁদা এবং কিছু মুষ্টি ভিক্ষার চাউল দিতে স্বীকার করিলেন, কেবলমাত্র এই সামান্য সুযোগটুকু অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার প্রথম

প্রয়োজন হইল সত্যব্রত কালীর ব্যবসা ছাড়িয়া তাঁহার সহিত এই শূন্যের মাঝে ঝাঁপ দিবে কিনা, ইহা ভাবিয়া একদিন কাঁকুরগাছি গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া স্ত্রী পুত্র কন্যার নিকট নিজের সঙ্কল্পের কথা বলিলেন, কিন্তু পুত্র সত্যব্রত এই অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিতে স্বীকার করিল না। ইহাতে পিতৃ হৃদয় তাঁহার অত্যন্ত বেদনা-বোধে কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ঊষাঙ্গিণী দেবীর নিকট ১৯১৯ সনে তিনি চাকুরী ছাড়িবার পর নিত্য-গোপালের প্রেরণায় বেদান্তের যে ভাষ্য লিখিয়াছিলেন, যাহা জেলে যাইবার সময় ঊষাঙ্গিণী দেবীকে বলিয়া গিয়াছিলেন বাড়ীতে যদি কখন আগুন লাগে তবে সমস্ত পুড়িয়া যায় যেন, তুমি শুধু আমার এই বেদান্ত লইয়া বাহির হইও, ইহাকে যত্ন করিয়া রক্ষা করিও, ঊষাঙ্গিণী দেবী প্রাণপণে স্বামীর সেই আদেশ পালন করিয়া বেদান্তকে রক্ষা করিয়া স্বামী এবং বিশ্বের যে কতবড় সেবা করিয়াছেন, ইহার তুলনা হয় না; এই বেদান্ত যুগের যে কতবড় প্রয়োজন তাহা মানুষ আজ না বুঝিলেও একদিন বুঝিবে নিশ্চয়ই—পুরুষোত্তমানন্দ সেই বেদান্ত চাহিয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সত্যব্রতকে বলিলেন—“এই বেদান্ত তোকে দিয়ে আমি বিশ্বে প্রচারিত করিতে চাহিয়াছিলাম, তুই যখন নিলি না আমি বেদান্ত গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়া যাইব” এই বলিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে

স্নান আহার না করিয়া বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। অমন অগাধ পিতৃস্নেহ সত্যব্রতর হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিল, তখন বাবার নিকট যাইয়া বলিল আপনি বাসায় চলুন, স্নান আহার করুন, আমি আপনার সঙ্গে যাইব। সত্যব্রতর নিকট আশ্বাস পাইয়া তবে বাসায় ফিরিলেন। অবশ্য সে বেদান্ত সত্যব্রত লইতে পারে নাই। স্বামীজী পরবর্ত্তীকালে বলিয়াছেন, আমি সে দিন বেদনায় অভিমানে বলিয়াছিলাম বেদান্ত গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিব, কিন্তু শ্রীনিত্যগোপালের যুগ-দর্শন এই বেদান্ত আমি জলে ভাসাইবার কে? সত্যব্রত লইল না, যে কেহ একজন লইবেই, এ যে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন বেদান্ত, ইহাকে রক্ষা করিয়া যাওয়া এবং আমার জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া ইহার প্রচার ও মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়া যাওয়াই হইতেছে আমার কাজ। শ্রীনিত্যগোপালের এই কাজ লইয়াই তো আমি এই সংসারে আসিয়াছি।

সত্যব্রতর সম্মতি পাইয়া পুরুষোত্তমানন্দ কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া কালীঘাট ২৪।২ শাহানগর রোডে দোতলার উপর ৪৫৲ টাকা দিয়া একটি বাসা ভাড়া করিলেন। স্বামীজীর বন্ধুবর শ্রীযুত হরিদাস মজুমদার মহাশয় ৬ মাস বাড়ী ভাড়ার এই ৪৫৲ টাকা দিয়াছিলেন। ১৩৩৯ সনের ২৬শে কার্ত্তিক শ্রীরাসপূর্ণিমার দিন স্বামীজী স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঐ দিন

শ্রীনিত্যগোপালকে স্থাপন করিয়া বন্ধুবান্ধবগণকে লইয়া পুরুষোত্তমানন্দ পুনরায় পুরুষোত্তম যাত্রাপথে আবার নূতন করিয়া যাত্রা করিলেন। প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান যুগোপযোগী গীতা ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিতেন, কর্ম্মময় জীবনে গীতাকে কি করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহারই পথ দেখাইতেন। ভোর ৪টায় প্রতিদিন স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া শ্রীনিত্যগোপালের নিকট প্রার্থনা করিতেন, সে কি আর্ত্তি! সে কি আবেদন! সে কি চোখের জল!! সে কি আত্ম নিবেদন!! আমরা দেখিয়াছি।

১৩৩৯-এর বিজ্ঞপ্তিতে ছিল—"মানুষের সকল আশা আকাঙ্ক্ষার নির্ব্বাণই ছিল এত দিন পর্য্যন্ত যোগের অর্থ; কিন্তু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মের কৌশলকেও যোগ বলিয়াছেন, নির্ব্বাণ ও কর্ম্ম-কৌশলকে এক করাই হৃদয়-দেবতার কৃতিত্ব। বুদ্ধি অখণ্ড বিশ্বকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে—(১) মায়ার রাজ্য (২) জ্ঞান ও ধ্যানের রাজ্য, যোগের রাজ্য। আমরা কর্ম্মী তো জ্ঞানী নহি, জ্ঞানী তো কর্ম্মী নহি। শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের ক্ষেত্র ও কর্ম্মের ক্ষেত্রকে এক করিয়াছেন। একই "যোগ"-দ্বারা কর্ম্মক্ষেত্র ও জ্ঞানক্ষেত্রকে মিলাইয়াছেন—"তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন"। তিনি "মৎ কর্ম্ম পরম" হওয়াকেই জ্ঞান বলিয়াছেন। "আমার জন্য কর্ম্ম" ও "আমার সঙ্গে যোগ রাখিয়া কর্ম্ম" এই দুইকেই ধ্যান বলিয়াছেন। তাঁহার মতে

কর্ম্মই জ্ঞান, জ্ঞানই কর্ম্ম; কর্ম্মই ধ্যান, ধ্যানই কর্ম্ম। আমরাও বর্ত্তমান যুগে এই কর্ম্ম-জগৎকে জ্ঞানের জগতে ও ধ্যানের জগতে গড়িয়া তুলিতে চাই, অন্তরের সমাধি ও কর্ম্ম-সমাধিকে এক করিয়া বুঝিতে চাই, তবেই গীতার "ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধি" সার্থক হইবে। কোন্ স্থানে দাঁড়াইয়া সংসারের সকল সম্বন্ধ, সকল আশা আকাঙ্ক্ষা, সকল কর্ম্ম রসাল হইতে পারে, তাহাই বক্তৃতা প্রদান, পুস্তক প্রণয়ন ও পত্রিকা প্রচারদ্বারা ঘরে ঘরে এই আশ্রম উপস্থিত করিবে। শাস্ত্রকে কেবল আলোচনার ক্ষেত্র হইতে টানিয়া নামাইয়া জীবনের ক্ষেত্রে কাজে লাগাইতে হইবে; নচেৎ শাস্ত্র ব্যর্থ। বহু দিনের ব্যর্থ শাস্ত্রকে আজ সার্থক করিতে হইবে"।

এইভাবে তিনি প্রতি রবিবার শ্রোতাগণের হৃদয়ে এক নূতন প্রেরণা, নূতন ভাবের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পাঠের পর কীর্ত্তন হইত। প্রতি বুধবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহিলাদের জন্য গীতা ও ভাগবত গ্রন্থ আলোচিত হইত। সেই সময় এক বিজ্ঞপ্তিতে মেয়েদের সম্বন্ধে লেখা ছিল—"প্রচলিত শাস্ত্র, চিন্তা-প্রণালী ও সমাজ-ব্যবস্থায় নারী সমাজে হেয়, অপমানিত। নারী কোন্ পথে নারায়ণী অন্নদা, মানদা, জ্ঞানদা, বরদা ও মোক্ষদা, সংসারে শান্তি ও শৃঙ্খলার জনয়িত্রী, সেই পথের খোঁজ সর্ব্বতোভাবে দুঃখী নারী-সমাজে পৌঁছানো এই আশ্রমের অন্যতম প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম—প্রকৃতিকে শোষণ করিয়া

নয়, কেবল নিজের মানে প্রকৃতিকে মানিনী করিয়া নয়, বরং প্রকৃতিকে নিজেরই সমান মান প্রদান করিয়া কিম্বা প্রকৃতির মানেই নিজকে মানী সাজাইয়া”।

এই আদর্শ অবলম্বনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। দুই দিনের পাঠে স্ত্রী-পুরুষ অনেক উপস্থিত হইতে লাগিল। কপর্দ্দক শূন্য পুরুষোত্তমানন্দের নরনারায়ণ আশ্রমে সকল সময়েই লোক সমাগম হইতে লাগিল। পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার অফুরন্ত প্রাণ-শক্তির উচ্ছ্বসিত ভাষায় ও প্রাণের স্বাভাবিক প্রীতির ঝরণায় মানুষকে প্লাবিত করিয়া দিতে লাগিলেন। সেই সময় নরনারায়ণ আশ্রমে ৪ পয়সার মুড়ি দিয়া ছয়জন মানুষ সকালের জলযোগ করিতেন, ৫।৬ পয়সার তরকারী দিয়া পাতলা ডালসহ আনন্দে দুই প্রহরের আহার করিতেন। এমন দিন গিয়াছে হাতে ১ পয়সাও নাই, রাত্রে যদি কেহ অসুস্থ হয় ৪ পয়সার সোডা বা ডাব কিনিয়া দিবার উপায় পর্য্যন্ত ছিল না।

সেই আশ্রমেই আবার কত লোক নিজেরাই বাজার করিয়া লইয়া আসিয়া আনন্দের সহিত আশ্রম-জননী ঊষাঙ্গিনী দেবীর হাতের উপাদেয় রান্না স্বামীজীর সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। আশ্রম-জননীর প্রত্যেকের প্রতি প্রীতি ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই আপ্যায়িত হইয়া যাইতেন।

এইরূপে নরনারায়ণ আশ্রমে মানুষ একটা প্রাণ-স্পর্শ পাইতে লাগিল।

এই আশ্রমের বয়স যখন দশমাস, সেই সময় আমি নবদ্বীপ থাকি। নবদ্বীপ হইতে শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ সাহিত্য শাস্ত্রী কলিকাতা নরনারায়ণ আশ্রমে আসিয়া কয়েক দিন থাকিয়া স্বামীজীর এবং আশ্রমবাসী সকলেরই একটা প্রাণ-স্পর্শ পাইয়া ছিলেন। তিনিই আমাকে পুরুষোত্তমানন্দের কথা বলেন। আমি ১২ বৎসর পূর্ব্বেই শ্রীনিত্যগোপালের শ্রীচরণে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার শক্তিময় সুমধুর নাম-প্রভাবে আমার জীবন রস ও ভাবের সংঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় পরম কারুণিক শ্রীনিত্য-গোপালের প্রসাদে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের সন্ধান পাইয়া ছিলাম। সত্যেন শাস্ত্রী আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি বলিলেন—কলিকাতা নরনারায়ণ আশ্রমে পুরুষোত্তমা-নন্দ অবধূত গীতা ভাগবতের যে যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করিতেছেন তোমার তাহা শোনা প্রয়োজন। সেখানে গেলে তোমার হৃদয়ে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহার মীমাংসা তুমি পাইবে। এইভাবে পুরুষোত্তমানন্দের সহিত দেখা করিবার জন্য আমাকে তিনি অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন। একদিন একটি ছেলেকে সঙ্গে করিয়া সাহা নগর রোডের নরনারায়ণ আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। হৃদয় আমাব তখন নানারূপ সংশয় এবং ভয়ে দোদুল্যমান। স্বামীজী দরজায়

দাঁড়াইয়া, যাইতেই পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় নাম বলিতেই চিনিতে পারিলেন, সত্যেন শাস্ত্রীর নিকট আমার নাম ও আমার মানসিক অবস্থার কথা অবগত ছিলেন। স্বামীজীর সহিত তাঁহার ঘরে যাইয়া বসিলাম। স্বামীজী আমার জীবনের সমস্ত ঘটনা জানিতে চাহিলেন। জীবনের প্রথমে স্বামীকে হারাইয়া, হৃদয়ের অর্ঘ্য লইয়া ছুটিয়াছিলাম বিশ্ব-স্বামীর পায়ে অঞ্জলি দিবার ব্যাকুল বেদনা লইয়া। যখন ১২ বৎসর বয়স তখন শ্রীনিত্যগোপাল-চরণে সেই অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহার পরে আরও ১২।১৩ বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল ভীষণ ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া। যেদিন পুরুষোত্তমানন্দের চরণপ্রান্তে আমি উপনীত হইয়াছিলাম, সে দিন আঘাতে আঘাতে আমি মৃতপ্রায়। এমন দিনে নিত্যগোপালের নিজজন, যিনি আমারও নিজজন তাঁহার নিকট বসিয়া অকপটে জীবনের সকল লাঞ্ছনা ও ব্যথা বেদনা, আশা ও আনন্দের ইতিহাস বলিলাম। স্বামীজী বলিলেন তুমি যেমন আমার নিকটে অকপটে সকল কথা বলিলে, আমি আমার জীবনের কিছুই তোমার নিকট গোপন রাখিব না। আমি তো তোমাদিগকেই চাই। পাইবার জন্য ব্যাকুল। তুমি নিত্যগোপালকে চাহিয়াছ; তিনি তো প্রকট নাই, আমার ভিতর দিয়া তাঁহার কথা শুনিবে, তাঁহার আদর যত্ন পাইবে। আমার বলিতে আমার জীবনে কিছু নাই, সবই তাঁর। তিনি অযাচিতভাবে আমার জীবনে আসিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া

আমি বিপন্ন। তোমরা নিত্যগোপালের নিজজন, তাঁহার দর্শন শাস্ত্র তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে আমি বাঁচিতাম। আমি বলিলাম, 'গুরু ত্যাগের যে অপরাধ হইবে'। স্বামিজী বলিলেন, যে দিন কুলগুরু ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী গুরুর আশ্রিত হইয়াছিলে, সে দিন গুরু-ত্যাগের অপরাধ হয় নাই! ত্যাগ কাহাকে বলে, আর গ্রহণ কাহাকে বলে তাহা জান কি? তোমার গুরুর নিকট যখন তোমার জীবনের সকল দিকের সকল অভাব, সকল চাহিদা পূর্ণ হয় নাই, যে কারণেই হউক আমার নিকট আসিতে হইয়াছে, তখনই বুঝা যাইতেছে তুমি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পার নাই। যাহাকে গ্রহণ করিতেই পার নাই, তাঁহাকে আবার ত্যাগ করিবে কি? যাঁহার নিকট জীবনের সকল চাওয়া পাওয়ার প্রশ্ন ফুরাইয়া যায়, তাঁহার পাওয়াই যে দিন নিজের পাওয়া বলিয়া মনে হয়, সেই দিন হয় তাঁহাকে পাওয়া, গ্রহণ করা। ভয় নাই। পুরুষোত্তম-জীবনে কিছু হারায় না, তাঁহার জীবনেই সকলকে পাইবে; আমার জীবনের ভিতরই সকলকে মিলাইতে পারিবে, আমি কাহারও জিনিষ কাড়িয়া লইব না। পুরুষোত্তম-জীবনে কাড়াকাড়ি নাই। আমি অন্য গুরুদের মত কাহাকেও আট্‌কাইয়া রাখিব না, আমার শিষ্য করিবার লোভ নাই, শিষ্য যদি করিতাম সকলের চাইতে বেশী শিষ্য করিতে পারিতাম, সে যোগ্যতা তিনি দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি চাই প্রাণ। তুমি তোমার জীবনকে পরিষ্কার

বুঝিয়া লও ইহাই আমি তোমার নিকট চাই। তিনি আরও বলিলেন—তুমি কি তোমার গুরুর দেহটার নিকট বদ্ধ থাকিতে চাও, না প্রকৃত গুরু যে ভগবান পুরুষোত্তম তাঁহাকে পাইয়া মুক্ত হইতে চাও? আমি বলিলাম—আমি তো মুক্ত হইতে চাই, কোথাও আট্‌কা থাকিতে তো আমি চাই না। স্বামিজী বলিলেন তবে ভয় পাইতেছ কেন? মানুষ যখন হাই স্কুলে পড়ে তখন যে সকল মাষ্টার পড়ায় তাঁহারাও তো গুরু, কিন্তু সেখানকার পড়া যখন শেষ হয়, আবার কলেজে যায় সেখানে প্রফেসরেরা গুরু হন। উচ্চতর জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ স্তরে স্তরে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়, সঙ্গে সঙ্গে গুরুরও পরিবর্ত্তন হয়। আমার নিকট তোমার জীবনে সকল প্রশ্নের মীমাংসা যদি না হয়, সকল দিকের সকল চাহিদা যদি পূর্ণ না হয়, আমার চাইতে যদি উচ্চতর পুরুষ কেহ থাকেন যাহার নিকটে গেলে তোমার জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ হইবে ইহা যদি আমি বুঝি, সেদিন আমি গুরু-নিষ্ঠার মোহ দেখাইয়া আট্‌কাইয়া রাখিব না, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব তাঁহার নিকট যাইতে। নিত্যগোপাল এ ভাবে কাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিবার শাস্ত্র আমাকে দিয়া যান নাই। তাঁহার জীবনে পাইয়াছি ছাড়িয়া রাখিবার শাস্ত্র। প্রথম যে গুরুর নিকট ক খ শিখিলে তিনি তোমার যে গুরু, এম. এ. পড়িলে যে প্রফেসবের নিকট পড়িতে, তিনিও সেই গুরু। গুরু বস্তুটি গুরুই, তাঁহাকে অত হাল্‌কা করিয়া, ছোট করিয়া

দেখিও না। গুরু অখণ্ড তত্ত্বময় বস্তু। তুমি তোমার গুরুর প্রতি একটু খারাপ ভাব পোষণ করিলে আমি তোমাকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে পারিব না। তাঁহার নিকট পাইয়াছ একদিকের সন্ধান—স্বরূপের সন্ধান, কিন্তু বিশ্ব-রূপের দিকটা তাঁহার প্রকাশ না থাকায় তোমার বিশ্বরূপের দিকটার ক্ষুধা তিনি মিটাইতে পারেন নাই, তাই তুমি আমার নিকট আসিয়াছ। আমার জীবনে পাইবে স্বরূপ-বিশ্বরূপের সন্ধান। তুমি তাঁহার নিকট গিয়াছিলে বলিয়া আজ এত সহজে আমার নিকট আসিতে পারিলে, নতুবা কত মেয়ে তো আসে, কেহ তো আমাকে বুঝিতে পারে না। তোমার ভাগ্য ভাল। তোমার জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা। তিনি আরও বলিলেন —তুমি যেদিন কুলগুরু ত্যাগ করিয়া মঠে আসিয়া সন্ন্যাসী গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছ, সেই দিন তুমি বিধির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার রাজ্যে অপরাধী হইয়াছ, তোমার একুল ওকুল দুকুল গিয়াছে, এখন পতিতের বন্ধু পুরুষোত্তমের শরণাগতি ছাড়া তোমার আর কোন পথ নাই। মানুষ এমন পতিত হইতে পারে না যেখানে তাঁহার কোল পাতা নাই। পুরুষোত্তমের পথ অনন্ত, ভয় নাই। তাঁহার শরণাপন্ন হও।

কয়েকদিন থাকিয়া যে দিন নবদ্বীপ ফিরিব সেদিন স্বামীজীকে প্রণাম করিতে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, তুমি বুক ভরা বেদনা লইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলে, তোমার বেদনা আমাকে দিয়া তুমি নিশ্চিন্ত

হইয়া ফিরিয়া যাও, এই আমার প্রাণ ভরা আশীর্ব্বাদ। তাঁহার সেই স্নেহ-স্পর্শে আমার বুকে দিন রাত্রি যে আগুন জ্বলিতেছিল তাহা যেন জুড়াইয়া গেল, তাঁহার সেই করুণা-স্পর্শ আজও আমাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। এমন করিয়া মাভৈঃ বাণী আর কাহারও নিকট শুনি নাই। এইভাবে এক আশার আলো বুকে লইয়া নবদ্বীপ ফিরিয়া গেলাম।

আজ মনে পড়িতেছে সেই ১৩৩৯ সনের কথা। সে এক উচ্ছ্বসিত আনন্দের দিন, আজও সে কথা মনে করিলে সমস্ত দেহের কানায় কানায় এক আনন্দের দোল দিয়া ওঠে। শ্রীযুক্ত দিগীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের মায়ের শ্রাদ্ধে গীতা পাঠ করিতে আসিবেন পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ। আমরা চার বাড়ীর লোক শচীন্দ্রনাথ বসুর বাসায় মিলিত হইয়া আকুল প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছি। এমন সময় তিনি আসিলেন, বেলা তখন ৫টা। সেই উজ্জ্বল সৌম্য সুন্দর মানুষটি যখন আমাদের মধ্যে আসিয়া অতি আপন জনের মত সকলের মঙ্গল সংবাদ লইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সেই স্নেহ মধুর ব্যবহারে আমাদের বুক আনন্দে ভরিয়া গেল, আমরা যেন তাঁহার স্নেহ-স্নিগ্ধ স্পর্শে জুড়াইয়া গেলাম। তাঁহার নবদ্বীপ আসার সংবাদ পাইয়া কত লোক আসিতে লাগিল, সকলের সঙ্গেই তিনি পুরুষোত্তম তত্ত্বের কথা, বর্ত্তমান যুগের সমস্যার কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সকলে চলিয়া গেলে আমার সঙ্গে মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা

করিলেন, বিশেষ করিয়া মঠে মেয়েদিগকে রাখিতে হইলে কিভাবে তাহাদিগকে তৈরী করিতে হইবে এই সমস্ত আলোচনায় রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল। দিগীন বাবুর বাড়ী নবদ্বীপের নিকট মাধাই নগরে। আমাদের স্থির হইল খুব ভোরে স্বামিজীসহ আমরা কেহ কেহ মাধাই নগর যাইব এবং বেলা হইলে আর আর সবাই যাইবেন। সেদিন সকলেরই সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল। আমি স্বামিজীর সঙ্গেই গিয়াছিলাম। শ্রাদ্ধের পর স্বামিজী ভাগবত পাঠ করিলেন। তাঁহার সেই ভক্তি-প্লাবিত চোখের জলে ভাগবত ধর্ম্মের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা মুগ্ধের মত শুনিলাম। সমস্ত চিন্তাধারা যেন বদলাইয়া গেল। এতদিন যাহা শুনিয়া আসিয়াছি, যে ভাবে ভাবিয়াছি তাহার তো সবই উল্টা শুনিলাম। কত জন্ম জন্ম সাধনা করিয়া মানুষ ভগবানকে পায়, তিনি বলিলেন ভাগবত ধর্ম্মে সাত দিনে ভগবানকে পাওয়ার কথা। সাধনা করিয়া পাওয়ার কথা জানিতাম। তিনি বলিলেন, পাইয়াই আছি, পাইয়াই সাধনা করার কথা। নরকেই নারায়ণকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইবার কথা শুনিয়াছি। তিনি বলিলেন নরকেই পাইবার জন্য নারায়ণের ব্যাকুলতার কথা। ভাবিলাম—ভাগবত তো অনেক শুনিয়াছি কিন্তু এমন সুন্দর ব্যাখ্যা তো কভু শুনি নাই। সমস্ত শাস্ত্র-বাক্যের সহিত এমন ভাবে উদাহরণ সহকারে বর্ত্তমান যুগের সকল ঘটনার একটা সুষ্ঠু মীমাংসা যে ভাগবত ধর্ম্মের ভিতর

বহিয়াছে ইহা তো শুনি নাই। অবাক হইলাম, মুগ্ধ হইলাম, আশা আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিল। মানুষ সহজ জীবনকে, সহজ পথ-চলাকে শাস্ত্রের বিকৃত কঠিন রজ্জুতে বাঁধিয়া জীবনকে দুঃসহ ও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। আড়াই ঘণ্টা বক্তৃতা হওয়াব পর সকলে আহারাদি করিলাম। বৈকালেই নবদ্বীপ ফিরিতে হইবে, সকলেই প্রস্তুত হইলাম। মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, বর্ষাকাল, বৃষ্টি আর থামে না। রাত্রি প্রায় আটটায় বৃষ্টি থামিলে আমরা প্রায় ২৫ জন স্বামিজী সহ নবদ্বীপ হাঁটিয়া রওনা হইলাম। রাস্তায় জল জমিয়া-গিয়াছিল, পথ অন্ধকার, ছেলেরা স্বামিজীর হাত ধরিয়া সঙ্গে করিয়া আনিতে লাগিল, আমরাও পিছন পিছন আসিলাম। সে পথ-চলায় ছিল কত আনন্দ! পরের দিন সকালে স্বামিজী কলিকাতা চলিয়া গেলেন, আমাদের জন্য রাখিয়া গেলেন তাঁহার আনন্দময় স্মৃতির একটি দিন ও দুইটি রাত্রি।

১৩৪১ সনের বৈশাখ মাসে সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্য শাস্ত্রীর নামে চিঠি আসিল; স্বামিজী লিখিয়াছেন, আমি মহানির্ব্বাণ মঠের নিত্য সঙ্ঘের পক্ষ হইতে নবদ্বীপ বক্তৃতা করিতে যাইতেছি। নবদ্বীপ আমপুলিয়া পাড়া অবধূত আশ্রমে উঠিব। তোমরা সকলে সেখানে উপস্থিত থাকিবে। পুরুষোত্তমানন্দ আবার নবদ্বীপ আসিতেছেন। তাঁহার স্নেহ-ধন্য আমরা আনন্দে তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষায় অবধূত

আশ্রমে যাইয়া বসিয়া রহিলাম। তিনি আসিলেন আমাদের মধ্যে, এবার তিনি তাঁহার গুরু ভাই বোন পরিবেষ্টিত হইয়া আসিয়াছেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট থাকিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। পরের দিন সকালে উঠিয়াই অবধূত আশ্রমে গেলাম। "বর্ত্তমান যুগ-সমস্যায় শ্রীনিত্যগোপাল" এই বক্তৃতা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া বিলি করা হইল। বক্তৃতার স্থান হইল বঙ্গবাণী স্কুল। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল গোস্বামী খুব আগ্রহ সহকারে সভার আয়োজন করিলেন। দুই দিন বক্তৃতা হইবে এই ব্যবস্থা হইল। বৈকাল ৪টায় সভা। নবদ্বীপের সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় সভায় উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী আসিলেন গেরুয়াধারী ভাইবোন পরিবৃত হইয়া। কেশবানন্দ মহারাজ, নিত্যগৌরবানন্দ মহারাজ, নিত্যগোপালানন্দ মহারাজ, গোলাপদিদি, নির্ম্মলাদিদি এবং নিত্যগোপালের গৃহীভক্ত রামদাস মোদক, শরৎদিদি, যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি অনেকেই সভায় উপস্থিত হইলে আমরা সবাই সভায় যোগদান করিলাম। সভা আরম্ভ হইলে প্রথমেই স্বামিজী যে সুমধুর ঝঙ্কার তুলিয়া "বংশী বিভূষিত করান্নবনীরদাভাৎ,' শ্লোকটি বলিলেন সেই সুরে সকলেই যেন স্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দর্শন শাস্ত্রকে এবং প্রচলিত শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকে উপস্থিত কবিয়া দেখাইলেন যে প্রচলিত ভাষ্যের ফলে এই জগৎটা মিথ্যা এবং ব্রহ্মই

একমাত্র সত্য ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। এই ভাষ্যের ফলেই বর্ত্তমানের যত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। তাহার পরই তিনি বলিলেন—শ্রীনিত্যগোপাল বলিলেন "ব্রহ্ম যেমন সত্য মায়াও তদ্রূপই সত্য" শাস্ত্র বাক্যদ্বারা তাহা প্রমাণিতও করিলেন। সে দিনের বিষয় অত্যন্ত জটিল, কিন্তু তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষায় চোখের জলে বলায় মানুষ সমস্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও মুগ্ধ হইল। প্রায় ৩ ঘণ্টা সেদিন বক্তৃতা হইল। পরের দিন বৈকালে পুনরায় সভা হইল। সকলেই উপস্থিত হইলেন। সে দিনের আলোচনা গত দিনের চাইতে অনেক সহজ হইল। সেদিন ভাগবত ধর্ম্মের অবতরণবাদের কথা আলোচনা করিলেন। যেমন করিয়া এই ধরাকে সার্থক করিতে, ধরার ধূলিকে ব্রহ্মরেণুতে গড়িয়া তুলিতে তিনি ক্রমে ক্রমে নরহরি, রাম, কৃষ্ণরূপে ধরার বুকে অবতরণ করিলেন তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন। এই অবতরণের মধ্য দিয়া যত ছোটর মূল্য তিনি দিয়া গেলেন—এই আলোচনা সকলের ভিতরই একটা আলোড়নের সৃষ্টি করিল। সেখানে অনেকেই শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের নিকট স্বামিজীর অবতরণবাদের আলোচনা খুবই ভাল লাগিল। পরদিন স্বামিজী কলিকাতা চলিয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন 'শীঘ্র আর আমার নবদ্বীপ আসা হইবে না। লালমোহন দত্ত আমার গুরু ভাই বই ছাপানোর জন্য ২০০ টাকা দিয়াছেন, তোমরা যে যাহা পার

সংগ্রহ করিয়া পাঠাইও; আমি গীতার অবধূত ভাষ্য 'ভাষ্য প্রদীপ' নামে বই লিখিয়া ছাপাইতে আরম্ভ করিব। প্রুফ তো আমাকেই দেখিতে হইবে'। আমরা কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলাম। ১৩৪১ সনে সেই বই ছাপাইয়া বাহির করিলেন এবং সেই বই লইয়া তিনি বাংলা দেশের প্রতি জেলায় যাইয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। পুত্রদের মধ্যে একজন সঙ্গে থাকিত। মেজ ছেলে নিত্যব্রতই বেশী সময় সঙ্গে থাকিত।

সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্যশাস্ত্রী, শচীন্দ্র বসু এবং আমাদের বাসা এই তিন স্থানে আমাদের ভিতর স্বামিজীর কথা লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। অনেক ছেলেমেয়ে তাহাতে যোগদান করিত। স্বামিজীর লেখা উপদেশপূর্ণ বড় বড় চিঠি আসিত তাহা লইয়া আমাদের দিন আনন্দে কাটিয়া যাইত। ইতিমধ্যে শচীনদার পিতা পরলোক গমন করিলেন। তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র, পিতার শ্রাদ্ধাদি তাঁহাকেই করিতে হইবে। তিনি স্বামিজীকে আসিতে পত্র দিলেন, আপনি আসিয়া শ্রাদ্ধ বাসরে ভাগবত পাঠ ও আলোচনা করেন ইহাই আমার ইচ্ছা। স্বামিজী আসিতে স্বীকৃত হইলেন। আমরা আবার তাঁহাকে আমাদের মধ্যে পাইব এই আনন্দে সব আয়োজন চলিতে লাগিল। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন তিনি আসিলেন মেজ পুত্র নিত্যব্রতকে লইয়া। শ্রাদ্ধ হইয়া গেলে স্বামিজীর ভাগবত পাঠ হইল এবং

পাঠের পর কীর্ত্তন করিলেন। অনেক লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেবার পাঁচ দিন তিনি নবদ্বীপে ছিলেন। বহুলোক, স্ত্রী পুরুষ সকল সময় তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল এবং পুরুষোত্তম-তত্ত্ব ও ভাগবত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা সকাল হইতে রাত্রি ১১টা সমানে চলিতে লাগিল। দ্বিপ্রহরে মাত্র ঘণ্টা দুই বোধ হয় বিশ্রাম করিতেন। সেই সময় স্বামিজীর নিকট নিত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী নামে একটি যুবক দীক্ষা গ্রহণ করিল। কতজনই কত প্রাণের আবেদন তাঁহার নিকট জানাইত, কত ভাল লাগিত মানুষের, স্বামিজীর সকলের প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার। জয়নিতাই বলিয়া এক বৈষ্ণব প্রতিদিন আসিতেন, স্বামিজীকে দাদা বলিতেন এবং খুব ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন। একদিন সকালবেলা তাঁহার নিজের হাতে রোয়া বেশ বড় একটা ঝাড় ডাঁটা হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। সেই ডাঁটা পাইয়া স্বামিজীর সে কি আনন্দ। তিনি বলিয়াছিলেন আজ জয়নিতাই যে আমাকে এই প্রীতিভরে ডাঁটা আনিয়া দিল ইহা তোমরা লিখিয়া রাখিও। প্রীতি-মাখানো ছোট ডাঁটার যে কি গৌরব তাহা তাঁহার জীবনে সেদিন আমরা দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। শচীনবাবুর রান্না ঘরে বসিয়া সেই ডাঁটা কোটা তিনি দেখিলেন এবং শচীনদার স্ত্রী যত্ন সহকারে সেই ডাঁটার চচ্চরী রান্না করিয়া দিলেন। তিনি জয়-

নিতাইয়ের ভালবাসা স্মরণ করিয়া আনন্দভরে চোখের জল মুছিলেন আর ডাঁটা খাইতে খাইতে শ্রীকৃষ্ণ যে কত ছোটর মূল্য দিয়া গিয়াছেন, সুদামার খুদ, বিদুরের স্ত্রীর কলার খোসা ইত্যাদি কত আলোচনাই না সেদিন করিলেন। স্বামীজী যখন যে পরিবারে গিয়াছেন তিনি যেন সেই পরিবারের একজন এমন ভাবে একীভূত হইয়া গিয়াছেন। শচীনদার স্ত্রী তরকারী কুটিতেন, তিনি বসিয়া দেখিতেন, কি রান্না করিবে জিজ্ঞাসা করিতেন, শচীনদার স্ত্রী রান্না করিতে করিতে গরম গরম বড়া ভাজিয়া দিতেন, তিনি রান্না ঘরে বসিয়া খাইতেন। বহুবার তিনি শচীনদার বাসায় আসিয়াছেন এবং শচীনদার স্ত্রী কতই না আদর যত্ন করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছেন। সেই সব অতীতের কাহিনী আলোচনা করিলে আজও প্রাণ কেমন ভরিয়া উঠে।

সেবার পাঁচ দিনের মধ্যে একদিন মাত্র পোড়ামাতলায় তাঁহার বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইল। বৈকালে বক্তৃতার যে সময় দেওয়া হইয়াছিল ঠিক সেই সময় বৃষ্টি আসিল, খুব বেশী নয়, অল্প অল্প। স্বামীজী তাহার ভিতরেই পোড়ামাতলায় রওনা হইলেন; আমরা একটু অপেক্ষা করিতে বলায় তিনি বলিলেন আমি জীবনে কখনও অসময়ে সভায় উপস্থিত হই নাই, যখন যেখানে সময় দিয়াছি তখনই উপস্থিত হইয়াছি, ১৩।১৪ হাজার বক্তৃতা দিয়াছি, তাহার মধ্যে একদিন মাত্র ট্রেন ফেল করিয়াছিলাম, তাহাও

তখনই টেলীগ্রাম করিয়া জানাইয়া দিয়া পরের ট্রেনে গিয়াছিলাম। তখন স্বামীজীসহ অল্প বৃষ্টির মধ্যেই আমরা পোড়ামাতলা গেলাম। বৃষ্টি আর বেশী হইল না। অল্প বৃষ্টির মধ্যেই ঠিক সময় সভা আরম্ভ হইল। লোক তখন কম ছিল, ক্রমে অনেক লোক হইল, বৃষ্টিও থামিয়া গেল। ঘণ্টা দুই সভা হইল। পাবনা জিলা নিবাসী সরজুবালা নাগ (ভাই ভূপতিনাথের শিষ্যা) কয়েকদিন স্বামীজীর নিকট খুব আসিলেন, এবং স্বামীজী তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেন। একদিন তাঁহার বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া খুব ভক্তি আদর সহকারে আহার করাইলেন। আমার মা-ও একদিন খিচুরী ভোগ দিয়া স্বামীজীকে আহার করাইলেন। সেই সময় একদিন নবদ্বীপ লাইব্রেরীতে বক্তৃতা করেন, লোক অনেক হয়, মেয়েরা অনেকে উপস্থিত ছিল। তিনি এই ভাবে আমাদের মধ্যে পাঁচ দিন থাকিয়া আনন্দ দান করিয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন। যাওয়ার আগে বলিয়া গেলেন ঝুলনের সময়ে সাতদিন বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিও, আমি আসিব। স্বামীজী চলিয়া গেলে কিছুদিন পরই চূড়ামণি যোগ। নবদ্বীপ লোকে লোকারণ্য, আমাদের বাসায় আমার বহু আত্মীয় স্বজন আসিয়াছিল, আমরা তখন স্থির করিলাম চূড়ামণি যোগের দিন কীর্ত্তন লইয়া নরনারায়ণ আশ্রমের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইব, সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইল; ছেলে-মেয়ে প্রায় ২৫ জন আমরা

ভিক্ষায় বাহির হইলাম, প্রায় আধমণ চাউল ও ১৫।১৬ টাকার মত পাইলাম। স্বামীজীকে সেই সংবাদ দিলাম ও টাকা পাঠাইয়া দিলাম। তিনি লিখিলেন—

"নারায়ণেষু

তোমার পত্র ও টাকা পাইয়াছি। নরনারায়ণ তোমাদের সম্পদ। উহার জন্য তোমরা সব কিছু করিতে পারিতেছ, তখন নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবেই দেখিতেছি। আমি তোমাদের কাছে নিত্য-ভিখারী। তোমরা অন্নপূর্ণার দল আমার ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিয়া দিয়া আসিতেছ। আমার জীবনের সম্বল শুধু রিক্ততা, শূন্য, আকাশ-ধর্ম। আকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যতে—আকাশ স্ত্রীজাতির দ্বারা পূর্ণ, তোমাদের চরণতলেই রিক্ত পুরুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তোমরা রাণী, আমি তো তোমাদের সেই রূপেই প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিলাম।···তোমরা রাজ রাজেশ্বরী হও। ব্রজে কেবলই 'জয় রাধে'। বুলু, উতু, শঙ্করী, তুমি, সুহাসিনী, তোমার বড় বোন প্রভা, তোমার ভাগিনেয় বিধুমুখী, সুশীলের দিদি তোমরা সকলেই আমার ঠাকুরের প্রাণের আশীর্বাদ জানিবে। ধীরেন অমরেন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরের স্পর্শে নূতন জীবন যাপন করুক। আমি তোমাদিগের মাঝে যাইবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছি। আগামী শুক্রবার ৬টা ১০-এর গাড়ীতে রওনা হইয়া ৯টা ১৪-এর সময় নবদ্বীপ

পৌঁছিব। যদি ঐ গাড়ীতে না আসি পরের গাড়ীতে দেখিও। আরো ২।১ দিন আগে আসিতে পারিতাম, ঠেকা শুধু শুক্রবার এক ভদ্রলোক কিছু টাকা দিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সত্যব্রত শচীন কেহই এখানে নাই। সকলেই বদলবাদ গিয়াছে। হারমোনিয়ম বাজাবার লোক যদি দরকার হয় নিত্যব্রতকে নিয়া আসিব। আমি নিত্যব্রতকে আসিবার জন্য পত্র দিব। যদি সেখানে কাজের বিশেষ ঠেকা না হয় নিশ্চয়ই আসিবে। বাঁধানো উজ্জ্বল ভারত আনিব। বিজ্ঞাপন সঙ্গে আনিব। কিছু অবধূত ভাষ্যও আনিব। শুক্রবার যেন ঐ সময় ষ্টেশনে ধীরেন প্রভৃতি কেহ থাকে। বক্তৃতার স্থানের জোগার পূর্বেই দেখিও। শনি, রবি, সোম, মঙ্গল বুধ। আগে বিজ্ঞাপন না ছাপাইলে শনিবার হইতে বক্তৃতা আরম্ভ কি সম্ভব হইবে? তোমার অমরেন্দ্রকে রাখিয়া দিও। নিচের নমুনা বিজ্ঞাপন যদি তোমাদের মনঃপুত হয় দিও।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিধুর্জয়তি।

মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী বলিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে অভিযান করিয়াছেন, যাহাকে সমাজ-শরীরে ঘন করিবার জন্য তাঁহার শ্রীচরণরেণু-সেবী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সারা জীবন পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন, অথচ প্রণালীবদ্ধ কোন দার্শনিক মতবাদ না থাকায় তাহা সমাজকে পূর্ণতম ভাবে গড়িয়া

তুলিতে পারে নাই, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল-শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই অভিযানকেই বর্ত্তমান বিশ্বকে গড়িয়া তুলিবার একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিয়া নরনারায়ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তদনুকূলে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার 'অবধূত ভাষ্য' প্রণয়ন করিয়াছেন। নরনারায়ণ আশ্রমের লক্ষ্য ইহলোককে গোলোকে গড়িয়া তোলা। নর নারায়ণ আশ্রমের পতাকা গৈরিকের সঙ্গে লাঙ্গল। স্বামিজী এই আদর্শ প্রচার করিবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিতেছেন। নিম্নলিখিত সূচী অবলম্বনে বক্তৃতা হইবে। আমরা জনসাধারণকে এই বক্তৃতায় যোগদান করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।"

ঝুলন উপলক্ষে নবদ্বীপ লোকে লোকারণ্য। ধীরেন্দ্রনাথ বসু নিজ হাতে বড় বড় অক্ষরে পুরুষোত্তমানন্দ নবদ্বীপ আসিতেছেন—পাঁচদিন তাঁহার বক্তৃতা হইবে—বঙ্গবাণী স্কুলে একদিন, গোরাচাঁদের আখড়ায় একদিন, বড় আখড়ায় একদিন, হরিসভায় একদিন, পোড়ামাতলায় একদিন লিখিয়া সারা নবদ্বীপের মোড়ে মোড়ে টাঙ্গাইয়া দিলেন, বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া বিলি করা হইল। ধীরেন, সুশীল প্রভৃতি প্রাণপণ খাটিয়া স্বামিজীর নবদ্বীপ আসিবার বার্ত্তা প্রচার করিল। স্বামিজী আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার বড় ছেলে সত্যব্রত আসিল। ঝুলন উপলক্ষে বহু স্থানের লোক

নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন, পুরুষোত্তমানন্দ অর্থাৎ বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ ইহা শুনিয়া শচীনবাবুর বাসায় বহু লোক সমাগম হইতে লাগিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত শরৎকুমার ঘোষের বহু পরিচিত বন্ধু বান্ধব পুরুষোত্তমানন্দকে অনেকদিন পর পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রফেসর বীরেশ্বর বসু চিরকুমার, ধর্ম্মপরায়ণ, এক কথায় খুব ভাল মানুষ। স্বামিজী যখন নবদ্বীপে আসিতেন, তিনিও আসিতেন এবং কাছে কাছে থাকিতেন। আমাদের প্রোগ্রাম ছিল সকালে উঠিয়া শচীনদার বাসায় যাইয়া স্বামিজীর অতি প্রিয় খাদ্য গরম মুড়ি আনিয়া তেল লবণ দিয়া তাঁহাকে খাইতে দেওয়া—তাহার পর নিজেরা সবাই কিছু কিছু খাইয়া কীর্ত্তন লইয়া আমরা সবাই বাহির হইতাম এবং নরনারায়ণ আশ্রমের জন্য চাঁদা তুলিতাম। আমাদের সঙ্গে থাকিত নরনারায়ণ আশ্রমের পল্লীকেন্দ্রের কাজের জন্য ছাপান বিজ্ঞাপন। ধীরেন, সত্যব্রত, নিত্যগোপাল, সুধীর সুশীল, সুশীলের দিদি. শচীনদার স্ত্রী প্রভৃতি আমরা প্রচারে বাহির হইতাম, ১০টায় বাসায় ফিরিতাম। সেবারে অনেক চাল ও টাকা পাওয়া গিয়াছিল। বৈকালে স্বামিজীর বক্তৃতা। সকালে কীর্ত্তন লইয়া বাহির হওয়ায় নবদ্বীপে বেশ একটী সাড়া পড়িয়াছিল। প্রথম দিন বঙ্গবাণী স্কুলে বক্তৃতা হয়। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ও বীরেশ্বর বসু গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ও

নবদ্বীপের সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বীরেশ্বরবাবু সভায় সভাপতিত্ব করেন। সেদিনের আলোচনা খুব জ্ঞানপূর্ণ হয়। দ্বৈতবাদ অদ্বৈত-বাদের পরস্পর বিরোধের ফলে বর্ত্তমান যুগে যে পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছে, ইহাই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। কঠিন হইলেও সকলের চিত্তই আকৃষ্ট করিল। সেই সভায় নবদ্বীপের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বাগচী আসিয়াছিলেন। স্বামিজী পরম প্রীতি ভরে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, আমি তোমায় আজ তিরস্কার করিব। ভাইয়ের খবর ভাই রাখেনা? আমি আজ দুইদিন হইল নবদ্বীপ আসিয়াছি. তোমার দেখা নাই। আমি যখন গৌরাঙ্গ গোষ্ঠীর পক্ষ হইতে বক্তৃতা দিতে নবদ্বীপ আসিয়াছিলাম সেদিন তোমার মা, যিনি আমারও মা, তোমাদের বাসায় আমাকে লইয়া যাইয়া নিজে কাছে বসিয়া আমাকে খাওয়াইয়াছেন। আর আজ তুমি আমার খোঁজ রাখনা। তোমাদের দূরে থাকিতে দেখিলে যে আমি প্রাণে কত বেদনা পাই। চেয়ারম্যান পূর্ণবাবু তাঁহার সেই প্রাণের স্পর্শে যেন অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। সেইদিন দেখিলাম কত মিষ্টি হয় তিরস্কার। তিনি এমন একজন মিষ্টি মানুষ ছিলেন—যাহার সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা ছিল তাঁহার মিষ্ট প্রাণের পরশ মাখা। পরের দিন সকালে পূর্ণবাবু শচীন বসুর বাসায় আসিয়া স্বামিজীর নিকট অনেকক্ষণ ছিলেন

এবং 'অবধূত ভাষ্য' কিনিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তৃতীয় দিন সভা হইল গোরাচাঁদের আখড়ায় ; তিনি ভাগবত ধর্ম্মের কথাই সেদিনও চোখের জলে বলিলেন। সেদিন সভাপতিত্ব করিলেন গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ। সভা আরম্ভের পূর্ব্বেই গোরাচাঁদের গলার প্রসাদী মালা স্বামিজীকে এক বাবাজী পরাইয়া দিলেন। সেদিনের সভায় আলোচনা অনেকটা সোজা ছিল, সভায় লোক অনেক উপস্থিত হইয়াছিলেন। বড় আখড়ায় একদিন সভা হইল, সেখানে প্রচুর স্থান ছিল। ঝুলনের সময় লোক সমাগমও খুব হইল। ১॥০ ঘণ্টা ৩ ঘণ্টার কম কোন দিন বক্তৃতা হইত না। পোড়ামাতলায় একদিন ও হরিসভায় একদিন বক্তৃতা হইল। হরিসভার গোস্বামীর পিতার সহিত শ্রীনিত্যগোপালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেইজন্য হরিসভায় শ্রীনিত্যগোপাল আর গৌরাঙ্গদেব যে একই, দুই কলেবর মাত্র, মহাপ্রভুর অসমাপ্ত কথা যে নিত্যগোপাল বলিয়া গিয়াছেন সেই সম্বন্ধে সেদিন বিশেষভাবে আলোচনা করিলেন। সেই গৌরাঙ্গদেবের প্রসাদী মালা হরিসভায় গোঁসাই নিজে স্বামিজীকে পরাইয়া দিলেন এবং সভান্তে মহাপ্রভুর প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেন। সেদিনেব সভায় নিত্যগোপালের ভক্ত শিষ্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এইভাবে ছয়দিন কাটিয়া গেল। সকালে কীর্ত্তন বৈকালে সভা—নবদ্বীপে হৈচৈ পড়িয়া গেল। পণ্ডিত সন্ন্যাসী বাবাজী গৃহী কংগ্রেসী স্ত্রী

পুরুষ সারা দিন রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত আসিতে লাগিলেন। স্বামিজীর অফুরন্ত আলোচনা চলিতে লাগিল। স্বামিজীর জীবনে তো কোন কোঠা ভাগ ছিল না। সকলেই যে যাহার কথা প্রাণ খুলিয়া তাঁহার নিকট বলিতে পারিত এবং তিনি তাঁহার তাঁহার মত করিয়া সকলের সকল আলোচনার মীমাংসার কথা বলিতেন। পাঁচদিন বক্তৃতার পর নবদ্বীপের বিষ্ণুপ্রিয়ার স্থাপিত মহাপ্রভুর সেবাইতেরা স্বামিজীকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। স্বামিজী স্বীকৃত হইলেন। সেদিনের সভাতেও শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্য-তীর্থ সভাপতিত্ব করিলেন। সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে এক গোস্বামী মহাপ্রভুর গলার প্রসাদী মালা স্বামিজীর গলায় পরাইয়া দিলেন। সেদিনের বক্তৃতা হইল শুধু চোখের জলে। প্রিয়তমকে নিকটে পাইয়া প্রিয়তমার যে আত্মনিবেদন, সেদিন হইল তাহাই। সভাস্থ লোক চোখের জলে মুগ্ধের মত সেদিনের সেই আলোচনা শুনিলেন। পাঁচদিন ধরিয়া যাহার মুখে জটিল শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই ভাবিয়া ছিলেন ইনি খুব পণ্ডিত ও জ্ঞানী, সেদিন সরল শিশুর মত তাঁহাকেই কাঁদিতে দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন, দেখিলেন এ যে প্রেম-ভক্তির উজ্জ্বল মূরতি। গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় কয়েকদিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন—সেদিন স্বামিজীর বক্তৃতার পর বলিয়াছিলেন, মহাপুরুষদের জীবনে যাহা বহু সাধনার ধন স্বামিজীর

জীবনে তাঁহার গুরু-কৃপায় তাহাই সহজ হইয়া গিয়াছে। আজ ইঁহাকে আমার গুরু বলিয়া মানিয়া লইতে ইচ্ছা হইতেছে। বহুদিন হইল বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনা করিতেছি, যে সকল জায়গায় কঠিন বলিয়া মনে হইত আজ স্বামিজীর চোখের জলে তাহা আমার নিকট সহজ হইয়া গেল। সভার পর স্বামিজীর জন্য মহাপ্রভুর কিছু প্রসাদ দেওয়া হইল, তাহা লইয়া আমরা শচীনদার বাসায় আসিলাম। ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন বক্তৃতা, ২॥ ঘণ্টা ৩ ঘণ্টার কম তো কোন দিনই বক্তৃতা হয় নাই, তাহার উপর সারা দিন লোক-সমাগম, স্বামিজী খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, একদিন বিশ্রাম করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। আমাদেরও সেই কয়েকদিনের আনন্দের রেশের মধ্যে বেশ কিছুদিন কাটিয়া গেল।

১৩৪২ সনে আমি একবার কলিকাতা নরনারায়ণ-আশ্রমে গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম গেরুয়া বসন পরিহিতা মধ্যবয়সী একটি মহিলাকে, নাম তাঁহার যোগেশ্বরী দেবী। শুনিলাম তিনি নাকি হুগলী জেলার বলদবাদ গ্রামের স্বর্গীয় প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা। পিতার অন্য কোন সন্তান না থাকায় পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তিনিই। তাঁহার ইচ্ছা বাড়ীসহ বাইশ বিঘা জমি তাঁহার পিতার স্বহস্ত লিখিত উইলের মর্ম্মানুযায়ী তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর শালগ্রাম শ্রীশ্রীধরজীকে

দান করিয়া তাঁহার সেবার ভার পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজকে অর্পণ করিবেন—এইরূপ আলোচনা চলিতেছে। কয়েকদিন পর আমি নবদ্বীপ চলিয়া আসিলাম। কিছুদিন পর স্বামিজীর পত্রে জানিতে পারিলাম স্বামিজীর নামে বলদবাদের ঐ স্থান যোগেশ্বরী দেবী রেজিষ্টারী করিয়া দিয়াছেন। নরনারায়ণ আশ্রমের পল্লীকেন্দ্র বলদবাদে স্থাপনা হইবে, ইহার জন্য খুব প্রচেষ্টা চলিতেছে। স্বামিজীর পাগল প্রাণ এই সংসারটাকে বৃন্দাবনে গড়িয়া তুলিবার জন্য সারাজীবন কি প্রাণপণ চেষ্টাই না করিয়া গিয়াছেন? তাঁহার কর্ম্ম ছিল নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির পর যে কর্ম্ম তাহাই, সেই জন্য তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও অক্লান্তভাবে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বলদবাদের পল্লীকেন্দ্রে তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী বহু পরিবার একত্রে থাকিবে। এই পরিবারগুলি স্বামিজীর নির্দ্দেশিত পথে নিজেদের ভরণ পোষণের উপযুক্ত অর্থ ঐ স্থান হইতেই উন্নত ধরণের কৃষির সহায়তায় উপার্জ্জন করিবেন এবং জীবন যাপন করিবেন এমনই উন্নত ধরণের যে তাহা হইবে ঋষি-জীবনের অনুরূপ। একাধারে ব্রহ্মজ্ঞান ও কৃষি—ব্রহ্মজ্ঞানী ও চাষী—যাহা রাজর্ষি জনকের আদর্শ। নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা তাই লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা। এই পরিকল্পনানুযায়ী পল্লীকেন্দ্র গড়িতে হইলে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। এই জন্য সেই সময়ে স্বামিজীর কর্ম্মের আদর্শ জনসাধারণের নিকট ধরিবার জন্য একটি

বিজ্ঞাপনও ছাপান হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"তিন বৎসর আশ্রম পরিচালনার পর এই কথাটা বেশ স্পষ্ট করিয়া বোঝা গিয়াছে যে, নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধ ব্যক্তি তাঁহার ভাবগত অদ্বৈত জ্ঞানকে যদি কর্ম্মের এবং দ্রব্যের ক্ষেত্রে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কর্ম্ম-জগতে নিযুক্ত হন, তবেই মাত্র তিনি কর্ম্মে অচ্যুত থাকিয়া অবিরত কর্ম্ম করিতে পারেন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই অতি ছোট পা ধোওয়া কর্ম্মের অধিকারী, যুধিষ্ঠির আদিও নন। পা ধুইয়া দিবার গুরুতর কর্ম্মের যোগ্য পুরুষ, যোগী পুরুষ দ্বিতীয় কেহই ছিল না বলিয়া 'গুরুর্গরীয়ান্' পুরুষ নিজেই তাহার ভার লইয়া ছিলেন। দেখিলে মনে হয় 'কাজ করা' খুবই সহজ; কিন্তু কর্ম্মের পিছনে রহিয়াছে প্রেমঘন অদ্বৈত-জ্ঞানময় নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি। এই কর্ম্মের আদর্শই শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করিয়াছেন; ইহাই পুরুষোত্তম-কর্ম্ম। নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিবার পূর্ব্বের কর্ম্ম জ্ঞানলাভ হইলে ভস্মসাৎ হইয়া যায়—একথা মুক্তিশাস্ত্র স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছে, গীতারও মত তাহা। কিন্তু মুক্তিশাস্ত্র নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির পর আর কোনও কর্ম্ম স্বীকার করে না। ফলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র কর্ম্ম জগৎ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। বিশ্বে আমরা আজ কর্ম্মক্ষেত্রে সকলের পশ্চাতে। কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত একেবারে অপরিচিত থাকার বিপদ হইতে বাঁচিবার একমাত্র

পথ—নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধ কর্ম্মীর কর্ম্মজগতে কর্ম্মভার গ্রহণ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে ব্রহ্মের মত সমান মানদানের শাস্ত্র প্রচার এবং সেই আদর্শে কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি করা। মাটিতে আলু পটল হয়—ইহাই জানিতাম। তাই না ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য আমরা খুঁজিয়াছি চিৎএর ক্ষেত্র? কিন্তু মাটি খুঁড়িয়া যে আলু পটল ও ব্রহ্মজ্ঞান যুগপৎ মিলিতে পারে এ কথা শ্রীকৃষ্ণ নির্ভীকভাবে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ইহলোকের মান দান করিয়া গিয়াছেন, ইহলোকের বুকে গোলোক প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাই যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করার চরম সার্থকতা। নরনারায়ণদেবই বিশ্বে নৈষ্কর্ম্ম্য-লক্ষণ কর্ম্মের প্রচার ও আচরণ করিয়াছেন। কিন্তু মুক্তি-শাস্ত্র এমন করিয়াই এই তত্ত্বটিকে অস্বীকার করিয়াছে, সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া লোকের রক্তমাংসে প্রবেশ করাইয়াছে যে বর্ত্তমান যুগ ভাবিতে পারে না মুক্তিশাস্ত্র হইতে লীলা শাস্ত্র অনেক বড়। মুক্তিবাদীদের মতে লীলাশাস্ত্র এক ধাপ নীচের শাস্ত্র। কর্ম্ম-পরাজিত ভারতবর্ষের বুকে পুরুষোত্তম শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ-জীবনই আজিকার যুগের সকল জটিল কুটিল সমস্যার—অন্ন ব্রহ্ম-জ্ঞানের—সমাধান দিতে পারে। অনাবাদী কৃষিক্ষেত্র পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মে গীতার পুরুষোত্তমবাদের লাঙ্গলে চাষ লাগাইয়া নূতন বিশ্ব গড়িবার দিন আজ আসিয়াছে।”

এইভাবে আশ্রম গঠন করিবার পরিকল্পনা স্বামিজীর

জীবনে পাইয়া বসিয়াছিল এবং সংসারটাকে এইভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্যই ধাক্কাধাক্কি করিয়া গিয়াছেন। পৌষ মাস বেশ শীত, আমার শরীরও ভাল ছিল না; এমন সময় স্বামিজীর একখানা পত্র আসিল—তাহাতে সত্যেন্দ্রনাথ সাহিত্যশাস্ত্রীকে ও আমাকে বলদবাদ সেই পল্লীকেন্দ্রে যাইবার জন্য স্নেহের আহ্বান ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমরা আশ্রমের সবাই বলদবাদ গ্রামে পল্লীকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য যাইতেছি, ৭ দিন সেখানে থাকিব। সেখানে লাঙ্গলযুক্ত গৈরিক পতাকা উত্তোলন করা হইবে, মিটিং হইবে এবং সেখানকার লোকদিগকে লইয়া একটা উৎসব হইবে। আমার এই নূতন যাত্রাপথে তোমাদিগকে আমার পাশে পাইতে ইচ্ছা করি, অবশ্য আসিও"। পত্র পাইয়া তাঁহার নূতন অভিযানের সময় তাঁহার পাশে থাকিবার জন্য প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। শরীর অসুস্থ, শীতের মধ্যে যাইতে দিতে মায়ের অমত, সত্যেন শাস্ত্রীরও যাইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমি তো না যাইয়া পারি না। স্বামিজী একদিন বলিয়াছিলেন, আমার কাজ যে দিন আরম্ভ হইবে সে দিন তোমাকে পাইব তো? আমি বলিয়াছিলাম, পাইবেন। আমার কান্নাকাটিতে মা যাইবার মত দিলেন, সত্যেন শাস্ত্রীও লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। ২২শে পৌষ সোমবার বেলা ১২টার ট্রেনে বলদবাদ রওনা

হইলাম। একেবারে অপরিচিত স্থান, মিটিং ৪ টায়; তাহার পূর্ব্বে পৌঁছিবার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। শেওড়াফুলি হইয়া তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল ষ্টেশনে নামিলাম; বহু চেষ্টায় বাস পাওয়া গেল। কোথায় যে নামিতে হইবে তাহাও জানা ছিল না। কিন্তু আমরা যাইতে দেখিলাম এক জায়গায়, রাস্তার পাশেই স্থানটির নাম রাম চক্রবর্ত্তীর ডাঙ্গা, এক সভার আয়োজন এবং স্বামীজী সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিয়া আমরা সেইখানে নামিয়া পড়িলাম। আমাদিগকে দেখিয়া স্বামিজী খুবই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। আমরা নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই সভার কাজ আরম্ভ হইল। প্রথমেই লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা মাতা উষাঙ্গিনী ঘোষকে দিয়া উত্তোলন করান হইল। স্বামিজী বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন— বৃন্দাবনের রাখাল রাজের সেই বন-বিহারের সহিত বলদবাদ গ্রামের সৌভাগ্য যুক্ত করিয়া চোখের জলে গ্রামবাসীর নিকট প্রাণের বেদনার আবেদন জানাইলেন। বলদবাদকে আপনারা বৃন্দাবনের ভাবে গড়িয়া তুলুন এই তাঁহার আবেদন। প্রায় ২ ঘণ্টা মত বক্তৃতা হইল, শীতের বেলা, রাত্রি হইয়া গেল, শেষে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, কীর্ত্তন করিতে করিতে বিগ্রহ শ্রীধরজীর মন্দির পরিক্রমা করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া যোগেশ্বরীদেবীর পৈতৃক যে বাড়ী সেখানে ফিরিয়া আসিলাম এবং সেখানে কিছু সময় কীর্ত্তনের পর স্বামিজী গ্রামবাসী

সকলকে কোল দিলেন; তাঁহারা স্বামিজীকে প্রণাম করিলেন। পূর্ব্বে প্রসাদের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হইল। স্বামিজী বক্তৃতায় রাখালরাজের যে প্রীতির কথা, পরস্পরের প্রাণ খোলা গলাগলির কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহাতে সেই ভাবের মূর্ত্ত বিকাশ যেন সেই সময় হইয়াছিল। সে এক অপূর্ব্ব আস্বাদন। সকলেই সেদিন স্বামিজীর চোখের জলে বুকে জড়াইয়া ধরার ভিতর দিয়া এক অনাস্বাদিত আনন্দ অনুভব করিয়া নিজেদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিল। বলদবাদের কর্ম্মীরা যোগেশ্বরী দেবীর সেই বহু পুরাতন ভগ্ন বাড়ীটিকে পরিষ্কার করিয়া বাসোপ-যোগী করিয়া রাখিয়াছিল, আমরা প্রায় ১৫।১৬ জন লোক সে সময় উপস্থিত ছিলাম। আহারাদি সারিয়া সকলে যে যাহার স্থানে ঘুমাইলেন। খুব ভোরে সকলে মিলিয়া উঠিলাম, স্বামিজী প্রার্থনা করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, হারমোনিয়াম করতাল আদি ছিল; খুব কীর্ত্তন হইল। সকালে গ্রামবাসীরা খেজুরের রস আনিয়া দিল, স্বামিজী তাহা কত আনন্দের সহিত খাইলেন, আমরা সকলে খাইলাম। পূর্ব্বেই আশ্রম-কর্মীরা কিছু শাকসব্জী তৈরী করিয়াছিল, এবং স্থানীয় লোকেরাও কিছু দিল। মা তাহাদ্বারা অনেক রকম ব্যঞ্জন তৈরী করিলেন, সকলে মিলিয়া পরমানন্দে আমরা বনভোজন করিলাম। সন্ধ্যাবেলা স্বামিজী সবাইকে লইয়া খুব কীর্ত্তন করিলেন। পূর্ব্বেই চার স্থানে সভার

বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ২৩শে পৌষ মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৪টায় কৈকালা গ্রামে এক সভা হইল। আমরা সকলেই স্বামিজীর সহিত সেখানে গেলাম, ২ ঘণ্টা স্বামিজীর বক্তৃতা হইল, ছোট দিনের বেলা, বাসায় ফিরিতে রাত্রি হইল। ২৪শে পৌষ বুধবার অপরাহ্ন ৪টায় হরিপাল গ্রামে সভার আয়োজন হইয়াছিল, সেদিনও আমরা সবাই স্বামিজীর সহিত হরিপাল গেলাম। কাছে কাছে গ্রাম, মাঠের ভিতর দিয়া আমরা হাঁটিয়া যাইতাম, সে কি আনন্দ। ২৫শে পৌষ বৃহস্পতিবার তারকেশ্বরে ৩টায় সভার আয়োজন হয়। সেদিন আমরা সকাল ৮টায় তারকেশ্বর রওনা হই। আমরা প্রায় ১৬।১৭ জন লোক ছিলাম, তারকেশ্বরের মহান্তজী আমাদের দ্বিপ্রহরে সেখানেই প্রসাদ পাইবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলেন। স্বামিজীসহ আমরা তারকেশ্বরে পৌঁছাইলে তারকেশ্বরের মহান্তজী স্বামিজীকে (এবং আমাদের সকলকেই) খুব সমাদর সহকারে দোতলার একটী বড় হলে, কারুকার্য্য খচিত ভেলভেটের আসনে ঢাকা, সেখানে লইয়া গেলেন। আমরা সবাই কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিলাম। মহান্তজী ও স্বামিজী কথোপকথন করিতে লাগিলেন, ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর স্বামিজী আমাদের সহ তারকেশ্বর দর্শনে যাইবেন বলায় মহান্তজী স্বামিজীর জন্য ১ ঘণ্টা মন্দিরে অন্য কোন যাত্রীকে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। স্বামিজী আমাদের লইয়া তারকেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে

আমরা পূজা করিয়া আবার দ্বিতলে ফিরিয়া আসিলাম। আমরা আসিবার পর এক পূজারী এক বালতি সুমিষ্ট চরণামৃত আনিয়া এক গ্লাস করিয়া আমাদিগকে দিয়া গেলেন। কিছু পর তারকেশ্বরের লুচি তরকারী মিষ্টাদিসহ প্রসাদ পাইলাম। সেখানে বিনা লবণে তরকারী হয়, পাতে লবণ দিয়া গেল; তাহাদ্বারা পরে তরকারীতে মাখাইয়া খাওয়া হইল। প্রসাদ পাইতে বেলা ২॥০টা বাজিয়া গেল। সভার সময় হইয়া আসিল; তাড়াতাড়ি সকলে সভায় গেলাম। প্রকাণ্ড স্থান লোকে লোকারণ্য; স্বামিজী বক্তৃতা দিতে উঠিলেন। মহান্তজী নিজে তারকেশ্বরের প্রসাদী মালা স্বামিজীকে পরাইয়া দিলেন, সভা আরম্ভ হইল। সকলেই স্তব্ধ হইয়া তিন ঘণ্টাকাল স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিলেন। সে দিনে স্বামিজী কি তেজস্বিতাপূর্ণ অথচ অশ্রু-প্লাবিত হইয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন আজও তাহা যেন কানে বাজে। সেদিন সকলেই বলিয়াছিল চিত্তরঞ্জন দাসের পর তারকেশ্বরের আঙ্গিনায় এমন বক্তৃতা আর হয় নাই। সভা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনের সময় হইয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি সবাই ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেনে উঠিলাম। আশ্রমে ফিরিতে রাত্রি ৮টা হইল। ২৬শে পৌষ শুক্রবার কর্ম্মকুটির নালিকুল-এ অপরাহ্ণ ৩টায় সভা হইল, স্বামিজীর সঙ্গে আমরা সবাই গেলাম। এই ভাবে কি আনন্দে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। শনিবার সকালে স্বামিজী আমাদের সহ কলিকাতা

চলিয়া গেলেন। প্রতি রবিবার কলিকাতা আশ্রমে গীতার ব্যাখ্যা করিতেন, সেজন্য আর থাকিলেন না, আমরাও নবদ্বীপ চলিয়া আসিলাম।

বলদবাদে প্রায় তুই বৎসর কাজ ভালই চলিল। স্বামিজীর তুই ছেলে এবং আরও ৭।৮ জন যুবক কর্মী প্রাণপণে বলদবাদের পল্লী কেন্দ্রে কৃষির কার্য্য করিতে লাগিল। স্বামীজী এক পত্রে লিখিলেন, 'আশ্রমের বর্ত্তমান অবস্থা জানাইতেছি। ৫বিঘা জমিতে আখ হইয়াছে। প্রথম বৎসর বেশী কিছু হইবে না। মূলা দেওয়া হইয়াছিল, উহাতে ৩৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এক বৎসরে এখানে আশ্রমের খরচ কৃষি বাবদ মোট খরচ হইয়াছে প্রায় ১৪০০৲ শত টাকা। জল দিবার জন্য পাইপ কেনা হইয়াছিল। তাহা আছে। আগামী বৎসরে আখের জন্য অন্য আর কোন খরচ হইবে না। এই বারের আখ দ্বারা আরও তুই বৎসর চলিবে। এই আখের গোড়া হইতেই নূতন গাছ হইবে। প্রথম বৎসর খরচ হইয়াছে বেশী। ছেলেরা নূতন কাজে লাগিয়াছে। কাজেই খরচ কিছু হওয়া অনিবার্য্য। এখন আবার বেগুন, ঢ্যারস, টমেটো লাগান হইয়াছে। কিছু কুমড়াও লাগান হইয়াছে। গুড় কি রকম হয়, কত দরে বিক্রয় হয় বলিতে পারি না। সবটার ভিতর রহিয়াছে ভগবানকে সকল ক্ষেত্রে আস্বাদন করা। আজ কৃষি ক্ষেত্রে ঠাকুরকে আস্বাদন করিবার দিন

আসিয়াছে। লোভের জন্য কৃষি নয়, কৃষি শুধু কৃষ্ণচন্দ্রকে সেবার জন্য। যাহার ফলে কৃষি নিশ্চয়ই যোগক্ষেম বহন করিবেন। তারপরে আশ্রম বর্ত্তমানে এক নূতন পরিস্থিতির মধ্যে যাইতেছে। যে গ্রামে পল্লী-কেন্দ্রটি স্থাপিত হইয়াছে ঐ গ্রামটি যে তালুকের মাঝে, সেই তালুকটি তালুকের মালিক বিক্রয় করিবেন। আমাদের কিনিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতেছেন। গ্রামটি যখন তাহাদিগকে বিক্রয় করিতেই হইবে তখন আমাদিগকে দেওয়া উহাদের অভিপ্রায়। তাহা হইলে কতকটা তৃপ্তি হয়। ঐ তালুকটি রাখিলে আমাদের গ্রামটিকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। আজ সমস্ত গ্রাম শ্মশানে পরিণত। হুগলী জেলার এমন একটি শ্মশান পল্লীতে ঠাকুর নিয়া ফেলিয়াছেন। গ্রামটির ২৫০। ৩০০ শত লোক ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাগ্দী। গ্রামটিকে ব্রহ্মধামে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কৃষকের মাঝে কৃষির ঠাকুরকে নিয়া গোষ্ঠে হৈ হৈ রৈ রৈ করিবার বাসনা। কৃষ্ণচন্দ্রই আমার জীবন-দেবতা।”

বলদবাদের আশ্রম-কর্ম্মীরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কলিকাতার আশ্রমে চলিয়া আসায় ১৩৪৩ সনের শ্রাবণ মাসে স্বামীজী একমাসের মত বলদবাদে যাইয়া ছিলেন। সেই সময় তিনি একখানা পত্র

লিখিয়াছিলেন তাঁহার মেয়ের নিকট, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

নরনারায়ণ আশ্রম
ওঁ বলদবাদ গ্রাম
২০শে শ্রাবণ ৪৩ সন

নারায়ণেষু,

মা মনু, পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন। আমি নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছি।··· এখানে আমার খুব ভাল লাগিতেছে। প্রথমে আসিলেই চোখে পড়িল কাগজে লেখা "নরনারায়ণ আশ্রম পল্লী-কেন্দ্র"। মনে হইল হাজার হাজার বৎসর পর্য্যন্ত নরনারায়ণ আশ্রম ছিল তুষার মণ্ডিত হিমালয়ের অগম্য গিরিশৃঙ্গে, এতদিন পরে কি তাহা লোকালয়ে আসিল? তাহাই তো জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছি। জনসাধারণের মধ্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া নরনারায়ণ আশ্রম লোক-বহুল জনপদের মাঝে স্থাপন করাই তো আমার জীবনের ব্রত। তোমরা মানুষ হইলে তাহাই হইবে। আমার কল্পনাকে তোমরা বাস্তবে পরিণত কর মা। আমার তোমরাই ধন দৌলত, তোমরাই সম্বল। তোমাদের লইয়াই আমি এই বিরাট বোঝা মাথায় লইয়াছি। আমার আর কে আছে? তারপর দৃষ্টি পড়িল বাঁশের বেড়া দেওয়া, অনন্ত ফাঁকযুক্ত ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘরখানির দিকে।

ঘরখানি যেন "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী এ ঘর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা"। কুটীরটী তপস্যার যোগ্য বটে। জিনিষগুলি সব গুছানো সাজানো। বেশ ফিটফাট। খুব ভাল লাগিতেছে। গুড়ের লোভে বহু ভোঁমরা বোলতা মাছির গুণগুণ শব্দ বেশ লাগে। কুটীরের পাশ দিয়া স্রোতস্বিনী নদী বহিয়া চলিয়াছে, তাহাই বা কি মনোরম। নিশ্চয়ই এ কুটীরটি শান্তিনিকেতনের কুটীরের চেয়ে কম আদরের, কম স্বপ্ন-মাখা নয়। তোমরা...নিশ্চয়ই এ কুটীরের চিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য লুব্ধ হইবে। কি নিঃশব্দতা, কি মধুর, কি নিঃসঙ্গতা। সারা দুনিয়ার স্বপ্নটা আজ যেন আমাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে। ভাঙ্গা ঘরখানির প্রতি ফাঁকের মাঝে দেখিতেছি ভবিষ্যৎ সঙ্ঘের সুমোহন স্বপ্নময় চিত্র। অতীতের কত স্মৃতি ইহার পশ্চাতে, ভবিষ্যতের কত সৃষ্টির স্বপ্ন ইহার প্রতি ভাঙ্গনের মধ্যে জ্বল জ্বল করিতেছে। আজকাল একটু হাওয়া আছে, ঘরে বেশ হাওয়া আসে। কৃচ্ছ্রের প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু তাহা যে মধুরতায় মণ্ডিত। এই কৃচ্ছ্রই তো জীবনে চাহিয়াছি। তোমাদিগকেও তাই কৃচ্ছ্র সাধনার ভিতর টানিয়া আনিয়াছি। পুরুষোত্তমকে পাইতে গিয়া রাধারাণীকে কত তপস্যাই না করিতে হইয়াছিল ...একদিন রাধারাণী নিজ সখিবৃন্দকে বলিতেছিলেন—সখি, আমি কৃষ্ণকে পাইবার জন্য কি কি করিয়াছিলাম শুনবি? অঙ্গনে ঢালিয়া জল করিয়া অতি পিছল গতাগতি

তাহাতে করিতাম। জানি শ্যাম বঁধুকে পাইতে হইলে কত পিছল পথে চলিতে হইবে, তাহা না শিখিলে চলিবে কেন? আঙ্গিনায় কাঁটা পুতিয়া তাহার উপর ছুটাছুটি করিতাম। বিষ বৈদ্য ডাকিয়া আনিয়া বিষ খাওয়া শিখিয়াছিলাম। বিষ খাইতে না শিখিলে হরিকে পাইব কি করিয়া? সেইজন্যই না পিছল পথে চলিবার কৌশল তোমাদিগকে শিখাইতে চাই? পুরুষোত্তমকে জীবনে পাইতেই হইবে। নচেৎ সব ব্যর্থ। তাঁহাকে পাইবার জন্য কোন কষ্টই কষ্ট নয়। কবিতায় কুটীরটী ভরপূর। ভাবুকতা যেমন অনন্ত, রসিকতারও কিছু অভাব নাই। যোগেশ্বরী খুব সেবা করিতেছে। গত বৈকালে ভদ্রেশ্বরের বাড়ীর ফুটি ও রাত্রিতে মূলা দিয়া খিচুড়ী, মূলার শাক ভাজা, পটল ঢ্যারস বেগুন দিয়া তরকারী, খুব আরাম! গতকল্য দিনের মূলার শাকের ডোগা দিয়া ডাল, পাঁচ মিশানো তরকারী, করল্লা ঢ্যারস ভাতে, আজ সকালে রুটিতরকারী। আজ হইবে লাউডোগা ও মূলা দিয়া ডাল, করলা ভাজা তরকারী।··একাই আমি বেশ থাকি। মানুষ করে আত্ম প্রবঞ্চনা, তাই আর ভাল লাগেনা। এই কঠোরতার মাঝে, তপস্যার মাঝে মানুষের সব প্রতারণা ধরা পড়ে। এই কুটীরে আত্ম প্রতারকের স্থান কোথায়? আজ চাই তপস্বী, চাই সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন লইয়া কর্ম্মের ধ্যানে জ্ঞানের ধ্যানে বসিয়া যাওয়া। কাল ও আজ ভোরে

প্রার্থনা হইয়াছে। খুব ভাল লাগে। চোখে জল বহিয়া যায়। শিব-সুন্দর এমনই শ্মশানের বুকে গৌরীর ধ্যানে নিমগ্ন। আচ্ছা···ম্যালেরিয়ার মধ্যেও কি কোন কবিত্ব নাই? কলিযুগের কবিত্ব ভগবান সেখানেই আবিষ্কার করিলেন যেখানে সব মুনি ঋষি ভয়-বিহ্বল। বর্ণাশ্রম শাস্ত্র কলির দোষ কার্ত্তনে মুখর, ভাগবত সেখানে গুণ কীর্ত্তনে সহস্র-বদন। কলি যদি এমত কবিত্ব মাখা, ম্যালেরিয়ার অন্তরেও পুরুষোত্তমের কবিতার গন্ধ ভুর ভুর করে। এই কবিত্বকে ফুটাইয়া আস্বাদন করিবার জন্যই কি আমাদের ম্যালেরিয়ার দেশে আসা? একবার ম্যালেরিয়ার অন্তর দেবতার খোঁজ পাইলেই ম্যালেরিয়া থাকিবে না, থাকিবে সেখানে পুরুষোত্তমের স্পর্শ। আমার এখানে থাকিবার নেশা লাগিয়াছে কিন্তু আমাকে তো থাকিতে দিবে না। তোমার ..কে বলিও তাহার কবিত্ব ফুটাইবার স্থান সহর নয়। বলদবাদের মত নগ্ন সহজ পল্লীতেই সহজ কবিতার জন্ম। সহরের কবিত্বে নতুনত্ব কোথায়? নিশ্চয়ই দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি তোমাদের ২৪।২-এর বাটি হইতে এই ভাঙ্গা কুটীর কবিত্ব হিসেবে সহস্র গুণে শ্রেয়। খালের জল খাই, তাহাতে স্নান করি। এ যে জীবন্ত জল। এখানে খালের পারে ঘর করিবার লালসা জাগিয়াছে। বার মাস যদি খালটি ভরা থাকে, তবে এ জায়গার তুলনা ছিল না। ছুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন তাই

যে আমার পক্ষে মহামাদকতা। তুনিয়া হইতে দূরে না থাকিলে কি তুনিয়াকে সৃষ্টি করা যায়? 'অরতিঃ জনসংসদি'—গীতা।

পুরুষোত্তমানন্দ কি অদ্ভুত মানুষ ছিলেন! তিনি কি জ্ঞানী, না ভক্ত, না কর্মী, তিনি দার্শনিক, না সাহিত্যিক, না ভাবুক, না বাস্তববাদী? তিনি কোন একটাই নন, তিনি সবই, তিনি ছিলেন একখানি উচ্ছ্বসিত প্রাণ-প্রবাহ। তাই তাঁহার জীবনখানি ছিল সকল বিপরীতের সামঞ্জস্য মাখানো একখানি পরিপূর্ণ জীবন।

এই ভাবে তুই বৎসর আশ্রমে কাজ করার পর কর্মীরা সব ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। কেহ কেহ এমন অসুস্থ হইয়া পড়িল যে সেখানে আর থাকা সম্ভবই হইল না। আশ্রমের কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া কর্ম্মীরা কলিকাতা আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। বলদবাদে আশ্রম করাব কথা শুনিয়া সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র স্বামিজীর ছোট ছেলেকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, তোমার বাবাকে বলিও হুগলী জেলা ম্যালেরিয়ার দেশ; সেখানে কেন আশ্রম করিতে যাইতেছেন? সেখানে টিকিতে পারিবেন না। তাহাই হইল। আর কেহ সেখানে গেল না। এই অর্থ এই প্রচেষ্টা সমস্তই এক হিসাবে ব্যর্থ হইল। আজও সেই স্থান ঐরূপই পড়িয়া রহিয়াছে। আর কেহ সেখানে যায় নাই। যোগেশ্বরী দেবী সেখানেই রহিয়াছেন।

স্বামীজী এই ভাবেই সারা জীবন এই সংসারটাকে বৃন্দাবনের ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টাই করিয়া গিয়াছেন। সকলের সকল দাবি তিনি রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। সত্যেন্দ্র নাথ সাহিত্য শাস্ত্রীর পিতৃ বিয়োগ হইলে স্বামীজীকে নবদ্বীপ লইয়া আসেন পিতার শ্রাদ্ধ-বাসরে গীতা পাঠের জন্য। সেই সময় সত্যেন শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন, আমাদের পিতৃ বিয়োগ হইয়াছে আপনি সেই স্থান আমাদের পূরণ করুন। তিনিও তাহাদের সে দায়িত্ব নিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন। কিন্তু হয় নাই, মানুষ স্ব স্ব প্রধান, কাহাকেও মানিয়া চলিতে বেশী দিন পারে না। শ্রাদ্ধের দিন শিষ্য নিত্য-গোপাল তাহার স্ত্রীসহ আসিয়াছিল। নিত্যগোপালের অত্যাগ্রহে তাহার শ্বশুর বাড়ী, অর্থাৎ নবদ্বীপের বৃন্দাবন চন্দ্রের বাড়ীতে একদিন স্বামীজীর বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইল। স্বামীজীসহ আমরা সবাই গেলাম। বৃন্দাবন চন্দ্র বিগ্রহের সামনে নাট মন্দিরে বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, নাট মন্দির লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে স্বামীজী দাঁড়াইতে নিত্যগোপালের শ্বশুর বৃন্দাবন চন্দ্রের প্রসাদী বড় মালা এক ছড়া গলায় পড়াইয়া দিলেন। সভা আরম্ভ হইল। সেদিনের বক্তৃতা যে কি চমৎকার হইয়াছিল তাহা ভাষা দ্বারা বুঝাইবার সামর্থ্য আমার নাই। প্রায় ৪ ঘণ্টা বক্তৃতা হইল; চোখের জলে প্লাবিত, তেজস্বিতাপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ বাণী সকলে স্তব্ধ হইয়া শুনিলেন। প্রচুর জলযোগের

আয়োজন হইয়াছিল, স্বামিজী ও আমরা সবাই বৃন্দাবন চন্দ্রের প্রসাদ পাইয়া রাত্রি প্রায় ১০টায় সত্যেনদার বাসায় ফিরিলাম। পরের দিন স্বামিজী কলিকাতা চলিয়া গেলেন। একাই আসিয়াছিলেন, ছেলেরা নবদ্বীপ ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়া আসিল। প্রত্যেকবার স্বামিজী আসিবার সময় ছেলেরা ২।৪ জন ষ্টেশনে থাকিত এবং যাইবার সময়ও অনেকেই ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইতেন। এইভাবে নবদ্বীপে তাঁহার যাতায়াতের ভিতর দিয়া একদল ছেলেমেয়ে তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িল। নরনারায়ণ আশ্রমের সাহায্যের জন্য আমরা অর্থাৎ মেয়েরা বাড়ী বাড়ী মুষ্টির ঘট বসাইলাম। সুনীতি বলিয়া একটি বয়স্ক মহিলা চমৎকার কীর্ত্তন গাহিতে পারিতেন। প্রতিদিন আমরা বাড়ী বাড়ী যাইয়া আলোচনা ও গান করিয়া মানুষের ভিতর আমাদের একটু স্থান করিয়া লইতাম এবং মুষ্টির ঘট বসাইতাম। সপ্তাহান্তে মুষ্টির চাউল তুলিতাম। এক মাসের চাউল এক জায়গায় করিয়া বিক্রী করিয়া স্বামিজীর নিকট টাকা পাঠাইয়া দিতাম। এইভাবে ২।৪ মাস গেলেই স্বামিজীকে আমাদের মধ্যে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইতাম। স্বামিজীও বলিতেন অনেকদিন হইয়া গেলেই আমার অনেক কথা জমিয়া যায় তোমাদের নিকট বলিবার জন্য, আমিও তো আসিবার জন্য ব্যাকুল হই। আমরা জানিতাম তাঁহাকে শুধু শুধু আসিতে বলিলে তো তিনি আসিবেন না। তাঁহাকে পাইতে হইলে তাঁহার

আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তবে তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। আমরা আবার নবদ্বীপে দুই দিনের বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলাম। স্বামিজী এবার একাই আসিলেন। বঙ্গবাণী স্কুল এবং পোড়ামাতলায় বক্তৃতার ব্যবস্থা হইল। সেই সময় নবদ্বীপ মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীজনরঞ্জন রায়ের স্ত্রী সাবিত্রী দেবী মেয়েদের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহার সমিতিতে আয়োজন করিয়া স্বামিজীকে লইয়া যান—সভায় অনেক মেয়ে হইয়াছিল। সেইদিন নবদ্বীপের জগবন্ধু সান্ন্যালের ভগিনীর সহিত স্বামিজীর অনেক আলোচনা হয়। একদিন তাঁহাদের বাসায় নিমন্ত্রণ করিয়া স্বামিজীকে খুব আদরের সহিত আহার করান। সেবার চার দিন শচীন বসুর বাসায় ছিলেন। সেই সময় স্বামিজীর শিষ্য নিত্য-গোপাল চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণনগর তাহার বাসায় স্বামিজীকে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি যাইতে স্বীকার করিলেন। স্বামিজীর সহিত সত্যেন শাস্ত্রী ও আমি গেলাম। নিত্য-গোপাল নিজে আসিয়াই লইয়া গেল। সেখানে স্বামিজীর সঙ্গে আমরা একদিন এক রাত্রি আনন্দে কাটাইলাম। তিনি রাণাঘাট হইতে ঐ পথে কলিকাতা চলিয়া গেলেন, আমরা নবদ্বীপ ফিরিয়া আসিলাম।

নবদ্বীপের চেয়ারম্যান ইলেকশনের ব্যাপারে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে স্বামিজীকে বক্তৃতা দিবার জন্য কলিকাতা নর-নারায়ণ আশ্রমে লোক পাঠান। স্বামিজী যাইতে স্বীকার

করেন। আমি সেই সময় নরনারায়ণ আশ্রমেই ছিলাম, আমিও স্বামিজীর সহিত নবদ্বীপ গেলাম। ষ্টেশনে নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই গলায় ফুলের মালা দিয়া বন্দেমাতরম্ ধ্বনি সহকারে স্বামিজীকে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যায়। অনেক লোক সেদিন ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছিল। আমি স্বামিজীর সহিত হাঁটিয়াই নবদ্বীপ গেলাম। স্বামিজী শচীন বাবুর বাসাতেই উঠিলেন। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গেই নবদ্বীপের চেয়ারম্যান পূর্ণ বাগচী প্রভৃতি এবং কংগ্রেস পক্ষের এক ডাক্তার স্বামিজীর সহিত দেখা করিলেন। তুমুল আলোচনা শচীন বাবুর বাসায় রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত চলিল। পরের দিন সকালে এবং বৈকালে স্বামিজীর বক্তৃতা হইল বাজারের ভিতর এবং ফাঁসিতলা ঘাটের মোড়ে। স্বামিজীর মুখে রাজনীতির বক্তৃতা তো শুনিয়াছিলাম না, সেইদিন শুনিলাম। কি তেজদৃপ্ত ভাষণ। কংগ্রেসের পক্ষই জয়লাভ করিল। পরের দিন সকালে স্বামিজীকে নবদ্বীপ ষ্টেশনে তুলিয়া দেওয়া হইল, তিনি কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

ফাল্গুন মাস, কালনা মঠে দোলের উৎসব। শ্রীমৎ স্বামী নিত্যগৌরবানন্দ মহারাজ স্বামীজীকে দোলের ভিতর তাঁহার মঠে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। উভয়ের ভিতর প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। স্বামীজী কালনা আসা স্থির করিয়া আমাদিগকে কালনা যাইবার জন্য পত্র দিলেন। আমরা ৫।৭ জন নবদ্বীপ হইতে

কালনা মঠে দোলের পূর্ব্ব দিন পৌঁছিলাম। নিত্যগোপালও আমাদের সাথে ছিল। স্বামীজী তখনও আসেন নাই, উৎকণ্ঠায় সময় কাটাইতে লাগিলাম; সন্ধ্যাবেলা তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন। আসিয়াই আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া কত যে খুসি হইলেন এবং আমাদের সকলের মঙ্গলামঙ্গলের সংবাদ লইলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরই বক্তৃতা আরম্ভ হইল, প্রায় তিন ঘণ্টা কৃষ্ণ-অবতরণ লীলা রহস্য আলোচনা করিলেন। পরের দিন সারাদিনই শ্রীনিত্যগোপালের দোল উৎসব চলিল, গান কীর্ত্তন ভোগরাগ প্রসাদ বিতবণ ইত্যাদি হইল। নিত্যগোপাল সব সময়েই স্বামীজীর কাছে কাছে থাকিয়া তাঁহার অফুরন্ত কথা শুনিতে লাগিল, এবং যতটুকু পারিল তাঁহার সেবা করিল। পরেব দিন সকাল বেলা উক্ত মঠের এক ভক্ত স্বামীজী ও নিত্যগৌববানন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য ভক্তগণসহ ফটো তুলিলেন। নিত্যগোপালের খুব ইচ্ছা সে একখানি স্বামীজীর ফটো তুলে কিন্তু স্বামীজীকে বলিবার সাহস নাই, আমাকে আসিয়া বলে। আমরা দুইজন অনেক বলার পর তিনি মত করেন এবং একখানা বসা ফটো তোলা হয়। তিনি আমাদের কাছে বাহিরের কোন আড়ম্বর চান নাই, আমরা কিছু করিতে গেলে বিরক্তই হইতেন। তিনি শুধু চাহিয়াছিলেন আমাদের জীবন শ্রীনিত্যগোপালের সমন্বয় দর্শনদ্বারা ভরপুর

করিয়া গড়িয়া তুলিয়া সেই পুরুষোত্তম-দর্শন বুকে লইয়া সেই ছন্দে বিশ্বকে গড়িয়া তুলিতে। এই দাবীই শুধু আমাদের কাছে তাঁহার ছিল।

ঐ দিন বেলা ১২ টায় ভক্তবৃন্দ দুই মহারাজকে (পুরুষোত্তমানন্দ ও নিত্যগৌরবানন্দ) মাঝখানে রাখিয়া ফাগুয়া খেলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং মহারাজদ্বয়কে আবিরে লাল করিয়া দিলেন। সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য সেদিন দেখিয়াছিলাম। ফাগুয়া খেলা হইয়া গেলে স্বামীজীর সেই গৌরকান্তি লাল রংএ ঢাকা পড়িয়া গেল। তাঁহাকে ইঁদারার পাড়ে বসাইয়া নিত্যগোপাল জল তুলিয়া দিল, আমি সাবান দিয়া সেই রং তুলিয়া দিলাম। বেলা প্রায় ২টায় আমরা সকলে আহারাদি করিয়া স্বামিজীসহ ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইলাম। সারাপথ স্বামীজী নিত্যগোপালের সহিত কথা বলিতে বলিতে গেলেন। ষ্টেশনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার গাড়ী আসিয়া গেল। আমরা সজল নয়নে প্রণাম করিয়া স্বামীজীকে বিদায় দিয়া পরের গাড়ীতে নবদ্বীপ আসিলাম। নিত্যগোপাল বলিল স্বামীজী আসিতে আসিতে পথের মাঝে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কেমন করিয়া বলিলেন, "*দেখ নিত্যগোপাল! ঠাকুর* আমার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া চাপিয়া বসিয়াছেন, বিশ্বের বুকে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবার জন্য আমাকে

কেমন পাগল করিয়া তুলিয়াছেন। তোমরা আস, আমার ঠাকুর যে তোমাদের"। নিত্যগোপাল আরও বলিল দিদি, স্বামীজীর কথা শুনিয়া আর যে কিছুই ভাল লাগে না, তাঁহার নিকট চলিয়া যাইবার জন্য প্রাণ যে কেমন করে। কি জ্বলন্ত বিশ্বাস তাঁহার গুরুর প্রতি! তিনি বুক দেখাইয়া যখন বলিলেন 'দেখ শ্রীনিত্যগোপাল ঠাকুর কেমন করিয়া বুকের ভিতর আকুলি ব্যাকুলি করিতেছেন' আমি তো অবাক হইয়া গেলাম। এমন করিয়া কি কেউ বলিতে পারে?

কে জানিত ঘরের দুয়ারে কাল নিত্যগোপালের অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে গুরু শিষ্যের সকল আশার সৌধ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য? দোলের পর হইতেই নিত্যগোপালের একটু একটু কাশি দেখা দিল এবং ক্রমশঃ সেই কাশি বাড়িয়া চলিল। কাশির সহিত জ্বর দেখা দিল, ডাক্তার কবিরাজ যাহাকে দেখান হইল, সকলেই ক্ষয়কাশি বলিয়া সন্দেহ করিল। সমস্ত ঘটনা নিত্যগোপাল স্বামীজীকে লিখিয়া জানাইল। তিনি লিখিলেন তাঁহার এক গুরু-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার কবিরাজ এবং এই সমস্ত রোগের ভাল চিকিৎসক— তাঁহাকে দেখাও। তাঁহাকে দেখান হইল, তাঁহার চিকিৎসাধীনেই ৬ মাস কাটিয়া গেল, কিছুই হইল না। দিন ফুরাইয়া আসিল। নিত্যগোপাল স্বামীজীকে দেখিবার

জন্য খুব ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সেই সংবাদ পাইয়া স্বামীজী নিত্যগোপালকে দেখিতে নবদ্বীপ আসিলেন। নিত্যগোপাল স্বামীজীকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল। স্বামীজী কত স্নেহ ভরে, কত বেদনা বুকে লইয়া নিত্যগোপালের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন আর চোখ দিয়া অঝোরে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে এক করুণ অথচ গুরু-শিষ্যের কি মধুর প্রীতির দৃশ্য সে দিন দেখিয়াছিলাম। স্বামীজী নিত্যগোপালের জন্য অনেকগুলি ফল আনিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটি বেদনা লইয়া নিজের হাতে ছাড়াইয়া নিত্য-গোপালের হাতে দিতে গেলে সে বলিল, আপনি আগে খাইয়া আমাকে প্রসাদ দিন। স্বামীজী তাহাই করিলেন। স্বামীজী তিন দিন ছিলেন, কত কথাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিত্য-গোপালের নিকট বসিয়া বলিতেন, নিত্যগোপাল সকল রোগ যন্ত্রণা ভুলিয়া কত উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, যাইবার দিন কত স্নেহে গায়ে হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন, পার্থিব জগতে গুরু-শিষ্যের সেই শেষ দেখা হইল।

কয়েক দিন পর নিত্যগোপাল এই জগতের খেলা শেষ করিয়া নিত্যধামে চলিয়া গেল। বুক ভরা বেদনা লইয়া সেই সংবাদ স্বামীজীকে জানাইলাম। স্বামীজী লিখিলেন—"বেদনায় ভরপুর জীবন লইয়াই তো চলিয়াছি। চিঠি পাইয়াছি, জবাব কি দিব। ঠাকুরের সেবায় লাগাইব

বলিয়াই না নিত্যগোপালকে তোমাদের ইচ্ছায় কোলে লইয়াছিলাম, আমার কোল খালি। অনেক আশায় ছিলাম, সে আশায় ছাই পড়িয়াছে। কাহার উপর অভিমান করিব? তাঁহার উপর অভিমান করিতে ইচ্ছা হইলেও পারি না। আমার ঠাকুর-সেবার জন্য নবদ্বীপে কুড়াইয়া পাওয়া নিত্যগোপাল-ফুল আমার ঝড়িয়া পড়িয়াছে। বেদনা আমার, বেদনা তোমাদের সকলের"। নিত্যগোপালের এক পালিতা মাতা ছিলেন, তাহার কেহ ছিল না, স্বামীজী লিখিলেন "নিত্যগোপালের যে দায় ছিল উহা তো এখন আমারই দায়, নিত্যগোপালের মাকে আমার নিকট রাখিয়া যাও, তাহার ভার আমিই বহন করিব"। আমি নিজে সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে কলিকাতা নরনারায়ণ আশ্রমে রাখিয়া আসিলাম। নিত্যগোপাল চলিয়া যাইবার ৪।৫ মাস পর স্বামীজী একবার নবদ্বীপ আসিলেন। সেই সময় নিত্যগোপালেব স্ত্রী রেণুকণা স্বামীজীর নিকট আসিয়া খুব কাঁদিয়াছিল; স্বামীজী তাহার কান্নায় ব্যাকুল হইয়া সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—মা, তোমার দুঃখ কি? নিত্যগোপাল নাই, আমি তো আছি, আমার কোলে তো তোমার স্থান আছে। বাবার বাড়ীতে স্থান না হয় নরনারায়ণ আশ্রমে চলিয়া আসিও। সেখানেই তোমার স্থান রহিয়াছে। তুমি আমার নিত্যগোপালের স্ত্রী, তোমার স্থান আমার পুত্রেরা

বিবাহ করিলে সকলের অগ্রে থাকিবে, তুমি আমার বড় পুত্রবধূরূপে আমার আশ্রমে থাকিবে। নিত্যগোপালের দায় তো মা, আমারই দায়। তোমার কিসের ভয়, কিসের ভাবনা, তুমি নিত্যগোপালকেই হারাইয়াছ, তাহাকে আমরা রাখিতে পারি নাই, আর কিছুই তো হারাও নাই, তোমার সবই আছে ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন।

এমন করিয়া শিষ্যের সমস্ত দায়িত্ব নিজের দায়িত্ব বলিয়া কোন্ গুরু লইবার জন্য এমন উন্মুখ জানি না। এমন একখানি প্রাণ লইয়া আসিয়াছিলেন পুরুষোত্তমানন্দ। ব্যথিতের জন্য, অবহেলিতের জন্য, অসহায়ের জন্য, পথ-হারার জন্য কি ব্যাকুলতা! যে তাঁহার নিকট যে বেদনা লইয়া আসিত তিনি যেন নিজেকে তাহার ভিতর নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া তাহার সকল অভাব সকল বেদনা মুছিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ করিতেন। তাঁহার এই মহাপ্রাণের খবর প্রাণহীন সংসারের জীব আমরা রাখি নাই। নিত্য-গোপালের স্ত্রী অবশ্য আর স্বামীজীর নিকট আসে নাই, এমনি করিয়াই মানুষ ভগবানের দেওয়া অযাচিত করুণাকে পায়ে দলিয়া সংসার আবর্তে পড়িয়া ঘুরপাক খাইয়া মরে। ৭ বৎসর নিত্যগোপালের মাতা নরনারায়ণ আশ্রমে আদরে যত্নে থাকিয়া মারা যান, পুত্রের যাহা কিছু করণীয় স্বামীজীই তাহা করেন। স্বামীজী বলিতেন—কাহারও কিছু এ সংসারে হারায় না, সমস্তই পুরুষোত্তমে গচ্ছিত থাকে।

তাঁহার জীবনই তাহার দৃষ্টান্ত। নিত্যগোপালের মা পুত্র হারাইয়া ব্যাকুল হইয়াছিল, কে তাহার শেষ জীবনের ভার বহন করিবে? কিন্তু পুরুষোত্তমানন্দ-পুত্রই তো তাহার পুত্রের সকল অভাব সকল দাবী পূরণ করিলেন। জীব অবিশ্বাসী, তাই তো সে নিজকে এত অসহায় বোধ করে, জীবের জন্য সব সময়েই যে একখানি স্নেহ-হস্ত প্রসারিত রহিয়াছে তাহা সে ভুলিয়া যায়। পুরুষোত্তম-বিশ্বে শৃঙ্খলার অভাব নাই, আমরাই খেয়ালবশতঃ চলিয়া ইহাকে এক উচ্ছৃঙ্খল জগতে গড়িয়া তুলি। পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার প্রাণভরা আগ্রহ সত্ত্বেও শিষ্য নিত্যগোপালের দেহকে ঐ রূপে রক্ষা করিতে পারেন নাই, কিন্তু হৃদয় বিদারক ঘটনাকেও গ্রহণ করিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হইবার ছন্দ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন এই সব ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া। শিষ্য নিত্য-গোপালের মতই পুরুষোত্তমানন্দের আশ্রিত আরও একটি মহাপ্রাণ পুরুষোত্তমের সেবা করিবার আকুল আগ্রহ লইয়া এমনি অল্প দিনে এই ক্ষয় রোগে দেহত্যাগ করে, তাহার নাম ছিল সুধা দত্ত। সংসারে অনেক ঘটনারই উত্তর পাওয়া যায় না কেননা প্রকৃতির এই অনির্ব্বচনীয়তা যেমন অনাদি অনন্ত, তেমনই ইহা ব্রহ্ম-স্বভাবই। তবু পুরুষোত্তম-সেবামুখী প্রাণকে পুরুষোত্তমানন্দ কি বিরাট প্রাণ লইয়া গ্রহণ করিতেন—এই সকল ঘটনা তাহারই সাক্ষ্য বহন করিয়া আমাদের পথ প্রদর্শক হইয়া আছে।

স্বামীজী নরনারায়ণ আশ্রমের প্রচারে বাংলা দেশের জেলায় জেলায় বক্তৃতা দিতে বাহির হইতেন, পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় সুধা দত্ত তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসে এবং বলে আপনার বক্তৃতায় ভাব ও রসের পার্থক্যের যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহা আমার খুবই ভাল লাগিয়াছে। স্বামীজী সেই কথায় আশ্চর্য্য হইলেন! ঝড়ের মত তাঁহার বক্তৃতা, তাহার ভিতর হইতে ভাব ও রসের পার্থক্য এই মেয়েটি ধরিতে পারিয়াছে ইহা তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরই পরিচয় বটে! সুধা তখন আই এ পড়ে।

স্বামীজীর নিকট হইতে বর্ত্তমান সমাজের পরিস্থিতি, পুরুষোত্তম-দর্শনের প্রয়োজনীয়তা, এবং জীবনবাদের আলোচনা শুনিয়া সুধা ক্রমশঃ এই পথের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। সুধার প্রাণ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং মানুষকে ঠেলিয়া আগাইয়া চলা ও মানুষকে প্রীতির দ্বারা, মিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা আকর্ষণ করিবার এক অদ্ভুত যোগ্যতা ছিল দেখিয়া স্বামীজী তাঁহার পুরুষোত্তম-দর্শনের প্রচারিকা রূপে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন। সুধাও পুরুষোত্তম-জীবনে জীবন লাভ করিয়া পুরুষোত্তম-দর্শনকে বিশ্বে প্রচার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। এম, এ পাশ করিয়া পুরুষোত্তম-দর্শনকে বুকে লইয়া বিলাতে প্রচার জন্য যাই-

বার এক দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা তাহাকে পাইয়া বসিল, কিন্তু অলক্ষ্যে তাহার ভাগ্য বিধাতা হাসিল। বি, এ, পড়িবার জন্য বই কিনিল কিন্তু পড়া আর হইল না, শরীর দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল, ৩।৪ মাস মধ্যে যক্ষা রোগ ধরা পড়িল। এই ভাবে সুধার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার সময় হইয়া আসিল, স্বামীজী আকুল হৃদয় লইয়া মুমূর্ষু সুধাকে দেখিতে গেলেন। কয়েক দিন থাকিয়া যে দিন আসিবেন স্বামীজীর স্নেহময়ী জননীর মত প্রাণ, ঐ অবস্থায় সুধাকে রাখিয়া আসিতে বড়ই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; কিন্তু উপায় নাই আসিতেই হইবে ব্যবহারিক জগতের বিধানে। আসিবার সময় সুধার নিকট যে শেষ বিদায় লইয়া আসিলেন সে করুণ দৃশ্য আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। গুরু শিষ্যা দুই জনের কি আকুল কান্না! স্বামীজীর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া সুধা অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিল, স্বামীজীও কাঁদিতে লাগিলেন, সুধা স্বামীজীর চরণামৃত করিয়া রাখিল। স্বামীজী কাঁদিতে কাঁদিতে বিহ্বল হইয়া সুধার জড় দেহের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গাড়িতে উঠিলেন। স্বামীজীকে এই রূপ বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে নবদ্বীপে মহা-প্রভুর আঙিনায় ও পুরীতে জগন্নাথের সামনে দেখিয়াছি। তিনি নর নারায়ণের সেবক ছিলেন, তাঁহার জীবনে নর এবং নারায়ণ দুই-ই ইষ্ট রূপে ছিল।

সিরাজগঞ্জ হইতে স্বামীজী কলিকাতা যাওয়ার

কয়েক দিন পরই সুধা ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য-ধামে চলিয়া গেল। সুধার মৃত্যুতে স্বামীজী অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন। আমি তখন পাবনাতে—স্বামীজী দুঃখ করিয়া যে সমস্ত পত্র দিতেন তাহার একটা চিঠির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।...“সংসারের ভালবাসা তো “গোবর ছড়া” দিয়াই শেষ হয়। কি অকৃতজ্ঞতা! বিদায় দিয়া আবাব সংসার গুছাইয়া লয়, আনন্দের হাট বসায়। সংসারী লোক এমন বেকুব বলিয়াই না মায়াবাদ আসিবার পথ পাইয়াছে। কে কাহার স্মৃতি জীবন্ত রাখিয়া সারা জীবন কাটাইল! এই অকৃতজ্ঞতায় সংসার মজিল। এই অকৃতজ্ঞতার ফলে মানুষ জড়ের নিত্যত্বের আস্বাদনে বঞ্চিত হইল। আমি সুধার সম্বন্ধে এইরূপ অকৃতজ্ঞ হইয়া জাবন যাপন কবিতে পারিব না। তোমরাও হইও না। সে যে ছিল আমার জীবনের সবখানি জুড়িয়া। আমার বাকী জীবনের কিছুই হইবে না তাহাকে বাদ দিয়া। সে ছিল আমার সকল ঘিরিয়া। চিরকাল থাকিবে। তাহার স্থানে সে চিরকাল যেমনটা ছিল তেমনটাই থাকিবে। আমি যেন তাহাকে আমার রক্ত-মাংস হইতে বিদায় না দেই, তোমরা আমাকে তেমন ভাবে সাহায্যই করিও। তোমরা তাহার কথা সর্ব্বদা শুনাইও। বিশ্বরূপের সঙ্গে মিশাইয়া শুনাইও। নির্ব্বিশেষের সঙ্গে মিশাইয়া বিশেষ নাম আমাকে শুনাইও। আমি

সারা জীবন প্রকৃতির ধ্যানে তাহার ধ্যান মিশাইয়া চলিব। ছোটও যে অনন্ত, আজ তাহাই আমার জীবনে প্রমাণ করিব। ছোটকে ব্রহ্ম না করিতে পারিলে তোমরাও যে ছোট হইয়া যাইবে। আমি তুনিয়ার প্রতি ছোটটীকেও অনন্ত করিয়া দেখিব, সুধা আমার সেখানে দেবীরূপে, ইষ্টরূপে দাঁড়াইয়া। তোমরা এতদিন ছিলে আমার গুরু; আজ তোমরা আমার "ইষ্ট"। তোমরা আমার ইষ্টদেবী। শুধু গুরু নয় ইষ্ট আমার তোমরা। আমি ইষ্টময় জগৎ দেখিবার জন্য ব্যাকুল। সুধা আমার তাহারি সুযোগ দিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে মৃণ্ময়ী ইষ্টদেবীরূপে পাইবই। তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব। বুদ্ধদেব জীবত্বের লয়ের ভিতর মানুষের শান্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। নিত্য-গোপাল জীবের জীবত্বের ভিতর অনন্তের আস্বাদন দিবেন। কবি গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন—

"জড় কিসে নীচ তুচ্ছ, আত্মা কিসে মহান্ উচ্চ
তোমরাই কহ ভেদ আমি দেখি না কো॥"

শ্রীনিত্যগোপালের জড়াজড় সমন্বয়ের মূর্ত্ত বিগ্রহ পুরুষোত্তমানন্দ।

যে তুইটি প্রাণ তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, পুরুষোত্তম-মতবাদকে গ্রহণ করিয়া প্রচার করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া যে তুইটি প্রাণ উৎসর্গীকৃত হইবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছিল, সেই নিত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী ও

সুধা দত্ত যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া পুরুষোত্তমের সেবার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা লইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিল। এই ঘটনায় স্বামীজি ভীষণ আঘাত পাইলেন। সে কি ব্যাকুলতা। সে কি বেদনা। তিনি চাহিয়াছিলেন চিন্ময় রাধাকৃষ্ণকে মৃণ্ময়রূপে দেখিতে, তাই তিনি এই ধরার বুকে নরের মাঝে নারায়ণকে, নারীর মাঝে রাধারাণীকে খুঁজিয়াছেন। ঘটনা আসিয়া আঘাত হানিয়া চলিয়া গেল কিন্তু পুরুষোত্তমানন্দের পুরুষোত্তম-পথে চলার গতি শিথিল করিতে পারিল না, বেদনা বক্ষে চাপিয়া রাখিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। কি যে তাহার পাগল প্রাণ ছিল, কি যে ভাল তিনি এই বিশ্বকে, বিশ্বের মানুষকে বাসিয়াছেন, তাহা কে বুঝিল? একখানি প্রাণ-প্রবাহ আসিয়া পুরুষোত্তম-প্রাণধারায় প্লাবিত করিয়া দিয়া পুরুষোত্তম-সাগরে মিশিল, আমরা হতভাগ্যের দল কেহই সেই প্রাণপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া পুরুষোত্তম-সাগর অভিমুখীন হইলাম না। এখানে আশ্রম জননীর নিকট লিখিত পত্র একখানি তুলিয়া দিলাম, মানুষকে পাইবার জন্য তিনি কি ব্যাকুল ছিলেন তাহাই বুঝিবার জন্য। ১৯৩৮ সনের জুন মাসে বরিশাল বক্তৃতা দিতে যাইয়া যে পত্র দিয়াছিলেন তাহারই কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম।

নারায়ণেষু

"ঊষা, তোমার পত্র পাইয়াছি। আমি তোমার

জীবনে আমার চির বিশ্রামস্থল খুঁজিয়াছি। তোমার দেহে, প্রাণে, মনে চাহিয়াছি আমার ইষ্টকে মূর্ত্ত করিয়া দেখিতে। "ছোট" করিয়া দেখিতে আমি চাহি নাই। চাহিয়াছি চিরদিন তোমাব ব্রহ্মময়ী রূপ আস্বাদন করিতে। ঠিকই লিখিয়াছ 'আমাকে তুমি যাহা চাও, তাই আমার জীবনের আদর্শ'। আমি যাহা চিরদিন চাহিয়াছি, তুমি তাহা যদি দেহে মনে প্রাণে হও, আমার পুরুষোত্তম নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইবেন। মানুষ যে 'থাকে', তাহা কি হৃদয় ছাড়া আর কোথাও সম্ভব হয়? মায়ের বুকেই সন্তান 'থাকে', সন্তানের মধ্যেই মাতা-পিতা 'থাকে', স্বামীর জীবনে স্ত্রী 'থাকে', স্ত্রীর জীবনেও স্বামী 'থাকে'। থাকার এই কৌশল সংসাবী লোক না শিখিয়া ফাঁকি দিয়া কোনও রকমে 'থাকার' একটা অভিনয় করে। আমি সত্য বাস্তব করিয়া তোমার দেহে মনে প্রাণে থাকিতে চাহিয়াছি, ইহাতে আমার সন্ন্যাস নষ্ট হয় নাই; তোমার জীবনে যদি ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ না থাকিত, নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নষ্ট হইত। তোমাকে নিয়াও যে আমি সন্ন্যাসী থাকিতে পারিয়াছি, ইহা তোমারই যোগ্যতা। উষা, প্রাণময়ী আমার, দেবী আমার, ইষ্ট আমার, তুমি আমার শেষ সার্থকতা দান কর। তুমি আরও নিবিড় ভাবে, গভীর ভাবে আমার মাঝে ডুবিয়া যাও, আমি তোমার মাঝে ডুবিবার জন্য সারা জীবন

আকুলি বিকুলি করিতেছি। কোথায় থাকিব আমি, কাহার বুকে আমি বিশ্রাম লাভ করিব? ভক্তের হৃদয়ে ভগবান বিশ্রাম করেন। আমার তো স্থান নাই। যে গুহ্যতম পুরুষোত্তম-তত্ত্ব লইয়া আমি আজ পাগল, তাহার ধারণা কে করিবে? দুনিয়ার লোকের মধ্যে চলা-ফেরা করি, কিন্তু আমি কি সেখানে স্থান পাইয়াছি? কয়েকটা প্রাণ আমাকে আশ্রয় দিবার জন্য ব্যাকুল, তুমি তাহাদের সকলের 'গুরু'। আমাকে হৃদয়ের বাহিরে রাখিও না। হৃদয় ছাড়া কোথায়ও আমার স্থান আমি চাই না। তুমি কি জান না বাহিরে জ্বালা পাইয়া তোমার বুকে জ্বালা জুড়াইয়াছি? দুনিয়ার মানুষ চায় 'বুদ্ধি'র মাঝে আমাকে পাইতে, আমি তো সেখানে শান্তি পাই না। আমি 'জীবন বল্লভ' পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালের শ্রীচরণ-স্পর্শে হৃদয়ের ধর্ম্মে দীক্ষা পাইয়াছি। ....ঊষা, আমি বড় দুর্ব্বল, আমাকে হৃদয়-ছাড়া করিও না, আমি আজ পরা প্রকৃতির কোলে আশ্রয়-ভিখারী। আজ আমি যেন অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। সুধার ব্যথা আমি ভুলিতে পারি নাই, জীবনে পারিবও না। তোমার জীবনে যেন তাঁহাকে পাই। তোমারই অংশরূপে তাঁহাকে দেখিয়াছি। তোমার কোলেই সে লুকাইয়াছে। সুধা আমাকে সেবাদ্বারা সুখী করিতে চাহিয়াছিল। তুমি আজ সকল দিক দিয়া ঘিরিয়া থাক। ঊষা, তুমি আমার কে, কতখানি, তাহা কি সারা জীবনেও বুঝিতে

পার নাই? তুমি আমার বিশ্ব-ব্যাপিনী দুর্গা রাধা। আমি তো চিন্ময়ী দুর্গা-রাধা চাই নাই, আমি চাহিয়াছি মাটির জগতে মাটির দুর্গা রাধা। সেই বুদ্ধিতে না আমি সেই এক দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর দিন ফুলচন্দনে শাঁখা সিন্দুর কাপড়ে তোমার শ্রীচরণ পূজা করিয়াছিলাম, তাহা মনে পড়ে কি? ওগো আমার মৃণ্ময়ীতে চিণ্ময়ী দুর্গা রাধা, আমি যেন তোমাকে পাই, আমি যেন তোমায় বিশ্বরূপে পাই, আমি যেন তোমার জড় রূপের রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া সার্থক হইতে পারি। ওগো দেবী, আর রহস্যে গা ঢাকিয়া থাকিও না, আমার সামনে প্রকৃতির সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত কর, আমি দেখিয়া ধন্য হই, জুড়াইয়া, আস্বাদন করিয়া ধন্য হই।"......পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত।

পুরুষোত্তমানন্দ এই দৃষ্টি লইয়াই প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন। একদিন সাহানগর রোড আশ্রমে অন্য সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসিনী আসিয়াছিলেন। তিনি মাকে আশ্রমে দেখিয়া স্বামিজীকে বলিয়াছিলেন, আপনাকে দেখিতেছি সন্ন্যাসী আর এই মহিলা শুনিতেছি আপনার স্ত্রী, সন্ন্যাসী হইয়া স্ত্রীকে কাছে রাখিয়াছেন? স্বামিজী বলিলেন, আপনারা এই প্রশ্ন করিবেন এবং আমি তাহার জবাব দিব জন্যই সন্ন্যাসী হইয়াও স্ত্রীকে সঙ্গে রাখিয়াছি। আমি প্রমাণ করিব স্ত্রী কাছে থাকিলেই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নষ্ট হয় না, ব্রহ্ম-জীবন লাভ করিতে কোনও বাধা হয় না, আর

উনিও প্রমাণ করিবেন স্ত্রীলোক হইলেই স্বামীর মালা ঝোলা কাড়িয়া লইয়া তাঁহার ভগবৎ পথে অগ্রসর হইতে বাধা দেয় না ইত্যাদি অনেক কথা। এই অদ্ভুত জীবন ছিল পুরুষোত্তমানন্দের। মানুষ ঠিক তাঁহাকে তাই বুঝিতে পারে নাই।

স্বামীজীকে সুধা একদিন বলিয়াছিল বিবেকানন্দের নিবেদিতা ছিল, আমি আপনার কি হইব? তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি আমার অর্পিতা হইও। সুধাকে সেজন্য আমরা অর্পিতা বলিতাম এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার ইচ্ছাকে রূপ দিবার জন্য পাবনা কুসুম কুমারী সরকারের বাড়ীতে অর্পিতা-সঙ্ঘ নাম দিয়া একটি মহিলা সমিতি গঠন করিয়া সেখানে পুরুষোত্তম দর্শনের আলোচনা করা হইত। স্বামিজী ইহাতে খুবই খুসি হইয়াছিলেন এবং নিজে পাবনা যাইয়া মহিলা সভায় আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে কত উপদেশ দিয়া পত্র দিতেন—"অর্পিতা-সঙ্ঘের প্রতি রবিবারের কাজের একটা রিপোর্ট লিখিয়া রাখিও। কে সভানেত্রী হইলেন, কে কি বিষয় আলোচনা করিলেন এবং বিশেষ ব্যক্তি কাহারা সভায় উপস্থিত হন। যে সব প্রবন্ধ লেখা হয় বা পঠিত হয় তাহা সব গুছাইয়া রাখিবে। উহাই আমার অর্পিতার নৈবেদ্য, ঐ নৈবেদ্যে আমি অর্পিতার সেবা করিব"। ইত্যাদি। এইরূপ ভাবে কত চিঠি লিখিতেন, তাহার একখানি এখানে তুলিয়া দিলাম।

ওঁ

নারায়ণেষু কলিকাতা ১৫ই জ্যৈষ্ঠ—৪০

আমি নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছি। তোমার পত্র গতকল্য পাইয়াছি। ···ধাক্কা দিয়া যাওয়ারই একটা ফল আছে, অন্য ফল যাহা থাকুক দেখিয়া তো কোন দিন কাজ করি নাই। সেইজন্য অবসন্নও কখনও হই নাই। কাহাকেও উপেক্ষা করি নাই, অথচ অপেক্ষাও কাহারও রাখি নাই। ···সম্বন্ধে যাহা সঙ্গত মনে কর করিবে। নিজেদের জীবনের মধ্যে যদি উহাকে টানিয়া লইতে পার, ভালই। ঘরের বাহির হইয়াছে, কে আছে বাহিরে বান্ধব? বাহিরে আশ্রয় দিবার কেহ নাই বলিয়াই তো এবং বাহির হইবার সাহস নাই বলিয়াই ঘরে শত নির্য্যাতন সহিয়াও কেহ বাহির হয় না, কেহ বা আত্মহত্যা করিয়া পালায়। কিন্তু··· -র সে সাহস তো ছিল। এখন মানুষ হইলে সব দুঃখ ঘুচিবে। তাহার কর্ত্তব্য হইবে তোমাদের জীবনে জীবন মিলাইয়া চলা এবং পুরুষোত্তম শাস্ত্রগুলিকে আয়ত্ত করিবার জন্য প্রাণপণ করা। ঘর-ছাড়াদের ঐ শাস্ত্র ছাড়া গতি নাই। ঘর ছাড়াদের শাস্ত্র তো ভাগবত শাস্ত্র। তোমরা ঘর ছাড়িয়াই তো পুরুষোত্তমের শাস্ত্র পাইয়াছ। ···ঘর ছাড়িয়াছে; অথচ যদি আঁকড়াইয়া থাকে ঘরের শাস্ত্র, দুই কুল যাইবে—না ঘরকা না ঘাটকা। ···সব ব্যাপারটাকে তোমরাই মীমাংসা করিয়া লও। সৃষ্টিরই তো আনন্দ। গড়িয়া

তুলিবার জন্য সব সময়ের জন্য যে সস্নেহ, সতর্ক দৃষ্টি অর্পিতা-সঙ্ঘের প্রতি থাকা প্রয়োজন তাহার যেন কোন রূপ ত্রুটি হয় না। এখনই অর্পিতা সঙ্ঘের টানাটানি করিয়া সভ্য করার কি প্রয়োজন আছে? সহজ ভাবেই হইবে, শুধু লক্ষ্য করিয়া চল ভিতর হইতে স্বাভাবিক ভাবে কিছু গড়িয়া উঠে কিনা। তোমার মাকে এখন সভানেত্রী করার কোনই অর্থ হয় না, উনি তো এখনই কোনও কাজে তোমাদের লাগিতেছেন না। যখন সত্য সত্যই কাজ সুরু হইবে, তখন তাহাকে তো সামনে দাঁড়াইতেই হইবে। যাহারা ক্ষেত্রে কাজ করে তাহাদের হাতেই সঙ্ঘ থাকুক, তাহাদের রক্তেই উহা পুষ্ট হউক, যে পর্য্যন্ত অর্পিতা সঙ্ঘের নিজস্ব অর্থ-বল না হয়। সেজন্য বাহিরের কোন সভ্যের নিকট চাঁদা নেওয়া ভাল নয়। নরনারায়ণ আশ্রমের জন্য মুষ্টি ভিক্ষা করিতেছিলে, যে দিত নিতে, যে দিত না নিতে না। বেশ এই পর্য্যন্ত। পয়সা চারিটী বটে, কিন্তু উহার দায়িত্ব অনেক, কৈফিয়তও অনন্ত। ছোটর মধ্যে কি অনন্ত নাই? দুনিয়ার দৃষ্টিতে অর্পিতা সঙ্ঘের কোনও অস্তিত্ব নাই, তোমাদের কয়েকটী প্রাণের ভিতর দিয়া তাহার জন্ম, যেখানে জন্ম সেখানেই উহার স্থিতি। তোমরা ঠিক ঠিক মত না চলিলে তোমাদের বুকেই উহার মরণ হইবে, তবে ভগবান করুন এমন মরণ যেন না হয়, এমন দুর্ভাগ্য যেন তোমাদের না হয়। অর্পিতা

সঙ্ঘ দিন দিন তোমাদের রক্ত মাংসে পুষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হউক, বাংলার মুখ্য প্রয়োজন দেখাইয়া দিক, এবং তাহার কর্ম্মপন্থা পরিস্ফুট করিয়া তুলুক। নারীর বৈশিষ্ট্য রক্ষার উপর কোনও নারী-আন্দোলনই এ পর্য্যন্ত হইতেছে না। সব নারী-আন্দোলনই শুধু পুরুষদের অনুবর্ত্তন করিয়া। তোমাদের সঙ্ঘ ছোট, অতি ছোট; সে জন্য দুঃখ করিও না, কিছুদিন ছোটই থাক, জোর করিয়া বড় হওয়াটা স্বাভাবিক না হইলে তাহাতে বিপদ আসে, ক্রমে ক্রমে শক্ত হও। ঐ ছোট সঙ্ঘটীর মাঝে রহিয়াছে অনন্তের সাধনা। দেখিবে দিন রাত খাটিলেও ঐ সঙ্ঘের সেবা পূর্ণ হইবে না, অথচ ছোট ক্ষেত্রে ছাত্রদের শিক্ষা পাওয়ার সুবিধা। তোমরা শুধু সেবোন্মুখ (সেবা উন্মুখ) হইয়া থাক, সভ্য হইবে; করা ও হওয়ার পার্থক্য বুঝিতে চেষ্টা করিও। গীতার অবধূত ভাষ্যের কর্ম্ম কর্ত্তৃবাচ্যের কথাগুলি ভাল করিয়া পড়িও।

অর্পিতা সঙ্ঘের বেণী কেহ নাই তোমরা ছাড়া। তোমাদের একজনেরও দৃষ্টি একটুকুও শিথিল হইলে উহা বাঁচিবে না। কিন্তু অন্য সব প্রতিষ্ঠান তো তাহা নয়,—উহারা নিখিল ভারতীয়, নিখিল বঙ্গীয়, তোমরা না হইলেও উহাদের চলিবার বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না, কিন্তু অর্পিতা সঙ্ঘ কি বাঁচিবে? কংগ্রেস হিন্দুসভা আজ নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। উহাতে যুক্ত করিবার মত

ধন বল, লোক বল ও আদর্শ উহাদের আছে। কিন্তু তোমাদের আছে শুধু আদর্শ, ধনও নাই, জনও নাই। কংগ্রেস বা হিন্দুসভার সহিত যুক্ততায় যে তোমাদের সঙ্ঘের লাভ হইবে, তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। তাহারা যে বড়, তোমরা যে ছোট। তোমরা যদি নিজের অন্তরের শক্তি নিয়া বড় হইতে, তখন বৃহতের সঙ্গে তোমরাও বৃহৎ হইতে পারিতে, তাহাকেও সাহায্য করিতে পারিতে। আদর্শগত সমজাতীয়ত্ব কি কোনও প্রতিষ্ঠানের সহিত তোমাদের প্রতিষ্ঠানের খুব বেশী আছে? তোমরাও বিশেষ কোনও সাহায্য করিতে পারিবে না, নিজেদেরটাও হইবে না। তোমাদের শক্তিই বা বর্ত্তমানে কতটুকু, সময় কই? ··দিনরাত খাটিয়া সে সব দিক সামাল দিতে পারিতেছ না।···র ভারই তোমাদের পক্ষে কম ভার নাকি। কাজেই অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তার দায়িত্ব লওয়া কোনও দিক হইতেই যুক্তিযুক্ত হইবে না। তোমাদের যে নিজেদের জন্যই দিনরাত খাটা দরকার? সব জিনিষটাকে বুঝিয়া লওয়াই যে সব চেয়ে বড় কাজ। রাস্তায় নামিয়া রাস্তার প্রশ্ন লইয়া কথা কাটাকাটি করা চলিবে না। বুঝিয়া স্তুজিয়া সব লও— কি পথ, পথ চলিবার কৌশল কি? এ পথের পরিণামই বা কোথায়? অন্য পথের সঙ্গে এ পথের সাদৃশ্যই বা কতখানি, পার্থক্যই বা কতখানি। সব আজ স্পষ্ট

জানিয়া লওয়া উচিত।···পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কৃপা যখন সারা জীবন পাইয়া আসিয়াছ, এইবার তাহাকে সফল কর, সার্থক কর। তোমাদের জীবনধারা ও কর্ম্মপন্থাকে অব্যাহত রাখিয়া যতখানি যাহার পার সাহায্য করিতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।···তোমাদের প্রাণ যখন আমি পাইয়াছি, তখন আমার ভয় নাই। অন্ধকারের পথে প্রাণই পথ-নির্দ্দেশক। যেখানে মন ও বাক্যের কোনও স্থান নাই, সেই অবিজ্ঞাত রাজ্যে প্রাণ ছাড়া বান্ধব নাই। তাই জগতের সব পুরুষোত্তমেরাই প্রাণ-সর্ব্বস্ব নারী-শক্তির অনুগ্রহে সার্থক হইয়াছেন। আমি যেন তোমাদিগকে পাই, ইহাই আমার সারা জীবনের ধ্যান জ্ঞান। নারী-শক্তিই শক্তি, অনন্ত কর্ম্মে প্রেরণা যোগায় নারী, সেই নারী-শক্তির সম্মান দানই পুরুষোত্তমের জীবন ব্রত, কবে তোমাদিগকে বিশ্বের সামনে রাজরাজেশ্বরীরূপে দাঁড় করাইয়া চোখের সাধ মিটাইব? অর্পিতাকে পাইয়াছিলাম, সে চলিয়া গিয়াছে, তোমরা আমার নয়নের এই সাধ মিটাইয়া দিও। তোমাদের চরণ-তলে যেদিন বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ পাশওয়ালারা বেদান্ত বুঝিতে আসিবে, সে দিন তোমাদিগকে ভালবাসা আমার সার্থক। আমার লেখাগুলি পড়িয়া পড়িয়া মুখস্থ কর।

নারায়ণ শব্দের অর্থ জান? 'নার' যাহার অয়ণ কিম্বা নারের অয়ণ যিনি, তিনিই নারায়ণ। 'নার' শব্দের অর্থ

'নরসমূহ' এবং 'অয়ণ' শব্দের অর্থ গতি। তাহা হইলে নারায়ণ শব্দের অর্থ নরসমূহই যাহার গতি এবং নরসমূহের গতি যিনি তিনিই নারায়ণ। এমন নারায়ণ না পাইলে লক্ষ্মীর সার্থকতা কি? আজ নারায়ণের গতি নরসমূহ, এবং নরসমূহেরও গতি নারায়ণ। তাই নর-নারায়ণই বিশ্বের সর্ব্বশেষ মীমাংসা। ...কাজ করিতে হইলে যে কত বড় বিরাট প্রাণ, কতখানি অফুরন্ত ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা এবং সঙ্গে সঙ্গে কত অর্থ সম্বল চাই, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিও। তজ্জন্যই তো প্রস্তুত হইতে বলি। অর্থ যদিও বা আসে, মন প্রাণের অবস্থা যদি কর্ম্ম করার অনুকূলে না হয়, কাজ কি হইবে? ছোট এখন ছোটই থাক্। ক্রমে ক্রমে বড় হইতেছে, হইবে। পুরুষোত্তম-জীবনের শ্রবণ কীর্ত্তন মননের ভিতর দিয়া রস সংগ্রহ কর। "আসা পথ চাহি জীবন গোঁয়ানু।" ফাঁকি দিয়া চালাকি করিয়া কোন বড় কাজ হইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন। যে যুগ আসিতেছে, সেখানে চলিবে প্রাণ-সাধনা। ...পুরুষোত্তমানন্দ"। এই বিরাট হৈচৈ-এর যুগে পুরুষোত্তমানন্দ কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া, কোন্ ছন্দে, কোন্ কৌশলে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই চিঠিখানির ভিতর তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া তুলিয়া দিলাম।

১৩৪৬ সনের কথা—তিনি বক্তৃতা দিতে বাহির হইয়াছেন সঙ্গে মেজপুত্র নিত্যব্রত। বরিশাল হেমন্ত কুমার দাশগুপ্তের

বাড়ীতে ছিলেন, হেমন্তবাবু স্বামিজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। হেমন্তবাবুর স্ত্রী নলিনী বালা স্বামিজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, উভয়ে মিলিয়া স্বামীজির অনেক সেবা তাঁহারা করিয়াছেন। সেখান হইতে নিজ বাড়ী কাকরধা যান, সেখানে পৈতৃক ভিটায় যে ঘর ছিল তাহা জীর্ণ হইয়া পড়িয়া যাওয়ায় সেই ভিটায় ঘর তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। সেই সময় আমাকে একখানা পত্র দিয়াছিলেন তাহা এই—

"নারায়ণেষু   পোঃ গ্রাম কাকরধা

জেলা বাখরগঞ্জ—১৭ই জৈষ্ঠ—১৩৪৬

তোমার পত্র পাইলাম। পুরুষোত্তম জীবনের এক প্রান্তে বসিয়া। গত পরশ্ব যখন ঘরের খুঁটি প্রোথিত হইয়াছিল, তখন প্রার্থনা করিয়াছিলাম। প্রার্থনার শেষে গ্রামের ছেলেপুলে ও বৃদ্ধদের সাথে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি সহকারে খুঁটি পোতা হইল। তখন তোমরা ছিলে আমার চতুর্দ্দিকে। আমার মা, তোমাদের যিনি মা, তাঁহাদেরই তো ঘরের পত্তন। তোমরা ছিলে ভিত্তি পত্তনের সহায়ক। যে দিন তোমাদিগকে সহ তোমাদের মাকে আনিয়া এখানে পত্তন করিতে পারিব, সে দিন বুঝি সার্থক হইবে আমার ঘরের ভিত্তি পত্তন করা। 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'। গৃহিণীই গৃহ। পুরুষোত্তম-গৃহের গৃহিণী তো তোমরা। যে খুঁটি-খানি প্রথমে পোঁতা হইয়াছে, তাহার গোড়ায় একটী ঘটের

ভিতর একখানি কাগজে যাহা লেখা আছে, তাহা পাঠাইলাম।

পুরুষোত্তম ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মহাতীর্থ কাকরধা
জিলা বাখরগঞ্জ

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
রাগদ্বেষ বিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চবন্।
আত্মবশ্যৈর্ব্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহম্ ত্বাম্ সর্ব্ব পাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
নরনারায়ণাশ্রমাধিপতয়ে নমঃ॥
শ্রীশ্রীনিত্যগোপালার্পণমস্তু।
শ্রীশ্রীমুক্তকেশী মীন বামনায় নমঃ॥ বন্দেমাতরম্
পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

আমার ‘কাকরধা’কে তোমরা তোমাদের জীবন দিয়া মহাতীর্থে গড়িয়া তুলিবে না? আমার কাকরধা তোমাদের সঙ্গলাভে লীলাক্ষেত্ররূপে ভবিষ্যৎ যুগের মহাতীর্থে গড়িয়া উঠিবে না! তোমরা যে তীর্থ গড়িবার শক্তি রাখ। দুনিয়াটাকে মহাতীর্থ গড়িতে হইবে। ...আমার গ্রামে আমার লোকদের খুব আনন্দ। ঘর হইতেছে দেখিয়া

তাহাদের ভরসা হইয়াছে যে আমি আবার গ্রামে আসিব। গ্রাম আজ কত বড় অসহায়! সৎ কথা নাই, আছে কেবল এক অন্যকে খোঁচাইয়া স্বার্থ সিদ্ধির প্রচেষ্টা। কবে যে বাঙ্গলার গ্রামগুলিকে তোমরা পুরুষোত্তমের ঘরকন্নার উপযোগী গুছাইয়া লইবে, বলিতে পার কি? আমি যে তোমাদিগকে বাঙ্গলার সকল পতিত গৃহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে দেখিতে চাই। সুধাকে তো আমি সেই রূপেই ভজনা করিয়াছিলাম। তোমাদের শ্রীচরণতলে মরা বাঙ্গলা জীবন্ত বাঙ্গলায় গড়িয়া উঠুক; আমি দেখিব, আনন্দে নাচিব। তোমরা বিশ্বরূপিণী না হইলে তো আমি তোমাদের ছাড়িব না। তোমরা যে আমার ব্রহ্মময়ী। সারা বাঙ্গলাই তোমাদের দেহ ও গেহ। সারা বাঙ্গলার ঘর বাঁচাইবার দাবী আজ তোমাদের কাছে করিতেছি। আমার সবখানি জুড়িয়া তোমরা পরব্রহ্ম-মহিষী হইয়া থাক। আমি পুরুষোত্তম প্রতিষ্ঠান গড়িবই।"…

ভারতবর্ষের একজন সন্ন্যাসী বাড়ীর ভিটায় যাইয়া ঘর তোলে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ইহাই আমার এই ঘটনা লিখিবার উদ্দেশ্য। ঘর ছাড়িয়া ঘর তোলার শাস্ত্র, ছাড়িয়া রাখার শাস্ত্র এদেশে নাই, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ছাড়িয়া রাখা অর্থাৎ পরকীয় সম্পর্কের শাস্ত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু মানুষ তাহাকে জীবনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। আমাদের দেশের সন্ন্যাসীদের পূর্ব্বা-

শ্রমের নাম করাই নিষেধ, সেই দেশের সন্ন্যাসী হইয়া পুরুষোত্তমানন্দ সংসারের কোনো দায়িত্বকে অবহেলা না করিয়া পুরুষোত্তম বিশ্বে গড়িয়া তুলিবার জন্য এই পরকীয় চিন্তাধারা লইয়া প্রতিটা কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। এইজন্যই সকল কর্ম্ম তাঁহার ভগবৎ সেবায় গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন বন্ধনের ভয় তাঁহার ছিল না। প্রচলিত চিন্তাধারায় অভ্যস্ত মানুষ পুরুষোত্তমানন্দের জীবন বুঝিবে কেমন করিয়া? তিনি বলিতেন একদিন শুধু মূলা মূলা নামই জপ করিলাম, উহাও তো ব্রহ্মেরই নাম, এই জগতের নাম রূপ সবই যখন ব্রহ্মের, তখন মূলা নামে ডাকিলে হইবে না কেন? এই বাস্তব জগতের সকল ক্ষেত্রকে ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে দেখিয়া সেই তত্ত্বাস্বাদন তিনি করিয়া গিয়াছেন।

স্বামীজীর পরিচিত এক ভদ্রলোকের এক বিবাহিতা কন্যা স্বামীগৃহ হইতে পলাইয়া পূর্ব্বের ভালবাসার এক যুবককে লইয়া কলিকাতা চলিয়া আসে। তাহার কলিকাতাবাসী আত্মীয়গণ মেয়েটাকে খুঁজিয়া বাহির করে কিন্তু কে তাহাকে রক্ষা করিবে? কাহার নিকট রাখিবে? পুরুষোত্তমানন্দ তাহাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া আসেন এবং কয়েক মাস নিজের নিকট রাখিয়া তাহার বিভ্রান্ত চিত্তকে স্নেহের স্পর্শ দিয়া শান্ত করিয়া তাহার পিতা ও শ্বশুরের সহিত পত্রালাপ করিয়া তাহাদের মেয়েকে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি মানুষকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে,

বিশেষ করিয়া মেয়েদিগকে রক্ষা করিতে, তাহাদিগকে গৌরব-ময় স্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া নিজের জীবনে ঝঞ্ঝাটকে, অনেক অপমানকে অনায়াসেই বরণ করিয়া লইয়াছেন। এই ঘটনাকে সামাল দিতে তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা তাঁহাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনাকে সামঞ্জস্যের দিকে আনিতে তিনি যে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তাহা সমাজের কল্যাণে লাগিবে বলিয়া কয়েকখানি পত্র এখানে তুলিয়া দিলাম।

নর নারায়ণ আশ্রম

(১) ২৪।২এ সাহানগর রোড, কালীঘাট, কলিকাতা

২৬শে অগ্রহায়ণ—২১

নারায়ণেষু

শ্রীভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। একটা সমাজ বিপ্লবের মাঝে দীর্ঘ দিনের পর দেখা সাক্ষাতের সুযোগ পাইয়া শ্রীভগবানের কাছে মস্তক অবনত করিতেছি। সেবার ঢাকা গিয়া কতই না মিলনের সুখ উপভোগ করিয়াছিলাম! সে আজ অনেক দিনের কথা। তুমি আমার উজ্জ্বলভারত পত্রিকার গ্রাহকও ছিলে। যাক্ সে অতীত। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তুমি যে পথ শ্রীমান ···র কাছে বাতলাইতেছ তাহা সুনীতি নয় বলিয়া সর্ব্বশেষ চরম মীমাংসা দিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। তোমার সব চিঠিগুলিই আমি শুনিয়াছি। তুমি ধীর, অমায়িক, বিবেচক। তোমার

বুঝিতে দেরী হইবে না যে ব্যাপার হঠাৎ ধরা পড়ায় ইহা তেমন জমিয়া উঠিতে পারে নাই। যদি ··· যুবকবৃন্দ আপ্রাণ চেষ্টা না করিত, তবে এত দিনে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড সৃষ্টি করিত। যাহারা এই ব্যাপারে অগ্রণী তাহাদের মধ্যে ··· গণ। তাহারা যে সৎ সাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় এ ক্ষেত্রে দিয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা আনন্দিত ও গৌরবান্বিত। শনিবার রাত্রে যে তৎপরতার সহিত অতি অল্প সময়ে ··· কে সেই দুষ্টটার কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল তাহাতে সকলেই আমরা অবাক হইয়াছি। অথচ ঢাকা হইতে পলাইবার কোন খবর তোমরা তখন তখনই এখানে দাও নাই। তোমরা তো···নিকট একটা টেলিফোন করিতে পারিতে। তাহা হইলে তো ষ্টেশনেই ধরা পড়িত। উহারা যে তথা হইতে ঢাকা মেলে আসিবে আর ইহা যে তোমাদের অনুমানে আসিয়াছে তাহা তোমার চিঠিতেই জানিতে পারিয়াছি। যে ক্ষিপ্রকারিতা, সৎসাহসিকতার পরিচয় ইহারা দিয়াছে তজ্জন্য আমাদের সকলেরই ইহারা কৃতজ্ঞতার পাত্র। ভগবান ইহাদের মঙ্গল করুন।

আজ যে তোমরা মিলনের কথা ভাবিতে পারিতেছ সে সুযোগ ইহারাই দিয়াছে শুধু। একদল সমাজের পুঁজ রক্ত ঘাটিয়া নিজেদের সুযোগ সুবিধা করিবার জন্যই ব্যস্ত। তাহারা এত বড় ব্যাপারটাকে এত সহজে মীমাংসিত হইতে দিতে রাজী নয়। এরূপ একদল যে আজও বর্ত্তমান তাহা

তোমার নিশ্চয়ই অজানা নয়। হঠাৎ ধরা পড়িয়া আমার কাছে আছে। একটা জানা শোনা পরিবারের মধ্যে স্থান পাইয়াছে ইহাতে ব্যাপারের জৌলস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি উহাকে স্থান দিতে বাধ্য। সেদিন যদি আমি স্থান না দিতাম ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়াইত, তাহা কি কল্পনা করিতে পার? রাত্রি প্রায় ১২টায় অন্যের বাড়ীর ফোনের মারফতে আমাকে ঘুম হইতে তুলিয়া ২ মাইল রাস্তা রাত্রিতে দৌড়া-দৌড়ি করাইয়া তবে আমার কাছে ইহারা সকলে মিলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। সে কি দুশ্চিন্তা ও দুর্ভোগ! ধরিয়াছেও ইহারা, আনিয়াছেও ইহারা, আনুষ্ঠানিক টাকাকড়িও যোগাইয়াছে ইহারা। আমি রক্ষা করিতেছি, পাহারা দিতেছি মাত্র। আমাদের···র উপর কোন অধিকার নাই। আমি···হিসাবেই ইহা করি নাই। ভগবত্যার দিক হইতে, মানবিকতার দিক হইতে, সমাজের দিক হইতেই আমি ইহা করিয়াছি। সন্ন্যাসী হিসাবে আমি···কাহারও নই।···সাধ্য নাই, সাহস নাই যে সে আমার আশ্রমের আঙ্গিনায় পা দেয়। আমি তোমাদের সকলের মুখ যাহাতে ম্লান না হয় তাহার পথ ভগবানের আশীর্ব্বাদী পথে করিতে চাহিয়াছি।··· পাঠান খুব সহজ ছিল। শ্রীযুক্ত···ঘোষ সমাজের ভয়ে এখানে রাখিয়া গিয়াছে মনে করা সত্যের উপর বলাৎকার করা মাত্র। সে তো সমাজ-ব্যবস্থা মানিয়াই চলিতেছে। সমাজ তাহাকে সাহায্যই করিবে। ঘটনাটীকে distorted

করিয়া দেখিতে দিও না। সন্তান যতই অপরাধী হউক পিতা মাতা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সে রাখিয়া গিয়াছে এমন একস্থানে এমন একজনের কাছে, যাহার চেয়ে সে নিজেকেও যোগ্য মনে করে না। আর তুমিই কি জান না···দাদা ও আমি কত বড় সুহৃদ্ এক সময়ে ছিলাম? আমার বাড়ীতেই বা তিনি কত ছিলেন, তাঁহার বাড়ীতেই আমি কত ছিলাম! দুর্ভাগ্য তাঁহার, দুর্ভাগ্য আমার যে দীর্ঘ দিন ছাড়াছাড়ি। হয়ত বা আমার সঙ্গে যোগ রাখিলে এ দুর্ঘটনা নাও হইতে পারিত!···কি আমার কাছে আসে? আমার জীবন ও আদর্শকে তাহারা ভয়ের চক্ষে দেখে। দুই বৎসর আশ্রম স্থাপন করিয়াছি···এক বৎসর পূর্ব্বে মিনিট পনর আমার আশ্রমে আসিয়াছিল। তথাপি···আমার কাছে রেহাই পাইবে না। তাহার শাস্তি বিধানের বন্দোবস্তও করিতেছি। আমি আজ কারও নই। একমাত্র শ্রীভগবানের শ্রীচরণাশ্রিত বলিয়াই ভাসিয়া চলিয়াছিল যে···তাহাকে কূলে টানিয়া তুলিয়াছি। পুরুষোত্তমের সেবা-বুদ্ধিতেই ইহা আমি করিয়াছি।

তুমি reconciliation-এর যে পথের উপর জোর দিতেছ তাহা গোঁজামিল, ধামা চাপা মাত্র, patch work, তাহাতে কি কোনও স্থায়ী ফল মিলিতে পারে?··· যে বিষাক্ত চিত্ত লইয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। চিত্তের বিষাক্ততাই সব গলদের মূল।

এই বাস্তব ঘটনার উপর দাঁড়াইয়াই বাস্তব মীমাংসার কথা ভাবিতে হইবে। অনায়াসেই······ঘোষের সঙ্গে ···কে দিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু···র বিষাক্ত হৃদয়ের বিষ কি তাহাতে দূর হইত? না পিতামাতার কৌশলহীন নির্ম্মম নিষ্ঠুর তাড়নায়······র চিত্ত আরও বিদ্রোহী হইত? Human psychology তুমি নিশ্চয়ই জান। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি—নিগ্রহ (repression) কি করিবে?···ঘোষ শোধন করিবার কৌশল সম্বন্ধে অজ্ঞ জানিয়াই নিয়া যায় নাই। এইরূপ রোগীর চিকিৎসার ভাব···ঘোষ নিতে সাহস পায় নাই। বিশেষতঃ···দেশ কাল পাত্র এ চিকিৎসার অনুকূল নহে। ঠাকুরের কৃপায় আমার বিশ্বাস যে আশ্রমের হাওয়া···র চিত্তকে অচিরাৎ নির্ম্মল করিবে। তাহার চিত্ত অনেকটা সুস্থ ইহার মধ্যেই হইয়াছে, সে স্ফূর্ত্তির সহিত ঠাকুর পূজাদি করে। চিত্ত বিকার দূর না করাইয়া কয়েক খানি forced চিঠি লিখাইয়া আর কিছু টাকা দিয়াই reconciliation হইতে পারে ভাবিতে আমরা শিহরিয়া উঠি। এতবড় একটা গুরুতর ব্যাপারের প্রায়শ্চিত্ত কি জোর করিয়া শেখানো কয়েকখানি চিঠি ও কতগুলি রৌপ্যমুদ্রা? ···র চিত্ত যদি বাস্তবিকই না শোধরায়, তাহাকে···বাবুর পরিবারে মধ্যে পাঠানোই কি সঙ্গত? তাহাকে কি দুই ফোঁটা চোখের জলে ভিজানো ২।৩ খানি চিঠির ভরসায় ঘরে তুলিয়া

নেওয়া যাইতে পারে, না দেওয়াই যাইতে পারে?…কে দিয়া ৩।৪ খানি চিঠি লিখাইয়া পাঠানো সহজ,‥ ঘোষকে দিয়া টাকা দেওয়ানও সহজ কিন্তু…কে কোন পরিবারের মধ্যে রাখা সহজ নয় যে পর্য্যন্ত না সে যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছে যে, সে বাস্তবিক অন্তরে অন্তরে অনুতপ্ত, বিশুদ্ধ। এত অল্পে সমাজকে সুখী করা যায় বলিয়াই না সমাজের এত অধঃপতন? …কে ঘরে নিতে না চাওয়ার মনোবৃত্তি বুঝা খুব কঠিন নয়।…র চিঠি আদালতের দলিলের মত কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ, শ্বশুর পুত্রবধূ সম্পর্কের মধ্যে ইহার কানাকড়ি মূল্যও নাই। ঐরূপ জোর করিয়া চিঠি লিখাইয়া লইয়া পাঠানোর প্রতারণা আমাদের দ্বারা হইবে না।…ঘোষ যদি পারেন, তোমরা যদি পার, সে পথ কেহ রোধ করে নাই, সে পথ খোলা। আমরা যতখানি পারিয়াছি সেবা করিয়াছি। তোমাদের মনঃপূত না হয়, যাহার সম্পত্তি সে লইতে পারে। আজ 'অধিকারের' প্রশ্ন উঠিয়াছে। যেদিন সে রাস্তায় নামিয়াছিল সেদিন কাহার অধিকারে সে ছিল? যেদিন…যুবকবৃন্দ বিপদ মাথা পাতিয়া উদ্ধার করিয়াছিল, সেদিন অধিকারীরা কেহ ছিল না। যত বিনিদ্র রজনী‥কে পাহারা দিতে কাটাইয়াছি পাছে ঐ দুষ্ট ছেলেটা আসিয়া উঁকি না দেয় এবং…কে প্রলুব্ধ না করে, সেদিন অধিকারীরা কোথায় ছিল? আজ বিপদ অনেক কাটিয়াছে, মুখে চুনকালী ভাল করিয়া লাগে

নাই বলিয়াই তো অধিকার রক্ষার পথ দেখা যাইতেছে। অধিকার, দরদের প্রশ্ন তুলিয়া রাখ। বাস্তবের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া মীমাংসার পথ দেখ।·· যে সব ভদ্রলোক খুব সমাজের কল্যাণ ভাবিয়া অস্থির হইয়াছেন তাহারা এতদিন কোথায় ছিলেন? আজ -বাবুকে দিয়া নিজের জাতি কুল নষ্ট না করাইতে পারিলে বুঝি আর সমাজ রক্ষা হইবে না! সমাজ রক্ষার এই অদ্ভুত পন্থা দেখিয়া আমি তো অবাক। ···তো শাস্তি পাইল,···ঘোষ খুব জব্দ হইল কিন্তু তাহাতে ···বাবুর কি কুল পবিত্র হইল? পত্রিকায় না তুলিয়া তোমরা ছাড়িবে না দেখিতেছি। ঘাটা-ঘাটির চরম করিয়া ছাড়িবার যোগাড় করিয়াছ। বিশেষতঃ ·· - বাবুর কাছ হইতে এমন কোন কি আশ্বাস পাইয়াছ যে এভাবে চলিলে তিনি···কে নিবেন? তাহা হইলে সেই পথই লইতাম। সে পথও যখন অনিশ্চিত তখনই নিশ্চিত উপায় অবলম্বন করিয়াই···কে এখানে রাখিয়াছি। আমার এখানে ব্যাপারটা অনেক হালকা হইয়াছে। যে কুকথা বহু লোকেই জানে, সে কথা এখনও পরস্পরের মধ্যে আলোচিত হইতেছে না স্থির জানিও। সকলেই স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে ব্যাপারটা কোথায় গড়ায়। সমাজ আজ দুষ্ট ব্রণে আক্রান্ত, তাহার মধ্যে ঠিক বুদ্ধি নিয়া খুব হুঁশ রাখিয়া কাজ করিবার মত তোমার বিচক্ষণতা আছে জানি। দৃঢ় হও; অত সহজে ২।৪ খানা চিঠির উপর দাঁড়াইয়া একটা

পরিবারকে অধিকতর বিপদে বিপন্ন করিও না।··· -কে উন্নতশীর্ষ করিয়া পাঠাইতে হইবে, যোগ্য করিয়া পাঠাইতে হইবে, সে পথ হয়ত বা ভগবৎ কৃপায় খুব অসম্ভব নয়। তোমরা যে ঠুন্‌কো প্রচার করিয়া রাখিয়াছ যে···তাহার পিতার অসুখে তাহার পিতার বাড়ী গিয়াছে, তাহা কি···-র লোকেরা বিশ্বাস করিয়াছেন? এত সহজ মিথ্যায় এতবড় ঘটনাকে চাপা দেওয়ার বৃথা চেষ্টা। ব্যাপারটাকে চাপা দিতে চাহিও না, পারিবে না। মীমাংসা করিতে হইবে পাকা ভিত্তির উপর। সময় সুযোগ মত··· -র কাছ হইতে চিঠিপত্র···তাহার শ্বশুর শাশুড়ী নিশ্চয়ই পাইবেন। টাকাও দরকার হইলে···ঘোষকে দিয়া দেওয়ান খুব কঠিন হইবে না। চাই সর্ব্বাগ্রে···র চিত্তের বিশুদ্ধতা।···কে বিশুদ্ধ করিবার ভার লইবে? জানি তাহা অতি দুরূহ—ভগবানের দিকে চাহিয়া লইয়াছি। ভরসা তোমরা ও শ্রীহরি। তোমরা যদি অত সহজে···বল, তবে উপায় নাই। এতবড় গুরুতর ব্যাপার, যাহার ফলে একটা সমাজ বিপন্ন, তাহার দোষ কি এত অল্প? সমাজ সেবা কি এতই সহজ? হয়রান হইলে চলিবে না।···র উপর অধিকার···র শ্বশুরের সর্ব্বাগ্রে জানি। আমি নিজে···র কাছে এক রেজেষ্টারী চিঠি দিয়াছি। যে চিঠি শ্রীযুক্ত·········বাবু·········দিয়া রাখিয়াছেন আমার নিকট তাহা আছে। সে চিঠিও তোমার অবগতির জন্য পাঠাইলাম। উহার কোন জবাব কি···

কিম্বা তাহার পিতা দেন নাই। অধিকার তো তাহাদেরই বটে কিন্তু অধিকার রক্ষার চেষ্টা তো এই নয়। অধিকার রক্ষা যদি টাকায় হয়, আমার বলিবার কিছু নাই। টাকা দেওয়া হইবে না তাহাও বলা হইতেছে না। পুত্র বধূর খোঁজ পাওয়ার পর শ্বশুর পক্ষীয় কাহারও একখানি চিঠিও উদ্ধার-কারীদের মধ্যে কাহারও নিকট লিখিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে শোভন হইত। এ কাজ তো তাহারই করণীয় ছিল, তাহারই করণীয় কাজ আমরা করিয়াছি। যদি পার তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিও। মিথ্যা পথে ভাবাইয়া লাভ নাই। ···বাবু বরং আসিয়া অনায়াসে তাঁহার হারানো জিনিষ নিতে পারেন। কেউ আটকাইয়া রাখে নাই। কিন্তু তিনি কি বোঝেন? তিনি কি চান? তাহাই তো জানিবার জন্য চিঠি লেখা হইয়াছিল। কোন উত্তর দেন নাই। তথাপি তাঁহার হাতে পায়ে ধরিতে কসুর হইবে না। আমরা দল বাঁধিয়া···কে লইয়া, প্রয়োজন হয় টাকা কড়ি সহ, তোমার বাসায় যাইব, তোমাকে লইয়া···বাবুর হাতে পায়ে ধরিব। বাধা কি? একটা সমাজকে বাঁচাইবার জন্য এ দৈন্য আমরা মাথা পাতিয়া লইতে রাজী আছি। যে সমাজে মার্জ্জনার স্থান নাই, যে সমাজে ধুইয়া পুঁছিয়া কোলে তুলিয়া লইবার কোন ব্যবস্থা নাই, আছে শুধু বর্জ্জন, তেমন পচা গলা সমাজ বর্ত্তমানে চূর্ণ হইবেই হইবে। আমরা চাই তাজা জীবন্ত নীলকণ্ঠ সমাজ। যে সমাজ বিষ হজম করিতে পারে

না, সে সমাজ মৃত। ...সমাজশুদ্ধ সংস্কার করিতে হইবে। ...জ্ঞানকেই ভাগবত চরম প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন। - কেন এ অপরাধ করিল, এ অপরাধের মূল কারণ কোথায়? এই অপরাধের সঙ্গে সমাজ শরীরের কতখানি নিগূঢ় সম্বন্ধ, সেই সঙ্গে তাহার প্রতীকার কোথায় ইত্যাদি সমস্যার সমাধান না করিয়া উপর দিয়া গোবর লেপ দিলে ঘা ভিতর হইতে ভরিয়া উঠিবে না নিশ্চিত। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে চাই... - র হৃদয়ের বিশুদ্ধিতা ও স্বচ্ছতা এবং শ্বশুরের কাছ হইতে প্রাণখোলা স্বীকৃতি। যত দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ...কে তাহার শ্বশুর গৃহে পাঠাইবার চেষ্টা করিব কিন্তু অতি তাড়াতাড়িতে ঘা বাহ্যতঃ সারিতে পারে কিন্তু ভিতর হইতে ভরিয়া উঠে না।

তোমাকে আসিবার জন্য লেখা হইয়াছে। তোমরা আসিতে পারিবে না; দায়ে কি একা এই কলিকাতার ছেলে-গুলি ঠেকিয়াছে? দায় অবশ্য আজ ইহাদেরই! - বাবু যেন ভুল করিয়া নিজের মুখে অধিকতর চুণকালী না মাখেন। কালী প্রক্ষালিত করা যাইবে স্থির জানিও। যে আশীর্ব্বাদ ঠাকুরের কাছ হইতে পাইতেছি, তাহার ভিতরে কাহারও মুখ ম্লান হইবে না।...ঘোষের কন্যা পরিত্যাগের কোন প্রয়োজনও নাই জানিবে। শরৎ ঘোষ তাহার সঙ্গে আছে, ও থাকিবে। কাহারও কোন টুঁ শব্দ করা চলিবে না। দেখিতেছ না সবাই এই ব্যাপারে অগ্রণী হইয়া কাজ

করিয়াছে। আজ নূতন করিয়া সমাজ গড়িবার দিন। অবশ্য কালেরই প্রভাবে এই ঘটনাটি হইয়াছে। সমাজ যথেষ্ট ভাঙ্গিয়াছে, এখন নূতন আলো দিয়া, আদর্শ দিয়া গড়িতে হইবে।

লিখিয়াছ "শরৎ ঘোষ গোলে পড়িতে পারে"—শরৎ ঘোষ গোলে পড়িয়াই আছে, বেশী আর কি সে পড়িবে? রাজনৈতিক গোলে পড়িয়া পড়িয়া এখন অনেকটা ঝানু হইয়াছি। সব গোল কাটাইয়া তিনিই তো কোলে করিয়া রাখিতেছেন। অন্ধকারের বুক চিরিয়া চলিয়াছি, কোন বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ধরে নাই। যিনি আলো হাতে লইয়া সামনে চালাইয়া লইতেছেন তিনিই শরৎ ঘোষের একমাত্র সম্বল। দুঃখ বরণ করিয়া লইয়াছি, দুঃখের জন্য ভয় কি? শ্রীগুরুদেব শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন, "ভয় কি? টেনে তুলব"। তোমাদের মুখ বাঁচাইবার জন্য যদি শরৎ ঘোষ গোলে পড়ে উহা তোমাদের কাছ হইতে পাওয়া আদর বলিয়া বরণ করিয়া লইবার মত সাহস ঠাকুর দিয়াছেন।

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

(২)

নরনারায়ণ আশ্রম
২৪।২এ, সাহা নগর রোড
কালীঘাট কলিকাতা

নারায়ণেষু

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার ও আমার চিন্তাধারা

বোধ হয় আলাদা। অবশ্য তুমি যে স্তরে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটীকে দেখিতেছ, বর্ত্তমান সমাজ ঐ চক্ষেই দেখিতে অভ্যস্ত। ঐভাবে ফল সমাজের উপর ভাল হয় নাই। সমাজ সর্ব্বতোভাবে rotten। ভুলেরও যে একটা সার্থকতা থাকিতে পারে তাহা সমাজ এতদিন বোঝে নাই। ভুলকে ভুল মনে করিয়াই সমাজ তাহা হইতে দূরে থাকিতে চাহিয়াছে; অথচ ভুল মানুষ করিয়াছে, অনন্ত কাল করিবেও। ভুল করা লোকগুলিকে বাদ দিয়া ভুল করাটাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মানুষ অহঃরহ ভুলই করিতেছে। পুরুষোত্তম plane-এ ভুলেরও একটা অর্থ আছে। যখন মানুষ ভুল করিয়াও দেখিতে পায় যে তাহার জীবন সার্থক হইবার পথে আট্‌কাইয়া যায় নাই, তখন ভুলের জন্য কোন দাগ আর তাহার জীবনে থাকে না। ভুলও পুরুষোত্তমে সার্থক। যাহারা শুদ্ধ থাকিবার অভিমানে মত্ত, জগতে হাজার হাজার দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে ভুল করা মানুষেরা ঐ শুদ্ধদের পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া গিয়াছে। ভুলকে শাসন করিতে গিয়া ভুলকারী, শাসক ও ভুল সবই জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। এই শাসনের পথে বর্ত্তমান সমাজে মেয়েরাই শাস্তি পাইতেছে সর্ব্বত্র। তোমাদের সমাজে ভুল না করিয়াই কি মেয়েরা পুরুষদের হাতে রেহাই পাইয়াছে? ব্রাহ্মণ কুলীনের ঘরে হাজার হাজার মেয়ে স্বামী-পরিত্যক্তা। কেন তাহার কি কোন জবাব দিবে? এ কাহার ভুল?

পুরুষের ভুলে সমাজ আঁৎকাইয়া উঠে না, সব ক্ষমার্হ।... আজ মেয়েদের ভুলের জন্যও তাহাদের জীবন আটকাইবে না নিশ্চয়ই। আজ তাহারা পথ পাইবে। কিন্তু যাহারা নির্ম্মম ভাবে এই ভুলের শাস্তি বিধান করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিবে তাহারা পুরুষোত্তমের বিচারে ক্ষমার পাত্র নহে। আমি চাহিয়াছিলাম মেয়েটীকে তাহার পরিবারের মান-যশ, পারিবারিক সম্বন্ধকে সকল দিক দিয়া মধুর করিয়া দিতে। আমার নির্দ্দেশ মত চলিলে আমি দেখাইয়া দিতে পারিতাম মেয়েটির কিম্বা তাহার পরিবারের উপর এই ঘটনার জন্য যে "দাগ" পড়িয়াছে তাহা সর্ব্বতোভাবে মুছিয়া গিয়াছে। ভগবান জগতের সব দাগী জীবনকে দাগ শূন্য অক্ষত করিতেই জগতে অবতীর্ণ। তাঁহার কৃপায় আমারও সে সাহস আছে। হয়তঃ বলিবে স্বামী কেন এ দাগ মানিয়া লইবে? ত্যাগ করিলেই তো সব ল্যাঠা চুকিয়া যায়। ত্যাগ করা পুরুষদের পক্ষে সহজ বটে। কিন্তু তাহাতে স্বামী কি অন্তরের দাহ শান্ত করিতে পারিবে? সে তো ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া পাণি গ্রহণ করিয়াছিল? তাহা কি এত সহজেই ত্যাগ করা যায়? এ কি ছেলে খেলা? আমি তাহাকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলাম। সারা জীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে। সমাজ তাহার শাস্তির জন্য কোনও ব্যবস্থা করিবে না জানিও। তাহার পরিবারের যে কলঙ্ক হইয়া বসিয়াছে, তাহা যেমন তেমনটা থাকিবে। স্ত্রীকে না

পাইয়া যে বিষম বেদনা তাহার হৃদয়কে আঘাত করিবে তাহা বর্ত্তমানে একটা উত্তেজনার বসে না বুঝিলেও ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিবে। তাহার পরিবারস্থ, সমাজস্থ সকলে হয়ত তাহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া সংসার করিবার উপদেশ দিবে, দিয়াছেও শুনিয়াছি। তাহাতেও প্রাণের জ্বালা জুড়াইবেনা স্থির জানিও। তাহার জীবন ব্যর্থ হইবে। সামান্য একটা আঘাতে এমন করিয়া একটা পরিবারের সুখ শান্তি নষ্ট হয় ইহা ভাবিতে আমি শিহরিয়া উঠি। পথ ছিল। তবে কে পথ চায়? মেয়েটির পথ হইবে। সে হয়ত ঠাকুরের কৃপায় জীবনের ভুলকে ঠাকুরের শ্রীহস্ত স্পর্শে পবিত্র করিয়া লইতে পারিবে। তাহার জীবন অনাবিল চলিবে। যে ধিক্কার তাহার আত্মীয় স্বজন দিতেছে, তাহার অতি দূরে সে বর্ত্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে।...সমাজে তাহার স্থান হইয়াছে। আমার পরিবারে সে যখন স্থান পাইয়াছে, কাহারও সাধ্য নাই যে তাহাকে ত্যাগ করে। বাঙ্গলার কথা বলিতে পার, আমি বাঙ্গলার সামাজিক জীবনেও তাহাকে স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। সে গৌরব তাহার স্বামীরই ছিল। পুরুষ-নিরপেক্ষও যে নারী-জীবন আছে তাহা এতদিন পুরুষেরা নারীদের শুনায় নাই। তাই পুরুষের অনাদরে লক্ষ লক্ষ নারী বর্ত্তমান সমাজে আত্মঘাত করিয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত কি বিরল? স্বামীর অনাদর স্বামীর পরিবারের অনাদর পাইয়াও মেয়েটীর জীবন

ব্যর্থ যাহাতে না হয়. তাহার চেষ্টা করিব। চেষ্টা করিব যাহাতে স্বামীর পরিবারের মধ্যেই পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারে। কিন্তু উহারা যদি stubborn হন মেয়েটী একাই ভগবানের পথে চলিবে। অনাদরে তাহাকে কোথাও পাঠান উচিত নয়। বর্ত্তমান সমাজ অপমানিত করিয়া, আত্মগৌরব নষ্ট করিয়া, চূণ কালী মাখাইয়া, নাকে খত দেওয়াইয়া, অপরাধের বোঝা কাঁধে চাপাইয়া দিয়া ঘরে রাখিয়া কৃপা করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছে। ইহাতে কি স্বামী-স্ত্রী জীবন, পরিবার জীবন, সমাজ জীবনের সুস্থতা শান্তি বাড়িবে ? না দিনে দিনে নষ্টই হয় ? আমি স্বামীর পরিবারের বর্ত্তমান মহা জটিল অবস্থায়ও পূর্ণ আত্মগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দাঁড়াইবার কথা ভাবিতেছিলাম। তুমি ধীর, সুবিবেচক, আদর্শবাদী। তুমি ব্যাপারটীকে তলাইয়া দেখিও। ...আমার আশ্রমে থাকিলেই বা অন্য লোকের সন্দেহ করিবার কি আছে ? দেরী কবিতে তো আমরাও নিষেধ করিতেছি। যে মনোবৃত্তি লইয়া তোমরা মেয়েটীকে ঢাকা পাঠানো অনুমোদন করিতে পার সে মনোবৃত্তি মেয়েটীর লাভ হইয়াছে। আমি তাহা নির্ভয়ে বলিতেছি, তাহার মনের সব খোঁজ আমি পাইয়াছি। তাহার স্বামী তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পাইত যাহা সে বিবাহের পরও বহু বুঝাইয়া সুঝাইয়া পায় নাই। মেয়েটী সরলভাবে একনিষ্ঠার সহিত ভুলকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়াছিল, তাহাকে এই ভুলের প্রতি একনিষ্ঠা হইতে

সরাইয়া আনিতে বেগ পাইতে হইয়াছে। এখন সে বিষমুক্ত নির্দ্দোষ। সে সরল, তাহাকে ভুল বোঝান হইয়াছিল, সে তাহার ভুল বুঝিয়াছে। সরল না হইলে অলঙ্কারগুলি লইয়া আসিতে অনায়াসেই পারিত। স্বামীর দেওয়া টাকা সে একটিও লইয়া আসে নাই। তাহার জীবনে সরলতা ছিল বলিয়াই ভুলের পথে ভগবান টানিয়াছেন। তাহার নেশা কাটিয়াছে। মেয়েটী চিঠি দিবার জন্য উন্মুখ। তাহার চিঠি নির্ম্মম ভাবে অনাদৃত হইবে না অন্ততঃ এতটুকু আশ্বাস যদি কেহ দিত তবে আমি তাহাকে চিঠি দিতে বলিতাম। অবশ্য একথা বলিতেছিনা যে মেয়েটীর চিঠি পাইবা মাত্র স্বামী কিম্বা তাহার পিতামাতা আহ্লাদে গদগদ হইয়া উঠুক। ভুলের জ্বালা তো মানুষের থাকেই, তাহাব উপর যদি স্নেহের প্রলেপ না পায়, তবে কাটা ঘায়ে নূনের ছিটার মত তাহা অসহ্য হয়। দরদ কি সংসারে নাই? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে স্বামী অনেকটা ক্ষমাশীল, নহিলে যখন বিবাহ করিতে যাওয়ার পথেই সে মেয়েটী সম্বন্ধে কাহার বা কাহাদের নিকট শুনিয়াছিল তখনও তো ফিরিয়া আসিতে পারিত। এখনকার আচরণের সঙ্গে সে সময়ের আচরণের সামঞ্জস্য নাই। সে যদি বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থাই হুবহু মানিয়া চলিতে চায় তবে তাহার সেই সময়েই কর্ত্তব্য ছিল বিবাহ না করিয়া চলিয়া আসা। অনেকখানি risk তো সে নিজেই নিয়াছিল। এখন পশ্চাৎপদ হইলে ধর্ম্মের কাছে তাহা অপরাধ হইবেনা? মেয়ের

পিতা-মাতা যদি জানিয়াই থাকে মেয়ে ভাল নয়, স্বামীও তো তাহা লোক-মুখে শুনিয়াছিল। সে সময়ে যাহা হজম করিয়াছিল, এখন তাহা হজম করিতে বোধ হয় ধর্ম্মতঃ সমাজতঃ বাধ্য, নহিলে তাহার প্রত্যবায় হইবে। সেই সময়ে চলিয়া না আসায় তাহার দায়িত্ব ভীষণভাবে বাড়িয়াছে। অবশ্য কোন দায়িত্ব রক্ষা না করিলেও পুরুষদের বর্ত্তমান সমাজে আট্‌কায় না। তুমি বুঝাইও। মধ্যবর্ত্তী দুই পক্ষ হইতে খোঁচা খায় তাহা কি ভুলিয়া গেলে?···স্বামী নাকি বলিয়াছে 'She is dead to me, I pity her'। ইহার উপর আমি কোন গুরুত্ব আরোপ করি না, উহা বেদনার অভিব্যক্তি মাত্র। তাহার কাছে অত সহজে মরিতে দিতে আমরা রাজী নয়, মরিলে মৃতের প্রেতাত্মা স্বামীকে অল্প জ্বালা দিবেনা, স্থির জানিও। আর ঠাকুর মেয়েটীর ভাগ্য এমন সুপ্রসন্ন করিয়া দিতে পারেন যে একদিন তাহার সৌভাগ্যে স্বামী pity না করিয়া গর্ববোধও করিতে পারে। আশ্রমের সব কুশল। ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন।

পুরুষোত্তমানন্দ

(৩)

নারায়ণেষু

নরনারায়ণ আশ্রম

কালীঘাট, কলিকাতা ২।১২।৩৪

ভগবান নরনারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। মেয়েটী

আমার কাছে আশ্রমে আছে। ভগবানের আশ্রয় সে পাইয়াছে।

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়া কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়া এনেছ তোমারি দুয়ারে॥

আশ্রমে মেয়েটী যত্ন সহকারে আদরে আছে। আশ্রমে আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী আছেন। এই আশ্রম গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের মিলন ভূমি। ...মেয়েটী আজ অপরাধিনী, পিতা-মাতা শ্বশুর-শাশুড়ী-স্বামী সর্ব্বশেষে নিজের কাছেও সে ভুল করিয়া আজ লজ্জায় অধোবদনা। সমাজ এ ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা দিয়া আসিয়াছে তাহা আমি জানি, গ্লানিগ্রস্ত পচা গলা সমাজ বর্জ্জনই করিয়াছে, তবু শোধন করিয়া কোলে তুলিয়া লয় নাই। মেয়েটী আজ আর কাহারও নয়। কিন্তু জগন্নাথের শ্রীচরণে তাহার স্থান নিশ্চয়ই আছে...।

সবাই ছেড়েছে নাহি যার কেহ
তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ।

কিন্তু ভুলের জন্য মেয়েটী একাই কি দায়ী—একা কি তাহাকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে? সমাজ শাসকই শুধু! তাহার ভুলের জন্য তাহার পরিবার সমাজ রাষ্ট্র ও বিশ্ব সবাই কি দায়ী নয়? সমাজ মেয়েটীকে, পরিবারকে অপমানিত করিতেই চাহিবে, সমাজ কি লজ্জিত হইবে? এতখানি সরলতা ও সুবুদ্ধি যদি সমাজ-পতিগণের থাকিত, তবে সমাজের এত শোচনীয় অধঃপতন হইত না। আজ ভগবান অবতীর্ণ। দিকে

দিকে নূতন করিয়া সমাজ গড়িবার প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে। ...বাল্য সুলভ চপলতাবশতঃ যাহা কিছু ভুল করিয়াছে তাহা কি এমনই অমার্জ্জনীয় যে সমাজ তাহা হজম করিতে পারিবে না? এমন বদহজ্‌মি যে সমাজের, সে সমাজ জীবন্ত নয়। আজ সমাজকে জীবন্ত, তাজা সমাজে গড়িয়া তুলিতে হইবে। মেয়েটীকে এমন ভাবে শিক্ষিতা সংযতা গরিয়সী করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে সে স্বামীর মুখ, পিতা মাতার কুল, শ্বশুর শাশুড়ীর বংশ, সর্ব্বশেষ নিজের অন্তরের ভগবৎ সত্তাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নির্ম্মল ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। তাহাকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে। সমাজে স্থান না হইলেও ভগবানের কোলে তাহার স্থান নিশ্চিত। সমাজ তো ভগবানের দেহ, সমাজের কোলেই মেয়েটীকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তুমি সহায় হও। তুমি বীর, তোমার ক্ষমা-শীলতা ও সুবুদ্ধির কাহিনী আমি তোমার শ্বশুর ঠাকুরের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি। পূর্বে যে সব ব্যাপার ঘটিয়া ছিল, তাহাও তুমি বীরের মতন হজম করিয়াছ, এখনও তুমি তাহা পারিবে। অবশ্য জানাজানি হওয়ায় অবস্থাটা একটু জটিল হইয়াছে সত্য। তোমার পিতামাতার স্নেহময় ব্যবহারের কথাও আমি জানিয়াছি। আমি জোর করিয়া একটি অসংযতা মেয়েকে তোমাদের ঘাড়ে চাপাইতে চাই না, স্থির জানিও। আমি পরিবারের মান ইজ্জৎ বজায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ব্যবস্থা করিব। যে পর্য্যন্ত তোমাদের মধ্যে পুনরায় নিজের

সেবাব্রত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারার মতন যোগ্যতা অর্জ্জন না করিবে, আমি সে পর্য্যন্ত তোমাদের নিকট যাইতে দিব না। মেয়েটীর পিতাও বলিয়াছে আমরা শিখাইতে বুঝাইতে জানি না! যে সমাজ অপমান ছাড়া সম্মান দিতে জানে না, সে সমাজের মধ্যে পাঠাইতেও বেদনা বোধ করি। তোমার প্রাণের অবস্থা সর্ব্বাগ্রে জানিবার প্রয়োজন, তুমি যদি উহাকে বালিকা মনে করিয়া প্রাণ খুলিয়া ক্ষমা করিতে পার, আমি প্রাণপণ করিয়া দেখিতাম সকল দিক, ইহকাল পরকাল বজায় রাখিয়া উহাকে তোমাকে দিতে পারি কিনা। দীর্ঘ দিন দূরে থাকিলে কি শেষে নিতে সোজা হইবে? তোমরা তো প্রচার করিয়াছ যে সে পিতা-মাতার অসুখের খবর পাইয়া চলিয়া গিয়াছে। মাসের পর মাস তোমাদের কাছ ছাড়া থাকিলে তো অসুবিধা বাড়িবেই। সে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, জানিয়া রাখ। আজ সমাজ সংশোধন করিবে, শুদ্ধ করিবে, কোলেও স্থান দিবে। তোমাদিগকেও দিতে হইবে। মেয়েটীর চিত্ত এখন ধীরে ধীরে সুস্থ ও স্বচ্ছ হইতেছে। আশ্রমের হাওয়া তাহাকে শান্ত করিতেছে, তাহার জীবন উজ্জ্বল হইবে। আমি যদি তাহাকে বিশুদ্ধা চরিত্রা করিয়া তোমাদের মধ্যে রাখিয়া আসি, তোমরা কি স্থান না দিয়া পারিবে? সে দাসীর মত তোমাদের সেবা করিবে শুধু, যদি তাহার সেবা তোমাদের চিত্তে সরলতা জাগ্রত করিতে পারে, তবেই তোমরা তাহাকে তুলিয়া লইবে। সেবার সুযোগ হইতে

বঞ্চিত করিতে দিব না। ধ্বংসোন্মুখ সমাজের খামখেয়ালী মরণ নিশ্চয়ই তুমি সমর্থন করিবে না। সমাজের গঠন-শক্তি নাই, আছে শুধু ধ্বংস করিবার ক্ষমতা। জীবন্ত সমাজ অনেক কিছু হজম করিতে পারে। সমাজে যে বিষ প্রতিদিন উৎগীর্ণ হইতেছে তাহা কি নীলকণ্ঠের মত হজম করিতে পারিবে না? ভয় কি? ভগবান আজ জাতির সারথি, সমাজের সারথি। আমার কাছে আসিয়া পরে তোমাকে নিতে হইবে। একটা আঘাতে সমাজকে এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতে দিব না। মেয়েটী অতি সরলা মেয়ে। আমার কাছে গত শনিবার রাত্র হইতে আছে, আমি তাহাকে শাস্ত্র পাঠ ও সদুপদেশ দিতেছি। ...সমস্ত ব্যাপারই একটা ছেলেখেলা মাত্র, ইহার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখিবার কিছুই নাই। অবশ্য সমাজ ইহাকে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া তুলিবে এবং তুলিয়াছেও। ৩২ কোটির একটি জাতি অসহায় অবস্থায় দিন কাটাইতেছে, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, কে কোথায় একদিন ঘরের বাহির হইল, অমনি প্রলয় কাণ্ড। তুমি দৃঢ় হও, মেয়েটী ছেলে মানুষই, সমাজ ততোধিক ছেলে মানুষ, ছেলে-মানুষীর দিন আর নাই। আজ ভগবৎ সত্তা জাগ্রত, তাহার দিকে চাহিয়া সমস্ত জগৎ-ব্যাপারকে নূতন করিয়া দেখিতে শিখ। খুব দেরী করা ভাল নয়।...

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

শ্রীমৎ স্বামিজী মেয়েটিকে শেষে তাহার পরিবারের হাতেই দিয়াছিলেন। স্বামীজীর সামনে যখনই যে কোন ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যতই জটিলতাপূর্ণ হউক না কেন, তিনি তাহাতে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন এবং সেই ঘটনাকে পুরুষোত্তম ছন্দে সামঞ্জস্যের পথে আনিবার জন্যে চেষ্টা করিয়াছেন।

'প্রাণকে অন্ন, vitality, conscious life, intellectual life, intuitional life-এর সমন্বয় বলিতে হইবে। যাহা দ্বারা বিশ্বের সমস্ত experience-এর ব্যাখ্যা চলে, যাহা দ্বারা conscious, unconscious সব স্তরের ব্যাখ্যান সম্ভব হয়, তাহাই পুরুষোত্তম-দর্শনের প্রাণ। সর্ব্বশক্তিসমন্বয়-মূর্ত্তিই প্রাণ। এই প্রাণ ও প্রজ্ঞা অভিন্ন। একই সত্তাকে দেখিবার জন্য দুইটী standpoint মাত্র।...'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

অষ্টম অধ্যায়

সাহানগর রোডে দুই বৎসর নরনারায়ণ আশ্রম ছিল, তাহার পর ৮এ রাসবিহারী এভিনিউতে তেতলার উপর নরনারায়ণ আশ্রম স্থাপিত হয় এবং দীর্ঘদিন সেখান হইতেই স্বামীজী তাঁহার প্রচার কার্য্য চালাইয়া যান। ১৩৪৪এ তিনি স্বরাজের পূর্ণরূপ ও গীতা জয়ন্তী নামে দুইখানি পুস্তিকা ছাপান এবং ১৯১৯এ ব্রজমোহন স্কুলের চাকুরী ছাড়িয়া বেদান্তের যে ভাষ্য তিনি লিখিয়াছিলেন ১৩৪৫এ সেই বেদান্তের চতুঃসূত্রী প্রথম খণ্ডরূপে ছাপাইয়া বাহির করেন এবং উহা লইয়া পাবনা দিনাজপুর রংপুর প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিতে যান। পাবনা টাউনে জয়কালী বাড়ীতে এক অপূর্ব্ব মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন সাড়ে তিন ঘণ্টা। পাবনা টাউনের সমস্ত বিদ্বৎ সমাজ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কেহ টু শব্দটি পর্য্যন্ত না করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধের মতন সেই ভাষণ শুনিয়াছিলেন। সেই সভায় পুরুষোত্তম তত্ত্ব অকাট্য যুক্তি সহকারে চোখের জলে তিনি যাহা পরিবেশন করিয়াছিলেন তাহা অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকরই হইয়াছিল।

মানুষকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে, আপন বলিয়া

জানিতে হয় তাহা আমরা দেখিয়াছি পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে। শুনিয়াছি শ্রীনিত্যগোপাল নাকি তাঁহার শিষ্য-দিগকে বলিয়াছেন তোদের বাড়ীর কুকুরটি পর্য্যন্ত আমার স্নেহের পাত্র। আমরা নিত্যগোপালকে দেখি নাই কিন্তু তাঁহার প্রিয় সন্তান পুরুষোত্তমানন্দের স্নেহের পাত্রী হইবার সৌভাগ্য জীবনে ঘটিয়াছিল। তিনি আমাদের পরিবারের সকলকেই অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখিতেন। একবার আমরা স্থির করিলাম, আমাদের পিত্রালয় পাবনা জেলার অষ্টমনিষা গ্রামে বাবার মৃত্যু তিথিতে স্বামীজীকে লইয়া যাইয়া ভাগবত পাঠ করাইব। সে হইল ১৩৪০ সনের কথা। আমাদের এই ইচ্ছা স্বামীজীকে জানাইলাম। তিনি আনন্দের সহিত জানাইলেন তোমার পিতার মৃত্যু তিথিতে তোমার পিতৃ ভবনে ভাগবত পাঠ করিতে যাইব, সে তো আমার আনন্দের কথা। যে স্থানে তোমার বাল্য জীবন হাসিয়া খেলিয়া বড় হইয়াছে, সে স্থান যে আমার কত আদরের। তোমার মা ও বোনেরা সবাই যাহাতে উপস্থিত থাকেন তাহার বন্দোবস্ত করিও। আমরা সেই ভাবেই বন্দোবস্ত করিলাম। আমরা সেই উৎসবের জন্য সবাই পিতৃভবনে সমবেত হইলাম। উৎসবের কয়দিন পূর্ব্বে স্বামীজী এক পত্র দিলেন, আমি কাটোয়া বক্তৃতা দিতে যাইতেছি, আসিয়া আর পত্র দিবার সময় থাকিবে না। অষ্টমনিষাতে ৩রা চৈত্র হইতে ৫ই চৈত্র পর্য্যন্ত সকালে ভাগবত পাঠ

বৈকালে ভাগবত ধর্ম্মের আলোচনা, ৬ই অহোরাত্র কীর্ত্তন ও মহোৎসবের বন্দোবস্ত করিও। আমি ২রা চৈত্র রওনা হইব। স্বামীজীর নির্দ্দেশ মতই সমস্ত আয়োজন করা হইল। ২রা চৈত্র স্বামীজী মেজপুত্র নিত্যব্রতসহ অষ্টমনিষা আমার পিতৃভবনে পদার্পণ করিলেন। সে কি আনন্দের দিন।

অষ্টমনিষা গ্রামটি পল্লীগ্রাম হইলেও বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। এ হেন গ্রামে যেদিন পুরুষোত্তমানন্দ পদার্পণ করিলেন, সমস্ত গ্রামটি যেন আনন্দ মুখরিত হইয়া উঠিল। শুধু একজন সন্ন্যাসী বলিয়া নয়, রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, বাংলার কৃতি সন্তানকে এমন একটি পল্লীর লোক তাহাদের নিজেদের মধ্যে পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিল, আর পুরুষোত্তমানন্দ সর্ব্ব সংস্কার বর্জ্জিত, অভিমান-শূন্য, মানুষের পরম আত্মীয়, সকলের গলা ধরিয়া প্রিয়জনের মত তাঁহার প্রাণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কথা-রূপ অমৃত সিঞ্চনে সকলকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। ৩ দিন সকালে ২ ঘণ্টা ভাগবত পাঠ এবং বৈকালে ২ ঘণ্টা ভাগবত ধর্ম্মের আলোচনা হইত, দুই বেলাই সভায় বেশ লোক সমাগম হইত, গ্রামের আশ-পাশের গ্রাম হইতেও বহু লোক আসিয়া যোগদান করিত। সভার দ্বিতীয় দিন এক মৌলবী সাহেব সকালে ভাগবত পাঠ শুনিতে আসেন এবং বৈকালের

আলোচনাতেও যোগদান করেন, সভান্তে মৌলবী সাহেব উঠিয়া স্বামীজীর সমন্বয় ধর্ম্মের আলোচনায় তিনি যে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন তাহাই প্রকাশ করেন, স্বামীজী উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য গ্রামবাসী সেদিন দেখিয়াছিল। মহোৎসবের দিন স্বামীজী নিজে উপস্থিত থাকিয়া সকলকে প্রসাদ খাওয়ান এবং বহু পরে নিজে প্রসাদ পান। উৎসবের পর দিনই স্বামীজী রাজসাহী যাইবেন, কিন্তু ১।৩ গ্রামের লোক একত্র সমবেত হইয়া তাহাদের লইয়া একটি মিলন সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া দিবার প্রস্তাব করে, সেজন্য তিনি একদিন থাকিয়া আমাদের কালাচাঁদ বিগ্রহের আঙ্গিনায় একতা সম্বন্ধে একটি আলোচনা করিলেন, পরে কীর্ত্তন হইয়া হরিলুট দেওয়া হয়। এইভাবে আরও একদিন বিশ্রাম করিয়া স্বামীজী রাজসাহী রওনা হইয়া গেলেন। তিনি ৭ দিন ছিলেন, সেই ক্ষুদ্র গ্রামখানি এক নূতন উদ্দীপনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। যখন যেখানেই তিনি যাইতেন, তখন সেখানেই যেন এক আনন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত, সকলেরই আপন জন ছিলেন তিনি। অষ্টমনিষায় পুরুষোত্তম সেবক সঙ্ঘ নামে একটি সঙ্ঘ উহারা গড়িয়া ছিল।

এই সময় ময়মনসিংহে বক্তৃতা দিতে যাইয়া রেণু মিত্রের সহিত স্বামিজীর পরিচয় হয়, সে তখন বি, এ পড়ে। স্বামীজীর বক্তৃতা তাহার ভাল লাগে; ক্রমশঃ সে পত্রাদি

দ্বারা পুরুষোত্তম-তত্ত্ব আলোচনা প্রভৃতির দ্বারা বিশেষ ভাবে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। রেণু স্বামীজীর কার্যভার তাহার নিজের বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য দুর্ব্বার মনোবল লইয়া সকল বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। স্বামীজী ছিলেন দারুণ আশাবাদী। সুধা ও নিত্যগোপালকে হারাইয়া যেন বিহ্বল হইয়াছিলেন, কে তাঁহার পুরুষোত্তম-তত্ত্ব বিশ্বে প্রচার করিবে ভাবিয়া। রেণুকে পাইয়া আবার আশার আলো দেখিতে লাগিলেন, বুঝিবা নিত্যগোপালের দর্শন ইহার দ্বারা প্রচারিত হইবে, এই আশায় বুক বাঁধিয়া প্রাণপণে রেণুকে তাঁহার কার্যভার গ্রহণের যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। রেণুও তাঁহার চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য নিজের ভাল মন্দ, খেয়াল খুসি সবই তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া তাঁহার আদেশ পালনের জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করিতে লাগিল।

স্বামিজীর বড় ছেলে সত্যব্রত নরনারায়ণ আশ্রমে পিতার সহিত থাকিলেও আকাশ-ধর্ম্মী পিতার মতকে মানিয়া লইতে পারিতেছিল না, তাই সে নিজের যোগ্যতায় আলকাতরার ভিতর হইতে রং বাহির করিবার প্রচেষ্টা করিতে লাগিল, এবং ভাই বোনেরাও তাহার সেই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে লাগিল, কিছুদিন প্রচেষ্টার ফলে কৃতকার্য্যতা লাভ করিল। রং সম্বন্ধে যখন নিঃসন্দেহ

হইল তখন তাহাকে বাজারে বাহির করিবার জন্য নরনারায়ণ লিমিটেড কোম্পানি গঠিত করিয়া স্বামিজী তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে শেয়ার গ্রহণ করিয়া ব্যবসাকে আগাইয়া দিবার জন্য বহু চেষ্টা কয়েক বৎসর করিয়াছিলেন। তিনি হিসাব রাখিতেন, সর্ব্বক্ষেত্রে ছেলেদের সঙ্গে থাকিতেন। এইভাবে তাঁহার জীবনের অমূল্য সময় তিনি বহু ব্যয়িত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, ঠাকুরেব আশীর্ব্বাদে সত্যব্রত কলেজে না পড়িয়াই এই রং বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমি আমার ছেলেদিগকে স্কুল হইতে লইয়া আসিয়াছিলাম, আর স্কুলে পাঠাই নাই, আমার সহিত স্বাধীনতার আন্দোলনে উহারা বহু কষ্টই ভোগ করিয়াছে, ঠাকুর তাই সত্যব্রতর হাত দিয়া রং বাহির করিয়া আমাকে স্ত্রী পুত্র কন্যার অভিযোগ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। আর একটি আশা তিনি করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন, ঠাকুরের অযাচিত করুণায় মা সরস্বতীকে পাইয়াছি, তাহার দৃষ্টান্ত আমাকে দিয়া বেদান্ত লিখাইয়াছেন, কিন্তু মা লক্ষ্মীর কৃপা না পাইয়া সেই বেদান্তকে বিশ্বে ছড়াইয়া দিতে পারিতেছি না, এইবার বুঝি শ্রীনিত্যগোপাল বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তাঁহার সমস্ত কর্ম্মেব পিছনে ছিল শ্রীনিত্যগোপালের সেবা বুদ্ধি। রং-এর ব্যবসা ভালই চলিতে লাগিল কিন্তু স্বামীজীর আশানুরূপ ফল ফলিল না। সত্যব্রত একদিন পিতাকে বলিল আমরা আর

আপনার সহিত চলিতে পারিতেছি না, আমরা ক্লান্ত, আমরা এখন বসিতে চাই। স্বামীজীর মত অতবড় বিপ্লবী মানুষের সহিত চলা খুবই কঠিন, তীব্র আদর্শ বোধ ব্যতীত অসম্ভব।

স্বামীজীর পুরুষোত্তম শাস্ত্রে কাহাকেও লইয়া টানাটানি নাই, ব্রজধামের সহজ প্রেমের বাঁধনে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ ছিল সেই বন্ধনহীন গ্রন্থি। তিনি ঘরে ও বাহিরে, রক্তের সম্পর্কের মাঝে ও ভাবের সম্পর্কের মাঝে সেই গ্রন্থি সমান ভাবে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই সংসার সন্ন্যাসের সমন্বয়ে সঙ্ঘ গড়িবার যে কল্পনার সৌধ মনে মনে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল দেখিয়া হৃদয়ধর্ম্মী পুরুষোত্তমানন্দ হৃদয়ে অসীম বেদনা বোধ করিলেন। কিন্তু সে বেদনা বাহিরে প্রকাশ পাইল না, কাহার প্রতি কর্ত্তব্যেরও কোন ত্রুটি তিনি করিলেন না। সত্যব্রতকে বিবাহ দিয়া তাহার উপর সকল দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। সহযোগীরূপে আরও কিছুদিন সংসারকেই ব্রজধাম করার চেষ্টা করার পর তিনি ৪২ সনের আগষ্ট আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য বরিশাল চলিয়া গেলেন এবং সেখানে যাইয়া রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানের ফলে বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া এক বৎসরের জন্য কলিকাতা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে প্রেরিত হইলেন। পুরুষোত্তমানন্দের জীবনের কোন মুহূর্ত্তই পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালের সেবা ব্যতীত ব্যয়িত হয় নাই। বৃটিশের কারাগারে বসিয়া তিনি ১ বৎসর শ্রীমদ্ভগ-

বদ্‌গীতার অবধূত ভাষ্য এবং ১১ খানি উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করিলেন। সেই সময় আমি কলিকাতায়, রেণুও এম, এ, পরীক্ষা দিতে কলিকাতাতেই ছিল। স্বামীজীর স্ত্রী পুত্র কন্যা একদিন তাঁহার সহিত জেলের ভিতর দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সেই দিন আমি ও রেণু জেলের সামনে রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিলাম, যদি তাঁহার একটু দেখা পাই এই আশায়। আমরা গিয়াছি শুনিয়া তিনি স্ত্রীপুত্র কন্যা-দের সহিত জেলের গেট পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদিগকে দেখা দিয়া গিয়াছিলেন। প্রায় ১ বৎসর পর দূর হইতে সেই ক্ষণিকের দেখা, সে দেখা যেমন কত মধুর, তেমনি কত বেদনাদায়ক। তিনি যে আমাদের কত আপন জন ছিলেন, কত অপরিসীম স্নেহ তাঁহার আমাদের প্রতি ছিল তাহা আর সামান্য ভাষা দিয়া কি প্রকাশ করিব। এক বৎসর পর একদিন হঠাৎ সকালে তিনি জেল হইতে বাহির হইয়া আমাদের মধ্যে আবার আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে কাছে পাওয়ায় যে কি আনন্দ তাহা আর কি লিখিব। সেই সময় হইতে ১৫।১৬ বৎসর তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের বহু বিচিত্র ঘটনার সহিত আমরা দুই জন অর্থাৎ রেণু ও আমি যুক্ত ছিলাম। আমাদের নিকট তাঁহার জীবনের কিছু গোপন তিনি রাখিয়াছিলেন না। সুখে দুঃখে সেই সহজ সরল মানুষটী আমাদের জীবনের সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা-

বহুল জীবন-কথা বলিয়া তো শেষ করা যাইবে না, তাই অতি সংক্ষেপে শেষের দিকের কয়েক বৎসরের মোটামুটি ঘটনা লিখিয়া এই জীবন-কথা শেষ করি।

স্বামীজী জেল হইতে আসিলেন, রেণুও এম, এ পাশ করিয়া কলিকাতাতেই নরনারায়ণ আশ্রমে কয়মাস থাকিয়া রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরের সমালোচনা বই লিখিল পুরুষোত্তম-দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া। ইহার পর রেণু তাহার দাদার বাসাতে থাকিয়া স্বামীজীর সহিত যোগা-যোগ স্থাপন করিয়া তাহার কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়ে ১৯৫৬-এ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ-লিখিত ঈশোপনিষদের অবধূত-ভাষ্য প্রকাশিত হয়। পুরুষোত্তম-দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া রেণু আর একখানি শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন বইয়ের সমালোচনামূলক পুস্তক রচনা করিয়া বাহির করিল। আমি টালীগঞ্জে বাসা করিয়াছিলাম, আমিও প্রতিদিন নরনারায়ণ আশ্রমে যাতায়াত করিয়া স্বামীজীর সহিত সংযোগ রক্ষা করিতাম। সে কি টান, সে কি আনন্দের দিন গিয়াছে। আমার নারী প্রগতির জন্মকথা বইখানিও সেই সময় স্বামীজীর ইচ্ছায় ও রেণুর প্রচেষ্টায় বাহির হইয়াছিল।

জেল হইতে আসিয়া কন্যা নিত্যরঙ্গিণীকে উপযুক্ত পাত্রের হাতে অর্পণ করিলেন এবং মেজ পুত্র ও ছোট পুত্রকে বিবাহ দিলেন। পুরুষোত্তম-দর্শন বিশ্বে প্রচার

করিবার জন্য সেই সময় দেখিয়াছি তাঁহার জীবনের কি দাপাদাপি, পুরুষোত্তম-দর্শন মানুষের নিকট তুলিয়া ধরিবার ও পুরুষোত্তম ছাঁচে মানুষকে গড়িয়া তুলিতে না পারার কি বেদনা। একদিন বলিয়াছিলেন—আমার বুকটার ভিতর কি জ্বালা, সমস্ত ভালমন্দ, সংসার সমাজ, স্ত্রী পুত্র কন্যা সব আমার পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, যাহা আছে তাহা তো সংসারের প্রাতিভাসিক সত্তা। যেমন লেখা কাগজ আগুনে পুড়াইলে কাল হইয়া যায় অথচ লেখাগুলি থাকে কিন্তু হাত দিলে গুঁড়া হইয়া যায়, আমার সামনে আমার সংসারটা সেই রূপেই আছে। সকলের সহিত আমার আত্মার সম্পর্ক, সেই দিক দিয়া আমি কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারিব না, কিন্তু আমার পুরুষোত্তম নিত্যগোপালের পথের পথিক যে নয় সে আমার শত আপনার হইলেও তাহার পিছনে আমি চলিতে পারিব না, দূর হইতে কল্যাণ কামনা করিব, তাহার জন্য সারা জীবন হৃদয়ের দরজা খুলিয়া অপেক্ষা করিব। কাহাকেও লইয়া মাতামাতি করিবার আমার কিছু নাই। তিনি ছিলেন বিশ্বনাথের সেবক, বিশ্বের সেবার জন্য ছিল তাঁহার প্রাণ পাগল, কেমন করিয়া তাঁহার প্রাণ প্রিয়তম পুরুষোত্তমের কথা বিশ্বদরবারে পৌঁছাইবেন, এই বিশ্বটাকে কেমন করিয়া ব্রজধামে গড়িয়া তুলিবেন ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান

চিন্তা। ধন নাই, জন নাই একাকী আকুলি বিকুলি করিতেন, আমি ও রেণু ছিলাম সেই বেদনার নীরব সাক্ষী, বেদনার লাঘব করিবাব কোন পথ খুঁজিয়া পাইতে ছিলাম না।

এমন সময় স্বামীজীর প্রেরণায় উজ্জ্বল ভারত মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার সিদ্ধান্ত করা হইল। বাণীপুর পোস্ট গ্রাজুয়েট বেসিক ট্রেণিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধ কুমার সেনগুপ্ত মহাশয় (রেণুব মাষ্টার মহাশয়) এই কার্য্যের সহযোগিতা করিবার জন্য আগাইয়া আসিলেন, এবং প্রাণপণ প্রচেষ্টাদ্বারা পত্রিকাটি বাহির করিবার সুযোগ করিয়া দিলেন, তিন শত টাকাও দিলেন। স্বামীজীর কন্যাও কিছু টাকা দিয়াছিল। ১৯৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে উজ্জ্বল ভারত মাসিক পত্রিকা পুরুষোত্তম দর্শন বুকে লইয়া বিশ্ব দরবারে উপস্থিত হইল। ১৮এ গোলাম মহম্মদ রোডে ২০৲ টাকায় একটি ছোট ঘর ভাড়া করিয়া উজ্জ্বল ভারতের অফিস স্থাপন করা হইল। সেখানে কাজ চলিতে লাগিল। পত্রিকা বাহির করিতে পারিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। বিশ্ব সেবার অফুরন্ত কর্ম্মপ্রেরণা যাঁহার মধ্যে সর্ব্বদা ধাক্কাধাক্কি করিত, সেই মানুষ কি কর্ম্ম ছাড়া থাকিতে পারেন? পত্রিকা বাহির হইলে সর্ব্বদাই তিনি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া কর্ম্মের প্রেরণা, পুরুষোত্তম কর্ম্মের

ছন্দ ও কর্ম্মের আনন্দ যোগাইতেন। যেদিন পত্রিকা প্রেস হইতে আসিত সেদিন রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত আমাদের নিকট বসিয়া পত্রিকায় র‍্যাপার জড়ানো দেখিয়াছেন, নিজে টিকিট ছিঁড়িয়া দিয়াছেন, আমাদের টিকিট লাগানো যদি একটু বাঁকা হইত তবে দুঃখ পাইতেন, বলিতেন তোমাদের প্রত্যেক কর্ম্ম পুরুষোত্তমের সেবা, তোমাদের প্রত্যেক কর্ম্ম হইবে সুন্দর এবং গোছানো সুশৃঙ্খলাপূর্ণ। আমাদের ভিতর ইহার অভাব দেখিলেই দুঃখ পাইতেন। কেমন করিয়া যে সেই বিরাট পুরুষ আমাদের মতন এই ক্ষুদ্র মানুষের সহিত দৈনন্দিনের অতি ছোট ঘটনার সহিত জড়িত থাকিয়াছেন, ভাবিলে এখন অবাক লাগে। এইভাবে আমরা তিনটী মানুষ ও অন্যান্য বন্ধুগণের সহযোগিতায় পত্রিকার কাজ সুষ্ঠুভাবেই চলিতে লাগিল, অবশ্য পত্রিকার সকল দায়িত্ব রেণুর উপরই পড়িল। রেণুর প্রতিদিন প্রায় ১৪ ঘণ্টা কলিকাতায় ঘুরিয়া বিজ্ঞাপন যোগাড়, গ্রাহক যোগাড়, লেখা সংগ্রহ ইত্যাদি করিতে হইত, আবার প্রুফ দেখা, হিসাব লেখা প্রভৃতি ঘরে বসা কাজগুলিও করিতে হইত। তাহার প্রাণপণ প্রচেষ্টায় উজ্জ্বলভারত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। রেণু ছিল হার্টের রোগী, একরূপ বিছানায় শুইয়াই সে এম, এ পাশ করিয়াছে। স্বামীজীর কি দারুণ দুঃশ্চিন্তা ছিল রেণুর দেহের অসুস্থতার জন্য, এবং এজন্য তাহার

সস্নেহ দৃষ্টি ছিল সর্ব্বদা তাহার আহারাদির প্রতি। একজন হার্টের রোগীর এই ভাবে কলিকাতা শহরে ট্রামে বাসে ঘুরিয়া কাজ করা তাহার পক্ষে অসম্ভবকে সম্ভব করা বলিলেই চলে। রেণু বাহিরে গেলে আসিতে একটু দেরী হইলে স্বামীজী বৎসহারা গাভীর মত ঘর বাহির করিতেন, সে কি উৎকণ্ঠা! তাঁহার এই অত্যধিক উৎকণ্ঠা দেখিয়া আমাদের জৈব মন কখনও বিরক্ত বোধ করিত। তিনি তাহাতে বলিতেন আমার কি যে দায়িত্ব তাহা তোমরা বুঝিবে না, একটি রুগ্না মেয়েকে দিন রাত এইভাবে খাটাইতেছি, তাহাকে কলিকাতার রাস্তায় বিপদের মাঝে ছাড়িয়া দিয়া আমার কি যে চিন্তা! যদি তাহার কিছু হয় তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট আমার কি কৈফিয়ৎ দেওয়ার থাকিবে? এই তাঁহার বাহিরের দিকের কথা, আর প্রাণের কথা তো আমাদের মত মানুষের বুঝিবার সামর্থ্যই ছিল না।

১৯৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে একদিন ঢাকুরিয়া নিবাসী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত দেখা। তিনি তখন পুত্র শোকাতুর; একমাত্র পুত্র যুবক রথীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ চলিয়া যাওয়ায় মুহ্যমান ধীরেনবাবুর পিতৃ হৃদয় একটু সান্ত্বনার প্রয়াসী। এমন সময় স্বামীজীর নিকট আসিয়া তাঁহার প্রাণ স্পর্শ পাইয়া তাঁহার মুখে বেদান্ত-গীতা উপনিষদের নূতন ব্যাখা শুনিয়া ধীরে ধীরে চিত্তের সুস্থতা লাভ করিলেন। প্রায় ১৪।১৫ রবিবার স্বামীজী কত কষ্ট

করিয়া ট্রামে বাসে ধীরেনবাবুর ঢাকুরিয়ার বাসায় যাইয়া গীতার আলোচনা করিয়াছেন। ধীরেনবাবুর স্ত্রীকে মা ডাকিয়া তাঁহার পুত্র শোকাতুর হৃদয়ে শান্তির বারি সিঞ্চন করিয়াছেন। দিনের পর দিন ধীরেনবাবু স্বামীজীর কথা শুনিয়াছেন এবং ভাল বাসিয়াছেন। স্বামীজীর তিরোধানের পর স্বামীজীর জন্ম-তিথির উৎসব উপলক্ষে সভায় বক্তৃতাকালে ধীরেনবাবু অকুণ্ঠ চিত্তে স্বামীজীর সেই স্নেহের কথা স্বীকার করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। ১৯৬১ সালের ২৬শে নভেম্বর রবিবার—"আজ কার্ত্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী, নরনারায়ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের ৭৯তম শুভ জন্ম তিথি। স্বামীজীর শুভ জন্ম তিথির আসরে তাঁর পুণ্য জীবন-কথা স্মরণ করার জন্য প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও আমরা এই পবিত্র আশ্রম প্রাঙ্গনে সমবেত হয়েছি। আপনাদের সহিত মিলিত হয়ে তাঁকে আমার ভক্তি-নম্র প্রণাম নিবেদন করি।

স্থূলদেহে তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। সাড়ে তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁর জীবন দেবতা শ্রীগুরুর মহিমা কীর্ত্তনকালেই বালীগঞ্জস্থিত গুরুপীঠে তিনি অপ্রকট হয়েছেন। সংসারের সর্ব্বক্ষেত্রে বিপ্লবী পুরুষোত্তমানন্দের দিব্য দেহ আমাদের সম্মুখস্থ মন্দিরে সমাহিত। চাক্ষুস আমি তাঁকে দেখছি না বটে, কিন্তু তাঁকে স্মরণ করে যখনি চক্ষু মুদ্রিত করি তখনই তাঁর করুণাঘন মুখচ্ছবি আমার মানস মুকুরে

উদ্ভাসিত হয়। প্রায় ১১ বৎসর তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ কালে তাঁর মুখে অনেক ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক ব্যাখ্যা শুনেছি, তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা তিনি আমাকে বলেছেন। কি সুনিবিড় স্নেহে কখন হাত ধরে, কখন বা আলিঙ্গন করে, তাঁর বক্তব্যগুলি আমাকে বোঝাতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল বলে যেতেন, ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। এমন দিন গেছে যখন ২ ঘণ্টা বক্তৃতা দিবার পর শুধু আমাকে নিয়ে আরও এক ঘণ্টা বলেছেন, সে সব কথা ভেবে আমি এখন অবাক হয়ে যাই।

কোন সাংসারিক দুর্ঘটনায় মর্ম পীড়িত আমি নিবিষ্ট চিত্তে শুনতাম তাঁর গীতা-উপনিষদ-ভাগবত ব্যাখ্যা। সাহিত্যের ছাত্র হলেও বেদান্তের উপব বরাবরই আমার গভীর শ্রদ্ধা, তার উপর দুঃখভারে প্রপীড়িত হয়ে গীতা-ভাগবত-উপনিষদের উপর আমার শ্রদ্ধা আরও গভীর হয়েছিল। এমনি যখন আমার মনের অবস্থা তখনি আমি স্বামীজীর সংস্পর্শে এসেছিলাম। তীব্র আগ্রহে স্বামীজীর কথা শুনেছি। গীতার যে অর্থ আমি মনে মনে ধারণা করেছিলাম, আর স্বামীজী গীতার যে অর্থ আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন, দেখতাম অনেক জায়গায় তা মেলে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর কথা শুনতাম, কিন্তু বুঝতে পারতাম না; ক্রমশঃ তাঁর বক্তব্যগুলি আমার হৃদয়ঙ্গম হল।”

১৯৬২ সালের ১৮ই নভেম্বর রবিবার—"স্বামীজীর কথা বলতে গিয়ে আমার কেবলি মনে পড়ছে প্রথম যে দিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল রাসবিহারী এভিনিউএর বাটীতে, সে আজ ১৩।১৪ বছর আগের কথা। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে অনেক মানুষের সাথে আমার পরিচয় ঘটেছে—কোন কথা মনে আছে, অনেক কিছুই বিস্মৃতির অতল জলে ডুবেছে। কিন্তু ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে যে স্বামীজীর সঙ্গে কস্মিনকালে আমার কোন পরিচয় ছিল না, প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাকে একেবারে আপন জন করে নিলেন। কোন পারিবারিক দুর্বিপাকে আমি তখন ছিন্ন ভিন্ন। তাঁর স্পর্শে এসে শোকের তীব্র জ্বালা ভুলে গেলাম। তারপর দীর্ঘ ১৩।১৪ বছর কেটে গেল, তাঁর সঙ্গে আমার কতবার দেখা হয়েছে দিনে রাতে, তিনি কয়েকবার ঢাকুরিয়া বাটীতে রাত্রিতেও ছিলেন, কিন্তু ঐ প্রথম দিনের কথা যখন মনে আসে তখন এক অপূর্ব্ব প্রশান্তিতে দেহ মন ভরে যায়। দীর্ঘকাল তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই সুদীর্ঘকাল তাঁর মুখে তাঁর জীবন দর্শন সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। সে আদর, সে স্নেহ, সে ভালবাসা আর কোথাও পেলাম না। মনুষ্য সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষ যদি এমনি করে মানুষকে ভালবাসতে পারে। এই ভালবাসা প্রাণের কথা, হৃদয়ের কথা! বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে

পারে না। বুদ্ধি কেবল বিচার ক'রে, বিশ্লেষণ ক'রে দূরে ঠেলে দেয়। প্রাণের স্পর্শেই মানুষ মানুষের কাছে আসে। স্বামীজীর জীবন দর্শনে তাই প্রাণবাদ একটি প্রধান কথা।"

পুরুষোত্তমানন্দের ছিল সহজ প্রাণ-সম্পদ, তাঁহার জীবনে এই প্রাণ-স্পর্শই পরম ঐশ্বর্য্য ছিল, এমন মিষ্টি মধুর মানুষ তিনি ছিলেন, যাঁহার নিকট যাইয়া বসিলেই একটা পরম প্রশান্তিতে দেহমন ভরিয়া উঠিত। শত শত মানুষেব জীবনে আজও সেই স্নেহ-স্পর্শ বিরাজিত, সে স্পর্শ ভুলিতে কেহ পারিবে না। কিন্তু সর্ব্ব সংস্কার বর্জ্জিত সেই মানুষের জীবন ধারার সহিত কেহই যুক্ততা লাভ করিতে পারিল না, এই খানেই রহিয়া গেল তাঁহার জীবন রহস্যাবৃত। ধরা দিয়াও তিনি রহিয়া গেলেন অধর।

স্বামীজী একদিন বলিলেন ঊষাঙ্গিণীকে লইয়া পুরী এবং বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে যাইতে ইচ্ছা হয়, ১৩ বৎসর বয়সে আমার নিকট আসিয়াছিল, আমার অনেক ইচ্ছা পূর্ণ করিল, কোন ইচ্ছাই আমাকে কোন দিন বলেন নাই, তার প্রতি আমার তো একটা কর্ত্তব্য আছে, এই বলিয়া পুরী যাওয়া স্থির করিলেন, সঙ্গে আমিও যাইব স্থির হইল। ১৯৪৯ এর ২৫ শে নভেম্বর স্বামীজী মা ও আমি পুরী রওনা হইলাম। পুরীর গাড়ী ছাড়ে রাত্রি ৮টায়, হাওড়া ষ্টেশনে রেণু, সতব্রত ও তাহার স্ত্রী আরও বন্ধুগণ আসিয়া আমাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। স্বামীজী জগন্নাথ

জগন্নাথ করিতে লাগিলেন, গাড়ী ছাড়িল। পরের দিন ৭৸৹ টায় পুরী ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে প্রধান পাণ্ডা কৃষ্ণধন সিঙ্গারীর লোক ধ্রুব প্রধান ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, তিনিই আমাদিগকে যত্ন সহকারে পুরীর স্বর্গদ্বারে স্বামিজীর বন্ধুজন হরিদাস মজুমদারের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। পূর্ব্ব হইতেই চিঠি লিখিয়া হরিদাসবাবু আমাদের জন্য একটি ঘর ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমরা সেখানে গিয়া উঠিলাম। সে দিন আর সমুদ্র স্নান বা জগন্নাথ দর্শনে যাওয়া হইল না। কুকারে রান্না করিয়া আহারাদি করিয়া বিশ্রামের পর নীলাচল লীলা বই পাঠ করিলাম। স্বামিজী সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলের। বৈকাল বেলা আমরা তিনজন সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গেলাম। পরের দিন ভোরে করতাল বাজাইয়া স্বামিজী স্তব ও পুরুষোত্তমের কাছে প্রার্থনা করিলেন। ৮টায় নুনিয়া আসিয়া আমাদিগকে সমুদ্র স্নান করাইয়া আনিল, ৯টায় ধ্রুব পাণ্ডা আসিলে তাহার সহিত জগন্নাথ দর্শনে রওনা হইলাম। জগন্নাথের সিংহদ্বারে প্রণাম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই স্বামিজী কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মুখে শুধু জগন্নাথ জগন্নাথ বলিতে লাগিলেন, ধ্রুব হাত ধরিয়া লইয়া চলিল আমি ও মা সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। মন্দিরের পরিধিস্থ সমস্ত দেব-দেবীকে দর্শন করাইয়া ধ্রুব মধ্যস্থানে পুরুষো-

ত্তমের মন্দির দ্বারে আমাদিগকে লইয়া দাঁড় করাইলেন। পাণ্ডা কৃষ্ণধন সিঙ্গারী তুলসী পত্রদ্বারা আমাদিগকে অভ্যর্থিত করিলেন এবং পথ খুব অন্ধকার জন্য স্বামিজীর হাত ধরিয়া লইয়া পুরুষোত্তম জগন্নাথদেবের সামনে উপস্থিত করিলেন। প্রণাম করার পর হাত ধরিয়া মণিকোঠা পরিক্রম করাইলেন, আমরাও তাঁহার সহিত জগন্নাথ-দেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া ধন্য হইলাম। প্রদক্ষিণ করিয়া যখন জগন্নাথদেবের সামনে দাঁড় করাইয়া দিলেন তখন কি আর্ত্তি সহকারে প্রার্থনা করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া স্বামিজী কাঁদিতে লাগিলেন। প্রায় ১০।১৫ মিনিট মন্দিরের ভিতরের দর্শকগণ ও পাণ্ডা প্রভৃতি স্তব্ধ হইয়া সেই কান্না দেখিতে লাগিল, সকলের মনেই বুঝি সেই অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। এমনি করিয়াই পাগল গোরা একদিন কাঁদিয়া নীলাচলবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পর পাণ্ডা স্বামিজীর হাত ধরিয়া বাহিরে আনিয়া বসাইলেন, বিহ্বল হইয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলেন, পরে সুস্থ হইলে স্বামিজীকে লইয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। সে দিন আর অন্য কোথাও যাওয়া হইল না। ১৬ দিন ছিলাম, প্রতিদিনই দুপুরে নীলাচল লীলা গ্রন্থখানি পাঠ হইত এবং বৈকালে সমুদ্রতীরে বেড়ান হইত। একদিন স্বামিজী বলিলেন, "একদিকে পুরুষোত্তম, আর একদিকে সমুদ্র, মাঝখানে গৌরসুন্দর আর এক

প্রেম সমুদ্র! এখানে আসিয়া কি প্রেম ধন পাইব না, জীবন জুড়াইবে না, বিশ্বকে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত শক্তিলাভ করিব না? যে দিন ব্যাকুল প্রাণে বৃন্দাবনধাম গিয়াছিলাম রাধারাণী তো আমাকে সেদিন কৃপা করিয়াছিলেন। যে আড়াই বৎসর বৃন্দাবন ছিলাম আমার উপর তত্ত্ব-বৃষ্টি বর্ষিত করিয়াছিলেন। এবার সার্থকতা আসিবে কোন্ পথে তাহা জগন্নাথই জানেন, আমার সারা জীবনের প্রার্থনা ধরাব বুকে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী বল ও সুযোগ তিনি করিয়া দিন"। একদিন স্বামিজীব সহিত বাহির হইয়া মহাপ্রভুর লীলাস্থান সমস্ত পরিদর্শন করিলাম, সেইদিন গম্ভীরায় মহাপ্রভুব কমণ্ডুল পাদুকা ও কাঁথা দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া স্বামিজী অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। বলিলেন, মহাপ্রভু যে কথা বলিতে আসিয়াছিলেন, সেই কথাই তো বলিতে চাহিয়া আমার এই লাঞ্ছনা হইতেছে, কাহাকেও তো বুঝাইতে পারিলাম না এই আমার বুকভরা বেদনা। এইভাবে কাতর হইয়া মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। ১১ই ডিসেম্বর পুরী হইতে কলিকাতা ফিরিবার দিন স্থির হইল। ১০ই ডিসেম্বর (১৩৫৬ সনের ২৪শে অগ্রহায়ণ) শনিবার কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি পড়িয়াছিল, সেদিন স্বামীজীর জন্মদিন। সেই দিন স্বামিজী শেষ রাত্রে অর্থাৎ ৪ ঘটিকায় প্রতিদিনের মত উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া ঠাকুরের

নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সকাল হইলে করতাল বাজাইয়া প্রার্থনা করিলেন। প্রথমে গীতার জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন” এই শ্লোকটি বলিয়া আমার প্রাণ-গোপাল, কৃষ্ণ-গোপাল, গৌর-গোপাল, নিত্য-গোপাল, তোমার দিব্য-জন্মে আমার জনম হউক, তোমার দিব্য-কর্ম্মে আমার কর্ম্ম হউক, তুমি আমি হও, আমি তুমি হই; আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় তোমার হউক, ‘রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর’—আমার নয়ন তোমার বিশ্বরূপ দেখিবার জন্য কাঁদে, আমার জিহ্বা তোমার গুণ কীর্ত্তন লাগিয়া কাঁদে, আমার নাসিকা তোমার অঙ্গ-গন্ধের লাগিয়া কাঁদে, আমার কর্ণ তোমার সুধামাখা নাম শুনিবার লাগিয়া কাঁদে, আমার ত্বক্ তোমার স্পর্শের লাগিয়া কাঁদে; আমার প্রাণ-সখা জগন্নাথ, আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় যে তোমারি লাগিয়া দিবানিশি কাঁদে, তুমি আমার সখা সাথী বন্ধু সহায় সুহৃৎ, আমি তোমার তুমি আমার; হা জগন্নাথ, তুমি আমাকে আত্মসাৎ কর; তোমার জীবনে জীবন লাভ করিয়া আমি আবার নূতন করিয়া অগ্রসর হইব; তোমার বীর্য্য লইয়া তোমার পুরুষোত্তম বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার জন্য আমার প্রাণ পাগল; বলরাম, আমায় বলাধান কর; হলধর, তোমার হলকর্ষণে নূতন বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার এই যে প্রাণের

পাগলামী দিয়াছ তাহা সার্থক হউক, যাহারা ভাবে ও রসে অর্থাৎ আদর্শের দিক দিয়া ও রক্তের সম্পর্কের দিক দিয়া আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সকলের জীবনে তুমি তোমার জন্ম দান কর, তুমি অবতরণ কর—ইত্যাদি চোখের জলে গাহিয়া গাহিয়া প্রার্থনা করিলেন।

প্রার্থনার পর আমরা স্বামীজীকে প্রণাম করিলাম। স্বামীজী মাকে বলিলেন—আমি কোন দিন তোমাকে আমার করিয়া রাখি নাই, আমার স্ত্রী হইয়া তুমি এককোণে পড়িয়া থাকিবে ইহা আমি কোন দিন চাই নাই, আজও চাহি না। এই জন্যই তোমাকে টানিয়া রাস্তায় বাহির করিয়াছিলাম বিশ্বের মাঝে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। আমি ভোগের দৃষ্টিতে কোন দিন তো দেখি নাই, জীবনের প্রথম হইতেই 'রাধারে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম পেয়েছি অনেক আশে' এই কথাটী বুঝিয়াছিলাম, বিশ্ব প্রকৃতিকে যেমন তোমাকেও তেমনি ভজনা করিয়া পাইতে চাহিয়াছি। আমি আমার সুখের জন্য কোনও দিন কি তোমাকে টানা-টানি কবিয়াছি? তোমার সঙ্গে আমার বিবাদ—তুমি নিজের দিকে তাকাও না বলিয়া। অন্যের সেবার জন্য তুমি অনেক কর, কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া তাহাদের সেবা কর না, সেই জন্যই আমার দুঃখ হয়। প্রত্যেক মানুষ যে স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র—এই দুই দিকের দৃষ্টি পরিষ্কার থাকিলে তাহার চলিতে আর বিপদ থাকে না, সে সকলের সব

করিয়াও স্বাধীন থাকিতে পারে। এই রূপে আমি তোমাকে চাহিয়াছিলাম। তোমাকে কেন, আমার কাছে যাহারা আসে সকলকেই আমি এই কথা বলি। প্রতিভাদেরকেও এই কথাই বলি। আমি কাহাকেও কোন দিন অমর্য্যাদা করি নাই, এবং আমাব নিকট যাহারা আসিয়াছে তাহাদের সকলকেই মানুষকে মর্য্যাদা দিবার কথাই বলি। প্রত্যেকের ভিতরেই নারী অর্দ্ধেক ও পুরুষ অর্দ্ধেক, নারী-ভাব প্রধান যে, সে নারী; পুরুষ-ভাব প্রধান যে, সে পুরুষ। নারী ভাবাপন্ন নারীকে পুরুষেব স্তরে উঠিতে হইবে তাহার নারীত্বের অহং হইতে এবং পুরুষকে উঠিতে হইবে নারীত্বের স্তরে তাহার পুরুষের অহংকে ডিঙ্গাইয়া। এই নারী পুরুষের অহং গলিয়া গিয়া মানুষ যখন নারী পুরুষের উপরের স্তরে উঠিতে পারে তখনই সে মুক্ত। আত্মা তো লিঙ্গাতীত বস্তু। বাস্তবে কেহ তো পুরুষও নয়, নারীও নয়, উহা উপাধি মাত্র। এই উপাধি-মুক্ত হইবার জন্যই আমার তোমাদের সকলকে জীবনের প্রতি পদে হুঁসিয়ার করা। আজকের দিনেও আমি সকলের জন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে এই কল্যাণ-প্রার্থনাই রাখিয়া যাইতেছি।

বেলা ৭টায় স্বামীজী জগন্নাথ দেবের মন্দিরে এবং গৌর গম্ভীরায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন। ৮টায় পাণ্ডার ছরিদার ধ্রুব আসিল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী মা ও আমি তিনজন জগন্নাথের মন্দিরে রওনা হইলাম।

মন্দির দূর বলিয়া দুইখানা রিক্‌শা ভাড়া করিয়া যাওয়া হইল। মন্দিরের দ্বারে প্রণাম করিয়া হা জগন্নাথ হা জগন্নাথ বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিহ্বলভাবে স্বামীজী ধ্রুব পাণ্ডার হাত ধরিয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তখন জগন্নাথ দেবের মঙ্গল আরতি হইতেছিল, ঘৃতের প্রদীপ ও মশাল লইয়া যে যার মত আরতি করিতেছিল। একেবারে জগন্নাথ দেবের সামনে যাইয়া আমরা দাঁড়াইলাম, স্বামিজী খুব কাঁদিতে লাগিলেন। প্রাণ ভরিয়া জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাকে দর্শন করিলাম। কিছুক্ষণ পর পাণ্ডা স্বামীজীর হাত ধরিয়া রত্নবেদীতে প্রণাম করাইয়া পরিক্রমা করাইলেন, আমরাও তাঁহার সহিত বেদী পরিক্রমা করিলাম। স্বামীজী পরিক্রমা করিয়া বেদীর সামনে আসিয়া প্রণাম করিয়া আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন, এবং বিহ্বল হইয়া পাণ্ডাকে জড়াইয়া ধরিলেন। পাণ্ডা স্বামিজীর সেই অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া ধীরে ধীরে মন্দিরের বাহিরে আনিয়া একস্থানে বসাইয়া দিলেন। স্বামিজী 'যস্মাৎ ক্ষরমতী-তোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ' এই শ্লোক বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকার পর স্বামিজী যখন স্বাভাবিক অবস্থা পাইলেন, তখন পাণ্ডা তাহার খাতা আনিলেন এবং উহাতে স্বামিজীর স্বীকৃতি চাহিলেন। তিনি তখন তাহাতে লিখিয়া দিলেন।

সেখান হইতে গৌর গম্ভীরায় যাওয়া হইল। সেখানে রামকৃষ্ণ দাশ বাবাজীর সহিত অনেক কথা স্বামিজী বলিলেন। রামকৃষ্ণ দাশ বাবাজীও প্রথম দিন ও শেষ দিন আমাদিগকে মহাপ্রভুর কাঁথা, করোয়া ও পাদুকা দেখাইয়াছিলেন। বৈকালে সমুদ্রে বেড়াইয়া বাসায় ফিরিয়া বিশ্রামকালে অনেক আলোচনা করিলেন। ১১ই ডিসেম্বর বৈকাল ৫॥টায় আমরা বাসা হইতে ষ্টেশনে রওনা হইলাম, ৭টায় গাড়ী ছাড়িল। পুরী ছাড়িতে স্বামিজী বেশ বেদনা বোধ করিতেছিলেন। ১২ই ভোর ৬।০ হাওড়া গাড়ী পৌছাইল, ষ্টেশনে রেণু উপস্থিত ছিল, ট্যাক্সি করিয়া আমাদিগকে আশ্রমে লইয়া আসিল। স্বামীজীর সঙ্গে পুরুষোত্তম দর্শনের দুর্লভ সুযোগ পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে পুরীধামে বেড়াইবার এই স্মৃতি আমার জীবনে পরম সম্পদ হইয়া রহিয়াছে।

একবার কোন ঘটনায় বেদনা-হত হইয়া প্রায় দুইমাস পাবনা কুসুম কুমারী সরকারের বাড়ীতে যাইয়া ছিলেন। সেই সময় তিনি জলপাইগুড়িতে তাঁহার গুরুভাই সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাসায় কয়েক দিন গিয়াছিলেন। ১৩৫১ সনে সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রথম পুত্র সুবোধ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও তাহার স্ত্রী সুনীতি চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ৮এ রাস বিহারী এভিনিউর নরনারায়ণ আশ্রমে আসিয়া স্বামীজীর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদেব

অনুরোধেই তিনি জলপাইগুড়ি যান। সেই সময় ৺সতীশ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র ও পুত্র বধূ এবং গীতা চৌধুরী নামীয় একজন মহিলা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। সেখান হইতে ফিরিয়া পুনরায় পাবনাতে আসেন, সেই সময় ভারত বিভাগ হইয়া হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয়। স্বামীজী সেই সময় পাবনাবাসী সকলকেই নিজেদের পিতৃ পিতামহের স্থান ছাড়িয়া যাইতে নিষেধ করিয়া ছিলেন, কুসুম কুমারীকে বলিয়াছিলেন পাকিস্তান ছাড়িয়া সহজে যাইবে না, যে দিন দেখিবে কেহই আর থাকিল না তখন যাইবে।

১৩৪৫-এ বেদান্তের যে চতুঃসূত্রীর অবধূত ভাষ্য ছাপাইয়া বাহির হইয়াছিল তাহারই দ্বিতীয় খণ্ড স্বামীজীর মেয়ে জামাইয়ের সাহায্যে ১৩৫৭ সনে প্রকাশিত হয়। এই সময় খুবই একটি মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। যে জামাইয়ের সাহায্যে বই ছাপাইয়া বাহির হইল, বাহির হইবার কয়েক দিনের মধ্যেই সেই জামাইয়ের নিজের বাড়ীতেই আততায়ীর হস্তে মৃত্যু ঘটিল এবং কন্যাও আততায়ী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত প্রায় হইয়া হাসপাতালে চিকিৎসার্থে প্রেরিত হইল এবং বহু অর্থব্যয়ে ও চেষ্টায় প্রাণে বাঁচিয়াছিল। সেই নিদারুণ আঘাতের সময়ও স্বামীজীকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, হাফেজের একটা কথা আছে—বিপদের ঝঞ্ঝায় যদি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় তথাপি আমি সখার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিব। আজ

আমারও সেই কথা—একটি মোহর না রাখিয়া তিনি কাহারও কাণা কড়িটি পর্য্যন্ত লন না, দেখি এই দুর্যোগের মধ্য দিয়া তাঁহার কোন্ মঙ্গল ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। কি ধৈর্য্য, কি সহিষ্ণুতা, তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি! কোন ঘটনাতেই তাঁহাকে তেমন বিচলিত হইতে দেখি নাই, যাহাকে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব-দৃষ্টি হইতে চ্যুত হওয়া বলে। সমস্ত ঘটনাকে পুরুষোত্তম-স্তরের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া দেখিয়াছেন এবং সেই ভাবেই তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। আবার পুরুষোত্তমানন্দ প্রাণের দিক দিয়া এতই কোমল ছিলেন, কাহারও কষ্ট দেখিলে যেন কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। কন্যার যে দিন সন্তান হইবে তাহাকে দেখিতে হাসপাতালে যাইয়া তাহার কষ্ট দেখিয়া কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ডাক্তারকে বার বার প্রশ্ন করায় ডাক্তার বলিয়াছিলেন, আপনি সন্ন্যাসী মানুষ, আপনার এইরূপ ব্যাকুল হওয়া শোভা পায় না। এই মায়াবাদের দেশে পুরুষোত্তমানন্দের হৃদয় কে বুঝিবে? আমাদের অসুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাকুল প্রাণে নিকটে বসিয়া থাকিতেন। পুরুষোত্তমানন্দ কোন্ প্রাণ লইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন তাহারই ২।১টি কথা বলিব। এক দিন কলিকাতার পথে বেলা ১২ টায় তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছি, আমার পায়ে কিছু নাই। পুরুষোত্তমানন্দের মাতৃ-হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল আমার কষ্ট হইতেছে বলিয়া। আমাকে

বলিলেন রাস্তার পাশের ঘাসের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাও—কষ্ট কম হইবে। এই ছিল আমাদিগকে রক্ষা করিবার ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়া তাঁহার সস্নেহ দৃষ্টি। আমাদের কলিকাতা টালিগঞ্জের বাসায় আমি থাকি। ১৯৫১ সালের ৯ই মার্চ্চ আমার নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া আমি একরূপ মৃত্যু শয্যায় শায়িত। পুরুষোত্তমানন্দ সকাল হইতে ১২।১টা আবার সেই চৈত্র মাসের প্রখর রৌদ্রে ২টায় আসিয়া রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত আমার মাথার কাছে দিনের পর দিন সেই স্নেহভরা বিহ্বল চক্ষু দুইটী মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া বসিয়া থাকিতেন। অসুখের পর যে দিন অন্ন পথ্য করিব, পুরুষোত্তমানন্দ কাছে বসিয়া বলিলেন, কয়েক দিন পর ভাত খাইতেছ, গলা শুকাইয়া আছে, প্রথমে একটু জল খাইয়া লও। কি মাতৃ হৃদয়ের অভিব্যক্তি! নরনারায়ণ আশ্রমে আমি একদিন রাত্রে ভয়ানক পেটের যন্ত্রণায় ঘুমাইতে পারিতেছি না। রাত্রি প্রায় ২টা—পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ উঠিয়া সেই সময় বাত্‌রুমে গেলেন। আমি সেই সময় উঠিলাম পায়খানায় যাইবার জন্য, তাঁহাকে বলিলাম আমার পেটের যন্ত্রণার কথা। তারপর আমি পায়খানায় যাইয়া প্রায় আধ ঘণ্টা পর বাহির হইয়া দেখি বাত্‌রুমের দরজায় পুরুষোত্তমানন্দ সেইভাবে দাঁড়াইয়া আছেন আমার অবস্থা জানিবার জন্য। আমি তো অবাক্। গুরুবাদের দেশ ভারতবর্ষ—কে না

জানে এখানে গুরুর স্থান কোথায়, সেই দেশে একজন গুরু রাত্রি ২টায় শিষ্যের পায়খানার দরজায় দাঁড়াইয়া আধ ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করেন, ইহা পুরুষোত্তমের সেবানন্দেই পুরুষোত্তমানন্দ করিতে পারিয়াছেন। এই খানেই তাঁহার বাণী এবং তাঁহার জীবন মিলিয়া গিয়াছে। যদি কেহ বলে পুরুষোত্তমানন্দের স্বরূপ কি,—এই আমাদের পুরুষোত্তমানন্দের স্বরূপ। তাহার বিরাটত্ব মাপিবার ক্ষমতা আমার নাই—আমি জানি তাঁহার এই মাতৃ-হৃদয় যে হৃদয় দিয়া তিনি আমাদিগকে পরিপ্লুত করিয়া রাখিয়া ছিলেন।

৪২-সের আগষ্ট আন্দোলনে যখন পুরুষোত্তমানন্দ আলীপুর জেলে, সেই সময় ভীষণ দুর্ভিক্ষের দিনে তিনি জেল হইতে নরনারায়ণ আশ্রমে তাহার মেয়ের নিকট সংবাদ পাঠান, এই দুর্দ্দিনে পাবনাতে প্রতিভা কি অবস্থায় আছে সংবাদ লও, টাকা পাঠাও। যে দিন নরনারায়ণ আশ্রম হইতে আমার নামে টাকা গেল, সে দিন আমার হাতে একটি পয়সাও ছিল না। তাঁহার স্নেহের দান পাইয়া তাঁহার স্নেহ স্মরণ করিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলাম। এমন বান্ধব, এমন দরদী মানুষ তিনি ছিলেন। বেলঘরিয়াতে আমার মেয়ের অসুখ, কলিকাতা আশ্রমে পুরুষোত্তমানন্দ অস্থির, নিত্যগোপালের নিকট বসিয়া কাঁদিয়া আকুল, ঠাকুর, প্রতিভা মেয়ে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছে; তুমি তাহাকে সুস্থ করিয়া তোল। তাঁহার

সেই প্রার্থনায় কি যে অভাবিত ভাবে সেই কঠিন রোগ হইতে কত সহজে মেয়ে সুস্থতা লাভ করিয়াছিল, তাহা আমিই শুধু অনুভব করিয়াছি। এমনি করিয়াই তিনি তাঁহার স্নেহ দিয়া আমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। টালীগঞ্জের বাসায় আমার একবার জ্বর হয়, সেই সংবাদ পাইয়া খুব ভোরে পুরুষোত্তমানন্দ যাইয়া উপস্থিত হন। আমার মা তখন ছিলেন, তিনি বলিলেন, কি, প্রতিভার জ্বর হইয়াছে তাই বুঝি পুরুষোত্তমানন্দের নাড়িতে টান পড়িয়াছে। সত্যই পুরুষোত্তমানন্দের নাড়িতে টান পড়িত। তিনি যে আমাদিগকে তাঁহার সকল সত্তা দিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থা সকলের সম্বন্ধেই তাঁহার ছিল। তাঁহার মেজ পুত্রবধুর অসুখ—রাত্রিতে বার বার উঠিয়া যাইয়া তাহার হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিয়াছেন। মারাত্মক অসুখ, সকলের মত হাসপাতালে পাঠানো ; কিন্তু সকলের অমতে নিজের কাছে রাখিয়াই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ভয় পাছে হাসপাতালে অযত্নে মারা যায়। পুরুষোত্তমানন্দ প্রত্যেক মানুষের সম্বন্ধে এই ব্যবহার করিতেন, প্রত্যেক সম্পর্ককে তিনি ব্রহ্ম মূল্যে দেখিয়াছেন। তিনি কাহাকেও নিজ হইতে পৃথক করিয়া দেখেন নাই, তাই প্রত্যেক কর্ম্ম এত নিপুণভাবে প্রাণ ঢালিয়া করিতে পারিতেন। একজন আসক্ত মানুষের মতই তাঁহার ব্যবহার, কিন্তু এই ব্যবহার যখন স্ত্রী পুরুষ বৃদ্ধ যুবা বালক

নির্ব্বিশেষে শত শত মানুষের প্রতি ছিল—সেখানেই তিনি ছিলেন কত বড় মুক্ত। প্রত্যেকের জন্যই ব্যাকুল অথচ চলার পথে পুরুষোত্তম ছন্দের কোন পতন হয় নাই, কেহ তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই, কাহারও জন্যই তাঁহার আদর্শ হইতে তাঁহাকে সরিয়া আসিতে হয় নাই। যেমন শিব সুন্দর সতীর মৃতদেহ লইয়া উন্মত্ত, আবার সমাধিস্থ। পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে আমরা তাহারই দৃষ্টান্ত পাইয়াছি।

"...সব অংশের ভিতর এককে বাহির করা শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়; প্রতি অংশের পূর্ণত্ব বুঝিয়া সব পূর্ণ অংশসমূহের মধ্যে জীবন্ত এক দর্শন করাই শ্রীনিত্যগোপালের সমন্বয়"

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

নবম অধ্যায়

এই সময়ের মধ্যে কেনোপনিষদের ভাষ্যও প্রকাশিত করেন। জয়া ব্যানার্জী প্রভৃতি কিছু সংখ্যক ছেলে মেয়ে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করে। শিষ্য করিলে তিনি তো অনেক শিষ্যই করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তো প্রচলিত গুরুগিরির পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি চাহিয়াছেন মানুষকে সত্যকার মানুষ করিতে। মানুষ জীবন বদলাইয়া সত্যকার মানুষ, ব্রহ্ম মানুষ তো হইতে চাহে না, সে যেখানে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকিয়াই ভগবান পাইতে চায়। পুরুষোত্তমানন্দের পুরুষোত্তম পথ চলার ছন্দ তো তাহা নহে, তাই তাঁহার আর শিষ্য করা হয় নাই। আমরা স্বামীজীকে কোন শারীরিক অসুস্থতা-বশতঃ দীর্ঘ দিন বিছানায় পড়িয়া থাকিতে দেখি নাই, মাঝে মাঝে আমাশয় ও কটি বাতে কষ্ট পাইতেন; কিন্তু ১৯৪৮ সনের রেশন কার্ডের ব্যবস্থা হওয়ায় চাউলের অভাবে দুই বেলা রুটি খাইতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে প্রস্রাবের পীড়া দেখা দিল, ডাক্তার প্রষ্টেট গ্ল্যাণ্ড হইয়াছে বলিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটু একটু করিয়া প্রস্রাব করিতেন, অনেক সময় লাগিত এবং খুব কষ্ট হইত; ইহাতেই তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া

পড়িল। দীর্ঘ বৎসর যাবৎ মাছ খান নাই, সেই সময় ডাক্তারের নির্দ্দেশে মাছ খাইতে আরম্ভ করিলেন। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। দেহের ঐরূপ অবস্থা হওয়ায় তিনি এই প্রথম বলিতে লাগিলেন, আমার এই দেহটি রাখিবার জন্য একটু স্থান তোমরা কর, সেখানে মাটির নীচে আমাব এই দেহটি রক্ষিত হইবে এবং তোমরা সবাই আমার এই দর্শন লইয়া আমার দেহকে ঘিরিয়া থাকিবে, সেখানে একটি কর্ম্মকেন্দ্র, জ্ঞানকেন্দ্র, ভক্তিকেন্দ্র গড়িয়া উঠিবে। ক্রমেই তাঁহার দেহকে রক্ষা করা ও তাঁহার দর্শনকে রাখিয়া যাওয়ার একটি স্থানের প্রয়োজন বোধ করিতে লাগিলেন, সেজন্য এখানে ওখানে স্থানের চেষ্টা চলিতে লাগিল। এমন সময় পাবনা হইতে কুসুম কুমারী সরকার মৃতপ্রায় শিশু গোপা বসুকে লইয়া গোলাম মহম্মদ রোডে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট্ট একটি অফিস ঘর, কোথায় ইহাদিগকে রাখা হয়? স্বামীজীর পরিবার তখন তাঁহার পুত্র পুত্রবধূ নাতি নাতিনী পরিবেষ্টিত; তাহার ভিতর আমাদিগকে রাখা সম্ভব নয়। এদিকে আমি টালীগঞ্জে, রেণু গোলাম মহম্মদ রোডে, স্বামীজি রাসবিহারী এভিনিউতে—কাজ কর্ম্মেরও খুবই অসুবিধা হইতে ছিল। এইরূপ নানা রূপ ঘটনার একত্র সমাবেশ হওয়ায় স্বামীজী তাঁহার পরিবার হইতে বাহির হইয়া পৃথকভাবে নরহারায়ণ আশ্রমের পরিকল্পনা করিলেন। বহু চেষ্টায় টালীগঞ্জে ১২০৲ টাকা দিয়া একটি বাসা ভাড়া করিয়া সেখানে

নরনারায়ণ আশ্রমকে স্থানান্তরিত করা হইল। যেদিন আমরা টালীগঞ্জের নূতন আশ্রমে গেলাম সেদিন আশ্রম-জননী উষাঙ্গিনী দেবীও স্বামীজীর সহিত আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন, স্বামিজী আসিবার সময় সস্নেহে পুত্র কন্যা পুত্রবধূদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছিলেন। ছোট পুত্রের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, আমি চলিলাম, তোমরা আমাকে দেখিও, আমার জন্য যাহা পার করিও। তিনি তাঁহার জীবন হইতে কাহাকেও কোনদিন ছাড়েন নাই, তাঁহার পুরুষোত্তম শাস্ত্র ছাড়িবার শাস্ত্র নয়, ছাড়িয়া রাখিবার শাস্ত্র। স্বামিজীর একটা দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনা ছিল যে ভাবের সম্পর্ক এবং রসের সম্পর্ককে একত্রিত করা অর্থাৎ সংসার ও সন্ন্যাসের সমন্বয় বিধান করা। এই জন্যই তাঁহার পরিবারের ভিতর আমাদিগকে ডাকিয়াছিলেন এবং পরিবারের লোকেরাও আমাদিগকে সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেদিন তিনি পরিবার হইতে সরিয়া আমাদের মধ্যে আসিলেন সে দিনও মাকে সঙ্গে করিয়াই আমাদের মধ্যে আসিলেন। মায়ের নিকট হইতে আমরা যে মাতৃস্নেহ পাইয়াছি তাহার তুলনা হয় না। কেন জানি না শ্রীনিত্যগোপালের কি ইচ্ছা, পুরুষোত্তমানন্দের এই প্রচেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত কার্যকরী হয় নাই।

আমরা টালীগঞ্জ যাওয়ার পর পুলিন নামে একটি যুবক স্বামীজীর নিকট আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে

চায়। তাহার দীক্ষা লইবার কারণ খাদ্য অভাবে রুগ্ন, অন্ন নাই স্থান নাই, তাই সে ভাবিয়াছিল এই ভাবে মরিতে তো বসিয়াছি, শেষ দিনের সম্বল মন্ত্রটা স্বামীজীর নিকট হইতে যদি লইতে পারি—মানুষ জীবনের সার্থকতা হইবে। স্বামীজী কিন্তু পুলিনের সমস্ত অবস্থা জানিয়া বলিলেন—মন্ত্র পরে দেখা যাইবে, আগে খাইয়া সুস্থ হও, আমার এখানে থাকিয়া দুইবেলা পেট ভরিয়া খাও। সেই দিন হইতে পুলিন আশ্রমের একজন হইয়া রহিল। দশমাস পর আমরা যে দিন বাসা বদল করিয়া চলিয়া আসিলাম উহাকে স্বামীজী ১০৲ টাকা দিয়া আসিলেন, তখন সে কোন স্থানে কাজ করিয়া খাইবার মত শক্তি লাভ করিয়াছে। পুলিন আর দীক্ষার কথা তোলে নাই বা কলিকাতাতেই আমরা ছিলাম কোন দিন দেখাও করে নাই। এইভাবে কত শত শত ছেলেমেয়ের চলার পথ তিনি করিয়া দিয়াছেন।

পুরুষোত্তমানন্দের এমন এক খানি হৃদয় ছিল, কত মানুষ কত আঘাত দিয়াছে কিন্তু তিনি নিজে বেদনা পাইয়াছেন, কাহাকে কখন আঘাত হানেন নাই। কাহারও দোষের কথা লইয়া অন্য কাহারও সহিত আলোচনাও করেন নাই, যাহার দোষ তাহাকেই চোখের জলে বলিয়াছেন। প্রায়ই দেখা যায় মানুষের সেবা করিতে যাইয়া শেষে মানুষ মানুষ-বিদ্বেষী হইয়া পড়ে। পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে এমন শত শত ঘটনা রহিয়াছে যাহাতে

তিনি আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছেন। কিন্তু যে আঘাত হানিয়া সরিয়া গিয়াছে আবার পরক্ষণে সে আসিলেই তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়াছেন। কি মহা-প্রাণ লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন, আমরা হতভাগ্যের দল তাহা অনুধাবন করিতে পারি নাই, তাই তাঁহাকে গ্রহণ করিতেও পারি নাই।

ছোট্ট মেয়ে গোপা, তাহাকে স্বামীজী নিজে পড়াইতেন, তাহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকার জন্য কত চিন্তা তাঁহার ছিল। কমলা নামে তাঁহার আশ্রিত একটি মেয়েকে তিনি পড়াইতেন। আর আমাদের নিকট বলিতেন, কোথায় আমি মানুষকে বেদান্ত পড়াইব, না আজ সি এ টি ক্যাট পড়াই। একজন ব্রহ্মবিৎ পুরুষ কেমন করিয়া এত ছোটদের এত ছোট ঘটনার সহিত মিশিতে পারিতেন, এই খানেই তাঁহার সহজ জীবনের অলৌকিকত্ব। কিন্তু চোখ ঝলসান, মন মাতানো এই বিভূতির যুগে পুরুষোত্তমানন্দের এই প্রাণের বিভূতি মানুষের চোখে পড়িবে না। আমরা দেখিয়াছি তাঁহার ভালবাসার প্রাবল্যে, তাঁহার প্রাণের আকুলতায় তাঁহার আশ্রিত পরিকরের কত দুর্য্যোগ কত সহজে সুযোগে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা প্রাণের দৃষ্টি ছাড়া বুদ্ধিমান জনসাধারণকে বুঝান যাইবে না।

টালীগঞ্জের আশ্রমে প্রতি রবিবার স্বামীজী গীতার

ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শ্রোতাও ভালই হইত এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ২ ঘণ্টা করিয়া শ্রীনিত্যগোপালের সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় পত্রিকার ভিতর তাঁহার যে বাণী তাহা পাঠ হইত। এই সময় স্বামীজীর একজন বন্ধু শ্রীহেমাঙ্গপদ বরাট অনেক আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন। আমরা টালীগঞ্জে আসার পর স্বামীজীর এক শিষ্যা মৃণালিনী বিশ্বাস আশ্রমে আসে স্বামিজীর নিকট থাকিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য। ঐ ভাবে দশমাস টালীগঞ্জে থাকা হইল, অত্যন্ত বাসা ভাড়া এবং অন্যান্য অসুবিধা থাকায় ৮এ রাসবিহারী এভিনিউর যে বাসার উপরে পূর্ব্বে স্বামীজী ছিলেন ও তখনও তাঁহার পুত্র পুত্র বধূরা বাস করিত, তাহার নীচ তলাতে ঘর ভাড়া লইয়া আমরা সেখানে আসিলাম। পুরুষোত্তমানন্দ কি ভীষণ বিপ্লবী পুরুষ ছিলেন—একই বাসার তেতলায় তাঁহার অতি স্নেহের অতি আদরের পরিবারবর্গ, কিন্তু তিনি আমাদের মধ্যেই নীচ তলাতে আহারাদি করিতেন, কেবল মাত্র দুই প্রহরে এবং রাত্রিতে তাঁহার পূর্ব্বের ঘরে যাইয়া শয়ন করিতেন। তাঁহার সামগ্রিক জীবন ছিল বলিয়াই তিনি সকল স্তরের আস্বাদন করিয়াও সকলের উর্দ্ধে ছিলেন। সেই দিনের ডাইরীতে লিখিয়াছেন—'কত বড় নির্ম্মমতার পরিচয় আমি দিয়াছি এদের মধ্যে থাকিয়া এদের সঙ্গে পৃথগন্ন হইয়া। উষাঙ্গিণী কাছে না থাকিলে খাওয়া হইত না। তাহাও তো

আমি সহ্য করিতেছি। আমার খাওয়ার কাছে সে বসে না। মানুষ আসক্তির কথা বলে, কিন্তু আসক্তির মধ্যে যে অনাসক্তি আমি আস্বাদন করিতেছি, তাহা ঠাকুর বুঝিতেছেন'।

১৩৬০ সনের ২৭শে চৈত্র বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে শ্রীনিত্যগোপালের, শততম জন্মোৎসব আরম্ভ করার উপলক্ষে মহানির্ব্বাণ মঠ হইতে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল শত-বার্ষিকী উৎযাপন করিতে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ আহ্বান করিলেন। স্বামীজীও শ্রীনিত্যগোপালের এই সেবার ভার গ্রহণ করিয়া প্রাণপণে তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রতিদিন দুই বেলা মহানির্ব্বাণ মঠে যাইয়া গুরুভ্রাতাগণের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেন। আমরা দেখিয়াছি একটি বৎসর কিভাবে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শন লোক-সমাজের নিকট উপস্থাপিত করা যায় এই ছিল তাঁহার ধ্যান জ্ঞান। তিনি মহানির্ব্বাণ মঠে প্রায়ই সভা আহ্বান করিয়া শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতেন। শতবার্ষিকী উপলক্ষে পানিহাটিতে শ্রীনিত্যগোপালের জন্মস্থানে যাইয়া তাঁহার সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন, এবং নবদ্বীপ আমপুলিয়া পাড়া অবধূত আশ্রমে দুই দিন, পোড়ামা তলা তিন দিন, দেওড়া-পাড়া মহানির্ব্বাণ মঠে এক দিন ও বঙ্গবাণী স্কুলে এক

দিন বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই সময় মাতা উষাঙ্গিণী দেবী ও রেণু প্রভৃতি আমরা তাঁহার সঙ্গেই ছিলাম। স্বামীজী সে দিন নবদ্বীপ বৈষ্ণব সমাজ ও গৌরাঙ্গ সেবক গোস্বামীগণের নিকট শ্রীনিত্যগোপালই যে শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার অকাট্য যুক্তি ও ভক্তি পরিপ্লুত চোখের জলের বক্তৃতা শুনিয়া সে দিন কেহই কোন উচ্চ বাচ্য না করিয়া তাঁহার কথা মানিয়াই লইয়াছিলেন। এইভাবে তাঁহার জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া ভগবান শ্রীনিত্যগোপালের অবতরণের প্রয়োজনীয়তা, তাঁহার বাণী, তাঁহার জীবনই যে বর্ত্তমান যুগ-সমস্যা সমাধানের আলোক বর্ত্তিকা তাহা পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ প্রাণপণ প্রচেষ্টায় বিশ্বের নিকট উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ মঠের শত বার্ষিকী উৎসবের কাজ যে দিন শেষ হইল সেই দিন স্বামীজী বলিলেন—আজ শতবার্ষিকী উৎসব শেষ হইল। যে দায়িত্ব ঠাকুর দিয়াছিলেন তাহা যে ভাবে সম্পন্ন করিব ভাবিয়া ছিলাম তাহার সিকি ভাগও করিতে পারি নাই। মহানির্ব্বাণ মঠ হইতে এত বাধাই আসিয়াছে যাহা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। যাক্, যাহা পারিলাম কোনও অভিসন্ধি না রাখিয়া করিয়া গেলাম। আজ দেড় বৎসর প্রতিদিন মঠে আসিতেছি, আজ হইতে তাহা শেষ হইল, কষ্ট হইতেছে।

এই সময় পার্ব্বতী নাথ বিশ্বাস, তাহার স্ত্রী ও ভাগিনেয় সুব্রত স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীর্ঘ দিন পর বৃন্দাবনের শিষ্য কুমারনাথ মৈত্র আসে, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া স্বামীজীর কি কান্না! বলিলেন কুমার, এতদিন আমাকে ভুলিয়া ছিলে? আমি যে তোমার প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া থাকিতাম, আমি তো কাহাকেও ভুলিতে পারি না। কুমার বলিয়াছিল, আমি এবার আপনার কাছে কোন কিন্তু না রাখিয়া আসিয়াছি, আমি আপনার নিকট থাকিব। কুমারনাথের স্ত্রী পুত্র কন্যা হরিদ্বারে। স্বামীজী বলিলেন, কুমারের ছেলের পড়ার খরচ ১২৲ টাকা বাদে আরো ৭০৲ টাকা তাহার সংসার খরচ বাবদ পাঠাও, নতুবা উহাদের কষ্ট হইবে। কুমার যদি আমার দিকে তাকাইয়া প্রাণপণে কাজ করিয়া যায় আমি তাহার যাহা প্রয়োজন তাহা করিব। আমার উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকিলে পথ পাইবে। সে তাহার সকল ভাবনা ছাড়িয়া আমার মিশনের ভাবনা ভাবুক আমি তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যার ভাবনা ভাবিব। কুমার বলিয়াছিল, এতদিন জানিতাম শিষ্য গুরুকে ভেট দেয় আর আপনি গুরু হইয়া শিষ্যকেই ভেট পাঠান। এই ছিল পুরুষোত্তমানন্দের জীবন ধারা।

পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজকে মঠের ট্রাষ্টী করিবার জন্য প্রস্তাব মঠ হইতে হইয়াছিল, কিন্তু অন্যান্য সন্ন্যাসী গুরু-ভ্রাতাগণ মত না করায় হইল না। সেই দিন স্বামীজী এই রকম

বলিয়াছিলেন, মহানির্ব্বাণ মঠের উহারা আমাকে ট্রাষ্টী করিল না ভালই, ঠাকুরের এই ইঙ্গিত পাইলাম আমাকে বাহির হইতে একাই কাজ করিতে হইবে। আমি শ্রীনিত্যগোপালকে যে রূপে পাইয়াছি, ইহাই তাঁহার সত্য সমগ্র রূপ, এই রূপেই তিনি প্রতিষ্ঠিত হইবেন। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাকে প্রকাশ করাই সত্যরূপ, শ্রীনিত্যগোপালের এই জগন্নাথ রূপই আজ প্রকাশ করিতে হইবে। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কংগ্রেসের সেবা করিয়াছিলাম, একদিন সেই কংগ্রেস হইতেও এই ভাবে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমি তো আর কিছুই বুঝি না, আমি বুঝি শুধু সত্য। আমাকে তাই সবাই বাহির করিয়া দিল। যে সত্য-সেবী তাহাকে সকলেই সরাইয়া দেয়, আমি কাহাকেও ত্যাগ করি নাই, সবাই আমাকে ত্যাগ করিয়াছে। আমাকে ঠাকুর বলিয়াছেন—'শরৎ, যখন যেখানে থাক আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি'। তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন ইহা অতি সত্য, আমি কিছুই গ্রাহ্য কবি না। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। অবধূত আমি, অবধূতের কাছে আগতম্ আগতম্ অনাগতম্ অনাগতম্। আমি নিত্যগোপালের দীন সেবক, আমার তাঁহার সেবা করা ছাড়া জীবনে আর কিছু নাই। ঠাকুর একদিন স্বপ্নে বলিয়াছিলেন—শরৎ মহানির্ব্বাণ মঠে আসিয়া থাকুক। তাই মহানির্ব্বাণ মঠ হইতে তাঁহার সেবা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম,

তাঁহার দর্শন তাঁহার স্থান হইতে প্রচারিত হইলেই শোভন হইত, কিন্তু পারিলাম না। দুর্নীতি আমি সহ্য করিব না, আমি বাহির হইতেই ধাক্কা দিব! ঠাকুর আমাকে মুক্তির উপাসক করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি তাই আমাকে মঠের ট্রাষ্টী করেন নাই, আমি জন সাধারণের মাঝে থাকিয়া নিত্যগোপালের সেবা করিব। ঘরে থাকিয়া ঘর শুদ্ধ করিব ভাবিয়া ছিলাম, তাহা হইল না, আমি বাহির হইতেই কাজ করিব। আমি সত্যের পূজারী, সত্য যাহা বুঝিয়াছি তাহা বলিবই।

মহানির্ব্বাণ মঠের শ্রীনিত্যগোপাল শত বার্ষিকীর কার্য্য সমাধা হইবার পরই ২৪ পরগণার বাগুআটি গ্রাম হইতে অশ্বিনী দত্তের জন্ম তিথির উৎসব উপলক্ষ করিয়া স্বামীজীকে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান আসে, সেই সূত্রকে অবলম্বন করিয়া বাগুইআটি গ্রামে নরনারায়ণ আশ্রম স্থাপনা করিবার জন্য কিছু জমি ক্রয় করিলেন। কুমারনাথ ও রেণু বহু পরিশ্রম করিয়া জমি ক্রয় ও ঘর তুলিবার ব্যবস্থা করিল। কুমার সেই সময়ই কলিকাতার গরম সহ্য করিতে না পারিয়া অসুস্থ হইয়া চলিয়া গেল। সেই সময় দেশবন্ধু নগরের স্থানীয় অধিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন রায় আশ্রম গঠনে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, আজও তিনি আশ্রমের বন্ধুজন। জিতেনবাবুর সহায়তায় দুইখানি মাত্র ঘর করিয়া ১৩৬৩ সনের বৈশাখ মাসে পুরুষোত্তমানন্দ

তাঁহার দীর্ঘদিনের নরনারায়ণ আশ্রমকে নিজস্ব একটি স্থানে স্থাপিত করিয়া সেখানে পদার্পণ করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, আমার 'কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব'। অর্থাৎ আমার এই ঠাকুর ও দর্শন কোথায় কাহাদের নিকট রাখিয়া যাইব। স্বামীজী যে দিন বাগুইআটি আশ্রমে আসিলেন জননী উষাঙ্গিণী দেবীও তাঁহার সঙ্গে আসিলেন, অবশ্য কিছু দিন থাকিয়া পুনরায় কলিকাতা পুত্রদের নিকট চলিয়া গেলেন। তবে স্বামীজী দেহে থাকাকালীন তিনি মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিতেন।

বাগুইআটি নরনারায়ণ আশ্রমে আসিবার পূর্ব্বে পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ একটি পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিলেন। সেই পরিকল্পনা ছিল আট ভাগে বিভক্ত, যথা—শ্রীনিত্যগোপাল ব্রহ্ম-বিদ্যাপীঠ, স্বামীজীর লিখিত প্রস্থানত্রয়ের অবধূত ভাষ্যগুলি প্রকাশ ও প্রচার, একটি প্রেস, উজ্জ্বল-ভারত পত্রিকা নিয়মিত ভাবে বাহির করা, গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, বয়স্ক-বয়স্কা শিক্ষণকেন্দ্র, মহিলা সঙ্ঘ শিল্প তাঁত চরকা ইত্যাদিসহ, শিশুশিক্ষা কেন্দ্র। পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ নরনারায়ণ আশ্রমে আসিয়াই শ্রীনিত্যগোপাল ব্রহ্ম বিদ্যাপীঠে প্রতি রবিবার বৈকালে নরনারায়ণ আশ্রমের উদ্দেশ্য আদর্শ ও চলার পথ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। দুই মাস এই ভাবে আলোচনার পর শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার মাধ্যমে পুরুষোত্তম তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে

থাকেন এবং তাঁহার চলিয়া যাইবার আগের রবিবার পর্য্যন্ত আলোচনা চালাইয়া গিয়াছেন। গ্রামের রাস্তা, বর্ষাকালের দুর্য্যোগময় দিনে কর্দ্দমাক্ত পথ বহিয়া কিছু লোক আসিয়া তাঁহার সেই নূতন যুগের অমৃতময় বাণী শ্রবণ করিয়া অতিশয় তৃপ্ত হইয়া যাইতেন, পথের কষ্টকে তাঁহারা কষ্ট মনে করেন নাই। স্বামীজী দেখিলেন কাঁচা পথে যাতায়াতে লোকের কষ্ট হইতেছে, তখন তিনি স্থানীয় প্রায় দুইশত লোকের দস্তখত-সহ এক আবেদন ও ব্যক্তিগত পত্রদ্বারা শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন, শ্রীখগেন দাশগুপ্ত ও শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহ রায় মহাশয়কে রাস্তা করিয়া দিতে বলায় কিছু দিনের মধ্যেই রাস্তা পাকা করিবার বন্দোবস্ত হয়; কিন্তু রাস্তা আরম্ভ হইতেই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন! যাহাহউক, তিনি আশ্রম হইতে উজ্জ্বল ভারত পত্রিকা নিয়মিতভাবে বাহির করিতে লাগিলেন, একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করিলেন এবং বয়স্কা শিক্ষাকেন্দ্র ও মহিলা শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। এইভাবে আশ্রমের কাজ আগাইয়া যাইতে লাগিল। তিনি যখন বাগুইআটি গ্রামে আসিয়া আশ্রম করিলেন অনেকেই বলিলেন, এখানে আপনি থাকিতে পারিবেন না, এটা হইল পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ, অর্থাৎ কোন ভক্ত-জীবন যাপন করার মত এখানের পরিস্থিতি নয়। তাহাতে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, এত দেশ ঘুরাইয়া ঠাকুর যখন এখানে আনিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাঁহার কোন মঙ্গল ইচ্ছা আছে। ভক্ত আসিলেই ভগবান আসেন,

ভক্ত-ভগবানের মিলন স্থান অবশ্যই পবিত্র হইয়া উঠে। স্বামীজী ২ বৎসর ছিলেন, তাহাতে অনেকেই বলিয়াছে আপনি আসায় গ্রামের আবহাওয়া অনেকখানি পরিষ্কার হইয়াছে। সেই সময় বাগুইআটি পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুতে ভর্ত্তি। স্বামীজী তাহাদের কল্যাণের জন্য তাহাদের সহিত বেশী মিশিতেন এবং আশ্রমের শিল্পকেন্দ্রে ও বয়স্কা শিক্ষা কেন্দ্রে উদ্বাস্তু মেয়েদেরই মুখ্যতঃ শিক্ষা দেওয়া হইত। একদিন দোল উপলক্ষে উদ্বাস্তুরা কীর্ত্তন করিয়া আশ্রমে আসে, স্বামীজী সেই সময় আসিয়া এমন ভাবে জোড় হাত করিয়া নিজেকে যেন তাহাদের কীর্ত্তনের ভিতর মিশাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন যে সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! কীর্ত্তনের পর প্রতিটি মানুষকে বুকের সহিত জড়াইয়া ধরিলেন। মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষকে পাইবার জন্য কি তাঁহার ব্যাকুলতা ছিল! তিনি বলিতেন ভগবানের জন্য আমি তো কোন দিন কাঁদি নাই, তাঁহাকে অযাচিত করুণায় পাইয়াছিলাম, সেই অযাচিত করুণায় পাওয়া ধনকে মানুষকে দিতে চাহিয়া সারা জীবন শুধু মানুষ মানুষ করিয়া কাঁদিয়া গেলাম।

এই ভাবে ২ বৎসর কাটিল কিন্তু সকল আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া দিয়া পুরুষোত্তমানন্দের চলিয়া যাইবার দিন যে এত নিকটে আসিয়া গিয়াছিল তাহা আমরা কেহই ভাবিতে পারি নাই। দেহ যে তাঁহার খুব দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল তাহা বুঝিতে ছিলাম কিন্তু তাহা যে এতখানি এইরূপ আমরা সে

দিকে যেন সজাগ ছিলাম না। বাগুই-আটিতে মাত্র তিনি দুই বৎসর ছিলেন। ইহার মধ্যেই শ্রীনিত্য-গোপালের নিকট হইতে তাঁহার ডাক আসিয়া গেল। গ্রামে আসিবার ৫।৬ মাস পর একদিন সারাদিন উপবাস করিলেন। সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন, ডাক্তার ডাকা হয়, একটু সুস্থ হন, রাত্রিতে আরও দুইবার অজ্ঞান হন, সঙ্গে বমির ভাব। সেদিন কি দুর্য্যোগপূর্ণ রাত্রি, মুষল-ধারে সারা রাত্রি বৃষ্টি, গ্রাম দেশ, রাস্তা পথ কর্দ্দমাক্ত ; সেই অবস্থাতেই প্রতিবারেই ডাক্তার ডাকানো হয় এবং ঔষধ দেওয়ায় সুস্থ বোধ করেন। তখন ষ্টেথিসকোপে তাঁহার হৃদ্ যন্ত্রের কোন ত্রুটিই ধরা না পরায় ডাক্তারগণ কলিকাতা যাইয়া কার্ডিওগ্রাফ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। স্বামীজী এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা এমনিতেই পছন্দ করিতেন না এবং বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া কিছুতেই তাঁহাকে সম্মত করান যায় নাই। সেই সময় অসুখের সংবাদ পাইয়া স্বামীজীর তিন পুত্র ও মাতা উষাঙ্গিণী দেবী আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও কলিকাতা লইয়া যাইতে সম্মত করাইতে পারেন নাই। এই ঘটনার পর আরও দেড় বৎসর কাটিয়া যায়, মাঝে দুইদিন খুব অল্প সময়ের জন্য একটু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, ৩।৪ মিনিটেই আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গিয়াছিলেন।

১৩৬৪ সনের ১৪ই চৈত্র পুরুষোত্তমানন্দের জীবন-

দেবতা শ্রীনিত্যগোপালের শুভ ১০৪ তম জন্মতিথি উপলক্ষে মহানির্ব্বাণ মঠ হইতে বক্তৃতা দিবার জন্য গুরু ভ্রাতাগণের নিকট হইতে ডাক আসিল। তাঁহার হৃদ্-যন্ত্রের কোন বৈকল্য অবস্থা না থাকায় তিনি বক্তৃতা দিতে সম্মত হইলেন, আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করায় আমরাও অমত করিলাম না। কে জানিত তাঁহার জীবন-দেবতা তাঁহাকে চিরদিনের জন্য কোলে তুলিয়া লইতে ডাক দিয়াছেন, সেই জীবনের শেষ বক্তৃতা হইবে! তাহা তো আমরা বুঝিতে পারি নাই! পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার গ্রামের নরনারায়ণ আশ্রম হইতে ১৪ই চৈত্র শুক্রবার সকালে আশ্রমের কয়েক জনকে লইয়া মহানির্ব্বাণ মঠে যান। রেণু সঙ্গেই ছিল, মন্দির হইতে বাহির হইয়া বলি-লেন—ঠাকুরকে বলিয়া আসিলাম, 'তুমি থাকিলে, তোমার বিশ্ব থাকিল, আমি যেটুকু পারিলাম করিয়া গেলাম।' দুপুরে ৮এ রাসবিহারী এভিনিউতে তাঁহার পুত্রদের বাসায় যান, সেখানে আহার ও বিশ্রাম করিয়া বৈকালে মহানির্ব্বাণ মঠে যান এবং সন্ধ্যায় শ্রীনিত্যগোপালের জীবন দর্শন আলোচনা করিয়া রাত্রে আবার ছেলেদের বাসায় ফিরিয়া যান। এইভাবে শনিবারও তাঁহার বক্তৃতা হয় অল্প, রবিবার তিনি সভাপতি ছিলেন, সেদিনের বক্তৃতা এক অদ্ভুত রকমের হয়, এমন উদাত্ত কণ্ঠে সেদিনের ভাষণ দিয়াছিলেন সকলের নিকটই যেন কেমন লাগিয়াছিল। বক্তৃতার মাঝে একথাও

বলিয়াছিলেন আমার দেহের যে অবস্থা আগামী বৎসর আর আমি বক্তৃতা দিতে পারিব সে আশা রাখি না, এই আমার শেষ বক্তৃতা। গুরু-ভ্রাতাগণকে ডাকিয়া অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শন তোমরা প্রচার কর। এইভাবে বক্তৃতার পর অফিস ঘরের বারান্দায় যাইয়া বসিলেন। সেখানেও ভক্তগণের প্রশ্নের জবাবে আবার ভগবৎ প্রসঙ্গ উঠে, কিছু সময় আলোচনা হয়। একটা অদ্ভুত আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে আলোচনার মধ্যে যে সময় তিনি বলিতেছিলেন পরীক্ষিতের ৭ দিন আয়ুষ্কাল ছিল, আমাদের যে এই মুহূর্ত্তেই সময় হইয়াছে কিনা কে জানে, ঠিক এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। বন্ধু-বান্ধব ছেলেমেয়েদের সংবাদ দেওয়া হয়, সবাই আসেন, জ্ঞানও হয়, কিন্তু নাড়ীর অবস্থা ভাল নয় জন্য হাসপাতালে লওয়ার বন্দোবস্তই সবাই করিলেন। সেই রাত্রেই সুখলাল কারনানি হাসপাতালে তাঁহাকে রাখা হইল। ডাক্তার বলিলেন কম্‌প্লিট হার্ট ব্লক কেস, জীবনের কোন আশা নাই। হাসপাতাল যথাসাধ্য চেষ্টা করিল—সোমবার সারা-দিন প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতেই কাটিল। ১৮ই চৈত্র মঙ্গলবার ভোর ৬টা ৩৫ মিনিটে তিনি শ্রীনিত্যগোপালের নিত্যলীলার সহিত যুক্ত হইলেন। রেণুরা সবাই উপস্থিত ছিল। সন্ন্যাসী ভক্তগণ ও পুত্ররা সেই পুণ্যদেহ বহন করিয়া মহানির্ব্বাণ মঠে শ্রীনিত্যগোপালের শ্রীচরণসমীপে স্থাপন

করিলেন, সেখানে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। কয়েক ঘণ্টা পর কীর্ত্তনসহ গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তগণ মিলিয়া লরিতে করিয়া সেই পুণ্য দেহখানি বাগুইআটি গ্রামে তাঁহার নর-নারায়ণ আশ্রমে আনিয়া তিনি যে ঘরে থাকিতেন তাহার বারান্দায় রাখা হইয়াছিল। রাত্রি ৮টা পর্যন্ত সমানেই শ্রীনিত্যগোপালের নাম-কীর্তন চলিয়ছিল—তাঁহার স্ত্রী পুত্র-কন্যা পুত্রবধূগণ ও নাতি নাত্‌নী প্রভৃতি সবাই দেহ লইয়া আসিবার সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন জননায়ক, প্রাণের পূজারী, তাঁহার আকস্মিকভাবে তিরোধানের সংবাদ পাইয়া অগণিত বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন, প্রীতিমুগ্ধ ভক্তগণ যে যেখানে শুনিতে পাইল সকলেই ছুটিয়া আসিল বাগুই-আটি গ্রামে তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য। বাগুই-আটি গ্রাম ও তাহার আশপাশ গ্রাম হইতেও অগণিত স্ত্রী পুরুষ বালবৃদ্ধ যুবা নরনারায়ণ আশ্রম প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল। পুরুষোত্তমানন্দ ছিলেন তথা কথিতের দৃষ্টিতে ফকির, কিন্তু প্রাণ-সম্পদে তিনি ছিলেন রাজাধিরাজ। রাজকীয় সম্মানের সহিতই তিনি সারা জীবন চলিয়া আসিয়া-ছিলেন, যাইবার বেলাতেও জন-সংঘট্টের মধ্য দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। রাত্রি ৮টায় নরনারায়ণ আশ্রম প্রাঙ্গণে সেই শ্রীনিত্যগোপালের পরম আদরের দেহখানিকে পুণ্য সমাধি-দানে তাঁহার চির বিশ্রাম স্থান রচনা করিয়া তাঁহারই পাদপীঠ তলে আমাদের বেদনা-বিধুর প্রাণসজ্ঘ স্থাপিত হইল।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ ছিলেন বিপ্লবপূর্ণ সত্যের পূজারী। সর্ব্বদাই বলিতেন আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শেষ রক্তবিন্দু দিয়া যেন শ্রীনিত্যগোপালের কথা বলিয়া যাইতে পারি। তাঁহার জীবনে তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল-চরণে সমর্পিত জীবন ছিল তাঁহার, তাই শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। সমর্পণের মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন পুরুষোত্তমানন্দ। পুরুষোত্তমানন্দ আসিয়াছিলেন তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীনিত্যগোপালের যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে। তাঁহার জীবনে আমরা দেখিয়াছি স্থিতি ও গতির অপূর্ব্ব সমন্বয়। সারা জীবন ঝড়ের মতন চলিয়াছেন। তাঁহার জীবনে কত ঝড়, কিন্তু চলার বেগে পথ কাটিয়া চলিয়া গিয়াছেন, অথচ শ্রীনিত্যগোপালের সহিত তৈলধারার মত ছিল তাঁহার ছেদহীন যুক্ততা। তাঁহার জীবনে ছিল জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ, যাহা প্রচলিত দর্শন-শাস্ত্র অসম্ভব বলিয়াই ঘোষণা করিয়া থাকে। এই সমস্যাজর্জ্জরিত বিশ্বের সামনে শ্রীনিত্যগোপাল ও পুরুষোত্তমানন্দ উভয়ে মিলিয়া সমাধান মূরতি। সকল স্তরের বিপ্লবী পুরুষোত্তমানন্দের জীবন না বুঝিলে শ্রীনিত্য-গোপাল-তত্ত্ব জানা যাইবে না।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন মথুরার ডাক আসিলে অক্রুরের রথে উঠিয়া রথ চালাইতে আদেশ দিয়াছিলেন, কত আদরের

ব্রজের গোপ-গোপিনীগণকে রথের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে দেখিয়াও তিনি দেখিলেন না, অক্রুর স্তম্ভিত রথ কি করিয়া চালাইবেন, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন চালাও রথ, ব্রজের খেলা শেষ হইয়াছে, পুরুষোত্তমানন্দও তেমনি তাঁহার এত আদরের বিশ্ব-পরিবেষ্টিত থাকিয়াও আজ চলিয়া যাইতেছেন কিন্তু যাইবেন বলিয়া কাহাকেও একটি কথা বলিলেন না। জ্ঞান হইবার পরে গুরুভাইদের ডাকিয়া 'নিত্যগোপাল' বলিতে বলিয়াছিলেন। কত বড় বন্ধনমুক্ত বিপ্লবী জীবনের আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন আমাদের সামনে।

ওগো মানব-দরদী পুরুষোত্তমানন্দ! আমরা তোমাকে পাইয়াছিলাম কিন্তু হারাইয়াছি। কি পাইয়াছিলাম বুঝি নাই, তাই অযতনে তোমাকে হারাইয়াছি। তোমার জীবনের ধ্যানে, তোমার আরব্ধ কর্ম্মের ধ্যানে যেন আমাদের জীবনের শেষ প্রতিটি মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হয়। আমাদের জীবনে তোমার জয় হউক। বিশ্বের বুকে তোমাব নিত্যগোপাল প্রতিষ্ঠা জয়যুক্ত হউক। ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি, ওঁ হরি ওঁ।

সমাপ্ত